গান্ধর্বী

নিরঞ্জন ভট্টাচার্য

পরিবেশক :
নাথ ব্রাদার্স
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :

১লা জানুয়ারী ১৯৫৮

প্রকাশক :

শ্রীপ্রণবকুমার ভট্টাচার্য ও
শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য
হরিপাল, হুগলী

মুদ্রক :

হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

সর্ববিধ সহায়তায় :

শ্রীদেবকুমার চট্টোপাধ্যায় ও
শ্রীসুধীরকুমার সামন্ত
শেওড়াফুলি, হুগলী

ছোড়দি (শ্রীমতী মায়া মিত্র) ও
ভাই (ডঃ তপন চৌধুরী) কে

সে যখন রবীন্দ্রসদনের গেট দিয়ে তাড়াহুড়ো করে বেরোচ্ছিল তখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পরীর ওপর একটা প্রকাণ্ড লালচে কালো মেঘ। মাত্র একটাই। বাকি আকাশটা ধূসর। অনেকটা যেন সেই প্রতিচ্ছায়াহীন মানব মনের মতো। কিন্তু ওই একটা লালচে কালো ছোপই ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতো। গুহা মানবদের আঁকা বাইসন ছুটতে ছুটতে আসছে। ওইরকম মহাকায়, ওইরকম বেগবান। কিম্বা বলা যেতে পারে ফৈয়জ খাঁ সাহেবের হলক তানের হুঙ্কার। চোখে মুখে ধুলোর ঝাপটা লাগবার আগেই যেমন করে হোক বাসে উঠে পড়তে হবে। নইলে বিপদ। পেছন থেকে দীপালিদি ডেকেছিল— 'অপু, আমার গানের আগেই চলে যাচ্ছিস যে বড়?' তার স্বরে অভিমান। অপালা এগোতে এগোতেই বলেছিল—'না গেলেই নয় রে দীপুদি, তুই তো সবই জানিস।'

তার তানপুরো রয়ে গেল মাস্টারমশাইয়ের জিম্মায়। তানপুরো অবশ্যই তাঁরই। এ কদিন রেওয়াজের জন্য ছিল তার কাছে। যতদিন থাকে সে তটস্থ হয়ে থাকে। মস্ত বড় তুম্বিঅলা তানপুরো। ইন্দোরের কোন বিখ্যাত কারিগরের হাতের তৈরি, ঐতিহ্যবাহী জিনিস। সে অনেকবার বারণ করেছিল মাস্টারমশাইকে। ছোট তানপুরোটাতেও তো তার অনায়াসেই চলে যেত। অন্যান্য প্রতিযোগিতার আগে মাস্টারমশাই সেটাই দিয়েছেন। কিন্তু এবার ওটাই দিলেন। সে কিন্তু কিন্তু করতে এক ধমক খেল। সোহমের গাড়িতে করে পাঠিয়ে দিলেন তার বাড়ি। পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত ছিলেন বিচারকদের মধ্যে। একদম অভাবিত। অপালা কেন, আর কোনও প্রতিযোগীই এ আশঙ্কা করেনি। পুনে থেকে এস· এস্ জয়কার, লক্ষ্ণৌ থেকে আহম্‌দ হোসেন আসছেন জানা ছিল। কিন্তু এঁরা যদি গ্রাম্য ভাষায় যাকে বলে গোবাঘা হন তো পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত আসল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। এতোটাই তফাত। সত্যিকারের নায়ক লোক। যেমন জ্ঞান সঙ্গীতের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় তেমনি ওস্তাদ গাইয়ে। তেমনি আবার শিক্ষক। সেই সঙ্গে লোকে বলে চন্দ্রকান্তজী সাধক মানুষ। সবই মাস্টারমশাইয়ের কাছে শোনা। তারা শুধু রেকর্ড শুনেছে। একবার মাত্র একবার, সদারঙ্গ সঙ্গীতসম্মেলনে শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। দাপট কী! বাপ রে। ওঁর আসবার কথা মাস্টারমশাই যদি জেনেও

থাকেন, গোপন করে গেছেন ওরা ভয় পাবে বলে।

পনের মিনিট সময়, তার মধ্যে সবগুলি অঙ্গ দেখাতে হবে। মিনিট তিনেকের মতো আলাপ করে নিয়ে সে সবে 'জিউ মোরা চা আ এ-এ-এ' বলে টানটা দিয়েছে থামিয়ে দিলেন চন্দ্রকান্তজী।

—'তোড়ি কখনকার রাগ ?'

—'দিবা দ্বিতীয় প্রহর।'

—'এখন সময় ?'

—'ঘড়ি দেখে মনে হয় সবে সন্ধ্যা। ইমন, ভূপালিই প্রশস্ত।'

—'তাহলে ?'

—'সব গানের আসরই যদি সন্ধ্যায় বসে তো ভোরের, সকালের প্রিয় রাগগুলি আমরা গাইব কখন, ওস্তাদজী ?' তানপুরোর খরজে আঙুল রেখে দ্বিধাকম্প্র স্বরে বলেছিল অপালা। আসল কথা, অন্যান্য যেসব উপাধি-পরীক্ষায় তারা এত দিন বসেছে তাতে রাগ-পরিচয় এবং অন্যান্য থিয়োরি জানা আবশ্যক ছিল। কিন্তু চয়েস রাগ বলে যে বস্তুটা থাকত, সেটা তারা যেটা ইচ্ছে সিলেবাসের মধ্য থেকে বাছতে পারত। সময় যাই হোক, সেটি গাইতে কোনও বাধা হয়নি। এ প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী যে আলাদা তাদের সে-কথা কেউ বলেনি। তারা জানবে কি করে ? কিন্তু মঞ্চে বসে আয়োজকদের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা বললে সুর কেটে যাবে। হঠাৎ সে আরেকটু সাহস করে বলল— 'তা ছাড়া এই বদ্ধ ঘরে দিন রাত সবই তো সৃষ্টি হতে পারে রাগের আশ্রয়ে, বাইরের প্রকৃতি কি এখানে ঢুকতে পারছে ?'

পণ্ডিতজীর মুখে সামান্য হাসি। বললেন— 'তোড়ির মতো ভালো আর কোনটাই কি তৈয়ার নেই। নাকি সেই দীপক-মেঘমল্লারের কহানী তুমি সত্যি-সত্যি বিশ্বাস করো বেটি ?'

অপালা মুখ তুলে বলেছিল —'পণ্ডিতজী যদি আদেশ করেন আমি সন্ধ্যার রাগই গাইব। তবে আমার আগে, তিনজন ভূপালি, ইমন ও পূরবী গেয়ে গেলেন। আমি পুনরাবৃত্তি করলে শ্রোতাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হতে পারে। এখন পণ্ডিতজী আদেশ করুন।'

চন্দ্রকান্ত স্মিতমুখে বললেন— 'পুরিয়া তৈয়ার আছে ?' অপালার ভেতরটা চলকে উঠল। হার্মোনিয়মে বসেছেন তার মাস্টারমশাই রামেশ্বর ঠাকুর। তাঁর মুখে হাসি আসা-যাওয়া করছে বিদ্যুতের মতো। পুরিয়া অপালার বড় প্রিয় রাগ। পণ্ডিতজীর লং প্লেয়িং সে বারবার শুনেছে, তুলেছে, আপন আনন্দে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে সে রাগের প্রকাশ মহিমায়। পণ্ডিতজীরই প্রিয় গান, প্রিয় বন্দিশ সে ধরল ময়ূরের মতো আনন্দে। সেই 'সুপ্নোমে আবে পিয়া।' সামান্য একটু সুর ধরেই আরম্ভ করে দিল গান। অনেক সময় গেছে, আলাপাঙ্গ তো এঁরা শুনেই নিয়েছেন। হলই বা ভিন্ন রাগের। এইটুকু সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব বিস্তার, স্বরন্যাস, বোলতান, সরগম, তারপর তার সপাট বড় বড় কূট তান সব করে দেখাতে হবে তো। অন্তত গাইতে গাইতে তার যা করতে ইচ্ছে করবে তাকে তো ইমান তাকে-দিতেই হবে। তার সরগমগুলি সারেঙ্গিতে নিখুঁত তুলে বড় তৃপ্তিতে মাথা নাড়লেন ওস্তাদ ছোটেলাল। তর্কে-বিতর্কে

সময় গেছে বলে পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তাকে পাঁচ মিনিট সময় বেশি দিলেন। গান শেষে সভাস্থ সবাইকে নমস্কার করে তানপুরাটিকে 'লহো লহো তুলে লহো'র ভঙ্গিতে মাথায় ঠেকিয়ে অপালা বেরিয়ে গেছে, যবনিকার আড়াল দিয়ে বাইরে। সে জানে তার আর কোনও চান্স নেই, অত তর্কাতর্কি। অত দেরি! পুরিয়া বড় রাগ, কঠিন রাগ। একটু অসতর্ক হলেই মারোয়া কিম্বা সোহিনীর ছোঁয়া এসে যাবে। দ্রুত গানটি, 'ম্যাঁয় তো পিয়া সঙ্গে রঙ্গরলিয়া'র সময়ে সে মারোয়ায় চলে যাওয়া এবং ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু অত অল্প সময়ে এসব মেটানো যায় না। অন্তত সে পারে না। এখনও। সময় বেশি দিলেও সে তার তৈরি তেহাই দিয়ে গান শেষ করতে পারেনি। অথচ আশ্চর্যের কথা, তার সমস্ত মনটা আশ্চর্য প্রসন্নতায় দ্যুতিময় হয়ে আছে। অত কথা কাটাকাটির পরও কী মন্ত্রে যেন গান গেয়ে সে বড় আনন্দ পেয়েছে। তোড়ির সাজেশনটা মাস্টারমশাইয়েরই। একবার মনে হয়েছিল সন্ধ্যার গান গাওয়াই ভালো। যদিও নিয়মের কথা কেউই জানতেন না, সম্ভবত নিয়ম কেউ করেনওনি। চন্দ্রকান্তজী তাঁর দীর্ঘদিনের সংস্কারে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি কখনও প্রয়াগ, চণ্ডীগড় এ সবের পরীক্ষা তো নেন না। মাস্টারমশাই বলেছিলেন—'লড়ে যা মেয়ে, তোড়ি কঠিন রাগ, সবাই এর সৌন্দর্য ফোটাতে পারে না। বড় বড় কনফারেন্সে বড় বড় কলাবন্তরা ছাড়া এসব গাইবার সুযোগই কমে যাচ্ছে। এতটা রক্ষণশীলতা আমার ভালো লাগে না। তা ছাড়া প্রতিভা কোনও নিয়ম মেনে চলে না।' শেষের কথাগুলো মাস্টারমশাই বলেছিলেন আত্মগত। যদিও অপালার কানে সেগুলো পৌঁছেছিল। তার প্রতিভা আছে কিনা সে এখনও জানে না, কিন্তু তার একটা জিনিস আছে সেটা হলো মাস্টারমশাইয়ের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা এবং বাধ্যতা। তিনি না থাকলে তো তার এতদূর পৌঁছনো হতো না। তা সেই লড়ে যেতেই হল।

সোহমের জন্য মনটা খুঁতখুঁত করছে খুব। ওরা দুজনেই মাস্টারমশাইয়ের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী। এরা সময় আগে থেকে জানাচ্ছে না, যেমন অপালাকে ডাকল চতুর্থ। তার রোল নাম্বার হিসেব করলে সে আসে অনেক পরে। তার বাড়ির অসুবিধের কথা ভেবে হয়ত মাস্টারমশাইই ঘটিয়েছেন কাণ্ডটা। রোল নং ধরলে, বোঝাই যাচ্ছে সোহম পড়েছে শেষের দিকে। ও গাইবে খুব সম্ভব শংকরা। ভালো, বড় ভালো গায় সোহম। মাস্টামশাইয়ের পুরুষালি তেজ, বিক্রম, তাঁর বিখ্যাত গমক, গিটকিরি, টপ্পার কাজ—এ সবই সোহমের গলায় অবিকল উঠে আসে। মানায়ও। বেশ পাল্লাদার গলা। মাস্টারমশাইয়ের গলা এই বয়সেই ভেঙে গেছে। স্বরভঙ্গ হয় মাঝে মাঝে। কণ্ঠ নামক শারীরিক যন্ত্রটির ওপর তো মানুষের হাত নেই। কিন্তু সুরের ওপর আছে। মাস্টারমশাই মাত্র পনের বছর বয়সে প্রডিজি হিসেবে ভারতজোড়া খ্যাতি পেয়েছিলেন। রামপুরে আর বরোদায় কাটিয়েছেন বহুদিন। তখন ভারতবর্ষের গুণিসমাজ এক ডাকে চিনত রামেশ্বর ঠাকুরকে। গায়ক-জীবন আরম্ভও করেছিলেন অল্প বয়সে, নিভেও গেলেন অল্পবয়সেই। পঞ্চাশেই আর গলা অতি-তারে যেতে চায় না। সি শার্প থেকে জিতে নেমে এসেছেন। খাদের দিকের রেঞ্জটা একই রকম আছে। মন্দ্রসপ্তকে একটা ভারী সুন্দর

জোয়ারি আসে গলায়, জর্জেট কাপড়ের মতো। যেটা অপালার বিশেষ শ্রদ্ধার জিনিস। কিন্তু গায়ক হিসেবে রামেশ্বর আর প্রথম কেন দ্বিতীয় সারিতেও নেই। তবে তিনি শিক্ষক। আদর্শ শিক্ষক। যার ভেতরে গানের গ আছে তার ভেতরে আ কার আর দন্ত্য ন না ঢুকিয়ে তিনি ছাড়বেন না, আর যে কণ্ঠে গান নিয়েই জন্মেছে অপালা অথবা সোহমের মতো তারা যে তাঁর কাছ থেকে কী পায়, হার্মোনিয়মের মারফত, এসরাজের মারফত, সেতারের মারফত, সে অনির্বচনীয়কে তারা শুধু নিজেদের গভীরতম সত্তাতেই জানে, ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না।

সবচেয়ে বড় কথা রামেশ্বরের কোনও অভিমান নেই। এবং সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর একটা সামগ্রিক সুসম্বদ্ধ কল্পনা আছে। বলেন 'দেখো আগেকার দিনে ঘরানা ব্যাপারটা গড়ে উঠেছিল কিছুটা পারস্পরিক যোগাযোগের অভাবে, কিছুটা আবার কোনও ওস্তাদের শুদ্ধি-বাতিক বা কৃপণতার জন্যে। পাতিয়ালাব তানের স্পীড, কি আগ্রা ঘরানার বোল তান, কিরানার রাগের বাঢ়ত। এসব খুব শ্রদ্ধেয় বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই। কিন্তু আজকে স্পেস-টেকনলজির যুগে বসে আমরা এগুলোকে যথাসাধ্য একত্র করতে পারবো না কেন? তিনি তাঁর সেরা ছাত্র-ছাত্রীদের তারিক আলি, মুমতাজ খান, ঘনশ্যাম গাঙ্গুলি এঁদের কাছে পাঠিয়েছেন তাদের তান-অঙ্গ আরও চোস্ত করতে। ঠুমরির তালিম নিতে। অপালা যা পেয়েছে, হাত ভরে পেয়েছে। আশাতীত পেয়েছে। যদিও গুরু রামেশ্বর তাঁর স্বাভাবিক বিনয়ে বলেন—'তুমি আমাকে যা দিয়েছো তা তো জানো না মা, তোমরা-দুজনে আমার বসন্তকে ফিরিয়ে এনেছো। নিজের গলায় যৌবনের সে জিনিস তো আর ঈশ্বরের অভিশাপে করতে পারি না। তোমাদের কণ্ঠে তাকে ফিরে ফিরে পাই।'

—'ঈশ্বরের অভিশাপ কেন বলছেন মাস্টারমশাই?' অপালা ব্যথিত বিস্ময়ে বলেছে।

—'ঈশ্বর অহংকার দেখতে পারেন না। চূর্ণবিচূর্ণ করে দেন অহংকারী মানুষকে।' "তুমি যদি সুখ হতে দম্ভ করহ দূর। প্রতিদিন তব গাথা গাবো আমি সুমধুর···" তানপুরায় ঝংকার তুলে রামেশ্বর গেয়ে ওঠেন। ভাঙা-ভাঙা গলা। তার মধ্যে কী গম্ভীর বিষাদ মাখা আকুতি।

—'ঈশ্বর যদি ঈশ্বরই হন তবে তিনি এই সামান্য ত্রুটিতে মানুষকে এতো শাস্তি দিতে পারেন না মাস্টারমশাই।'

—'ঠিক বলেছো। ঠিকই বলেছো মা,' তানপুরাটি সযত্নে নামিয়ে রাখেন রামেশ্বর, অপালাকে লজ্জা দিয়ে বলে ওঠেন 'তোমরা আধুনিককালের মেয়ে, ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা তোমাদের অনেক পরিণত, আমরা তো শুধু যা শুনেছি, তা আউড়ে যাই। রাস্তার ভিখারিও এদেশে দেখবে 'খুদা কি মরজি' কি 'সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা' বলে মরছে। রিয়ালাইজ করে বলছে কি। মোটেই না। দীর্ঘদিনের মানসিক অভ্যাস। আজকালকার ভাষায় মগজধোলাই। হ্যাঁ যে কথা বলছিলুম। ঈশ্বরের অভিশাপ নয়। বলতে পারো সুরদেবতা কিম্বা গন্ধর্বের অভিশাপ। মানুষের যা কিছু নান্দনিক ক্ষমতা এবং বাসনা তার জন্য একটি আলাদা জগৎ আছে মা। সেই হলো গন্ধর্বলোক। সেখানে দেব গন্ধর্ব

বিশ্বাবসু দেখেন সঙ্গীতামৃত সুরক্ষিত আছে কিনা, সেখানে সৃষ্টি হয় মনের আনন্দে। আর আনন্দে সৃষ্টি হয় বলেই সেখানে বেসুর-বেতাল বলে কিছু নেই। সে লোক যেমন তালভঙ্গ সয় না, তেমন তালগর্বও সয় না। 'কথাটা মনে রেখো মা।'

সামনে ঘ্যাঁচ করে একটা গাড়ি ব্রেক কষলো।

—'প্রাণটা বেঘোরেই একদিন যাবে দেখছি। ধ্যান করতে করতে পথ-চলা হয় নাকি ?' গাড়ির স্টিয়ারিং-এ সুবেশ ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বললেন। তখন ভয় বা লজ্জা পাবার সময় নেই, চারিদিকে শুকনো পাতা উড়ছে। ধুলো উড়ছে, চোখে মুখে এসে লাগছে চোখ জ্বালানো ধুলোর ঝাপট। অপালা দেখল আকাশের বাইসনটা খেপে গেছে। মাটিতে ক্ষুর ঠুকছে প্রবল বিক্রমে এবং সামনে থেকে গজলা হরিণের দল মেঘগুলো তাদের ছোট ছোট করুণ পায়ে তুড়ুক দৌড় মারছে। গাড়িটা পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপরই বিষ্টি বিষ্টি বিষ্টি। ক্যাথিড্র্যাল রোড়ের কালো পিচ রাস্তা ধরে কেন যে সে আসছিল ! ভালো লাগে বলে ! বিশাল-বিশাল বনস্পতির সঙ্গ, নিম্নে, মধ্যে, ঊর্ধ্বে সবুজ, তাম্রাভ, কচি, পরিপক্ক প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, কত রকমের সবুজ। এবার সেই অবচেতন ভালো-লাগার মূল্য দিতেই হয়। সোঁদা সোঁদা মহুলগন্ধ তুলে, একদিকের দৃশ্যপট আরেকদিকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, ক্যাথিড্রালের চূড়াটাকে এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে আবার সোজা তীক্ষ্ণ করে দেওয়া তুমুল বৃষ্টি। কোথাও কোনও আশ্রয় নেই। অপালা অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। একেবারে এক ঝাপটায় তার মাথা, তার হলুদ বেগমবাহার শাড়ি, তার অন্তর্বাস সব ভিজে ভারী হয়ে গেল, এত ভারী যে সে আর নিজেকে নাড়াতে পারে না। হাড়ের মজ্জায় পর্যন্ত যেন জল ঢুকে গেল। এ বৈশাখের এই প্রথম বৃষ্টি। অপালা ভুলে গেছে সে কিছুক্ষণ আগে জবরদস্ত বিচারকমণ্ডলীর সামনে থরো থরো তানপুরো নিয়ে বেপথুমান সওয়াল-জবাব চালাচ্ছিল, যা শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে সুন্দর অথচ সপ্রতিভ মনে হয়েছে, সে ভুলে গেছে তার বাড়ি যাওয়ার প্রচণ্ড ভ্রূকুটিময় তাড়া, যা তাকে সোহমের শংকরা শোনার লোভ সম্বরণ করতে বাধ্য করিয়েছে। মল্লার এখন তার শিরায় শিরায় বাজছে। ধমনীতে ধমনীতে বইছে। সে এখন আপাদমস্তক মল্লারে স্নাত ;! সুরদাসী মল্লার, রামদাসী মল্লার ; নটমল্লার, গৌড়মল্লার, মিঞা কি মল্লার···অবশেষে এক তীব্র কেয়াগন্ধী মেঘবর্ণ পুরুষ, তাঁর গলায় নীপ ফুলের মালা··সেই বিশাল ক্রোড়ে সে পুতুলের মতো দুলছে। 'দোলাও আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে···'

কীর্তি মিত্র লেনের মোড়ে নদী বইছে। আধো অন্ধকারে ছপছপ করতে করতে লোকজনের আসা-যাওয়া। শাড়ি-পেটিকোটকে সর্বাঙ্গে ভারী আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছে। বারবার কুঁচির কাছে শাড়ির তলাটা জড়ো করে নিংড়ে নিতে নিতে আসছে অপালা। কিন্তু নিংড়ে নিলে কি হবে ? কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের ওপর তেমন জল না থাকলেও অলিগলিগুলো এখন সব খাল। হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটুর গোছ-ডোবানো উঠোন-জলে যখন সে এসে দাঁড়াল তখন আকাশ-বাতাস এবং গলিভর রং ওঠা মধ্যবিত্ত বাড়িগুলোর চেহারা দেখে

মনে হয় এ বুঝি কোনও ছোটখাটো প্রলয়ের মাঝরাত। গলির মোড়ের আলোটা না জ্বলায় জমা জলের চেহারা একেবারে কালির মতো। পেছন দিকে ছপ্‌ছপ্‌। দাদার গলা—'আজ তোর হবে।' কলতলায় ঢুকে বেশ করে চৌবাচ্চার জলে চান করে, গামছায় চুল নিংড়ে, শুকনো ডুরে শাড়িটার আঁচল বুকের ওপর টেনে দাওয়ার ওপর এসে অপরাধীর মতো দাঁড়াল অপালা। বৃষ্টির কনকনে ঠাণ্ডা জলের তুলনায় বাড়ির চৌবাচ্চার জলটা রীতিমতো গরম। এখন বেশ একটা আরাম লাগছে। কিন্তু গলা গরম করে গান করার পর ওই কনকনে জলে ভেজার ফল গলার ওপর খুব ভালো হবার কথা নয়। সে রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে বলল— 'মা একটু আদা চা হবে ? একটা তেজপাতা আর একটা লবঙ্গ ফেলে দিও,তাতেই দু কাপ হয়ে যাবে।' পেছন থেকে জেঠুর গলা শুনে সে চমকে উঠল— 'প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে মানে অত্যন্ত কুখ্যাত অঞ্চলে গান শিখতে যাও। ভগবানদত্ত গলা আছে মানছি। কিন্তু এই রাত্তির বেলায় সেসব অঞ্চলে ঘোরাফেরা করার যে কী বিপদ, তুমি ছেলেমানুষ হয়ত পুরোপুরি বোঝাতে পারবো না। কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ তো স্ট্রোক হয়ে যাবার মতো হয়েছি। আমি বা বউমা যদি স্ট্রোক-ফোক হয়ে অদড় হয়ে পড়ে থাকি তো এই সংসারের হাল কী হবে সেটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি তোমার হবার কথা। একটি সুতোর ব্যবধান অপু···একটি মাত্র সুতো। তার এদিকে স্বর্গ ওদিকে নরক। যাকে বলে জাহান্নম !' জেঠু পায়ের বেশ আওয়াজ তুলে চলে গেলেন। বিশেষ কাজ না থাকলে তিনি এ সময়ে নীচে নামেন না। অনায়াসেই অপালা এই বিপদটা কাটাতে পারত। কিন্তু জেঠু খুব সতর্ক মানুষ। তিনি সারাক্ষণ খোঁজ রেখেছেন। অপেক্ষা করেছেন এবং কথাগুলিকে শানিয়েছেন। অভিমানে অপুর চোখের কূল ছাপিয়ে উঠছে। সে বলল— 'মা, তুমি কি জানো না আমি রবীন্দ্রসদনে গিয়েছিলুম ? কি কম্পিটিশনে তা-ও বলেছি। আমারটা হবামাত্র চলে এসেছি। আর কারও গান শুনিনি। দীপালিদির না, সোহমের না। আচমকা ঝড়-বৃষ্টি হলে কী করব ? বাস পাই না, কিছু না, কতটা রাস্তা এইরকম ভিজে গোবর হয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসেছি তা জানো ?'

—'আমি বটঠাকুরকে বলেছিলুম। উনি বুঝতে চান না। বোধহয় ভুলেও গেছেন কোথায় গেছিস। ওঁর বউবাজার ভীতি আমি কিছুতেই কাটাতে পারছি না। ভয় যে আমারও নেই তা অবশ্য মনে করো না অপু।'

দাদা বলল—'তোর জন্যে ছাতা নিয়ে আমি একঘণ্টা ট্রাম রাস্তায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। কি করে মিস করে গেলুম বল তো ?'

দুজনেই আদা চা-এ চুমুক দিচ্ছে, মা মস্ত বড় কাঁসার বগি থালার ওপর জেঠুর রুটি-তরকারি বেগুন ভাজা দুধ সাজাচ্ছেন, অপালা বলল— 'অন্ধকার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে তো ঝাঁকে ঝাঁকে ভেজা কাক, কার থেকে কাকে তুই আলাদা করবি ? আজকের বৃষ্টির জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না কি ? এক জনের হাতেও ছাতা দেখলুম না। যখন ঝড় শুরু হল, আমিও তো ভেবেছিলাম, পরশু দিনের মতো আজও ঝড়ের ওপর দিয়েই যাবে।'

দাদা বলল— 'তোর ওস্তাদজী বোধহয় নিজস্ব ঘরানার একখানা বে-নজির

মেঘমল্লার ছেড়েছিলেন। —ব্যাস, ফোঁ ফ্যাঁচ ফোঁত, আকাশ হেঁচে কেশে একেবারে ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলল।'

অপালা চায়ের কাপ ঠকাস করে নামিয়ে রেখে হাতে এক চড় তুলল— 'দাদা ভালো হবে না বলছি!' প্রদ্যোৎ সুযোগ পেলেই রামেশ্বর ঠাকুরের ভাঙা মাঝে মাঝে বেসুর হয়ে যাওয়া গলা নিয়ে এমনি তাঁমাশা করে। ক্লাসিক্যাল গান তেমন পছন্দও করে না। আবদুল করিমের বিখ্যাত ভৈরবী ঠুমরি 'যমুনাকী তীর' ওর কাছে বেড়ালের কান্না। ফৈয়াজ খাঁর নটবেহাগের রেকর্ডটা শুনে বলেছিল তোর ওই ফৈয়াজ খাঁ সাহেব আর আবদুল করিম খাঁকে লড়িয়ে দে, পার্ফেক্ট হুলো-মেনির ঝগড়া হবে।

গান যে বাড়ির সবার কাছে একেবারে অপাংক্তেয় তা অবশ্য নয়। জেঠু পছন্দ করেন কীর্তন। ছোটতে কচি গলায় কীর্তন আর শ্যামাসঙ্গীত দিয়েই অপালার সঙ্গীত-জীবন শুরু হয়। কচি গলায় সে যখন পাকার মতো গেয়ে উঠত 'আমি মথুরানগরে প্রতি ঘরে ঘরে যাইব যোগিনী হয়ে···দে দে আমায় সাজায়ে দে গো' কিম্বা 'আমি স্বখাতসলিলে ডুবে মরি শ্যামা, দোষ কারো নয় গো মা।' তখন পাকা পাকা বৃদ্ধরাও আহা আহা করে উঠতেন। বুড়িদের মজলিশেও তাকে প্রায়ই ডেকে নিয়ে যাওয়া হতো—চোখের জল বার করবার জন্যে। মা এসব ছাড়াও ভালোবাসতেন রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, এঁদের গান। কাছাকাছির স্কুল ফাংশন, পাড়া-জলসা ইত্যাদি ঘটনায় ছোট্ট অপুর আসন ছিল পাকা। আর এই রকম একটা রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে তার ছোট্ট কণ্ঠে 'বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী' গানটি শুনে অবাক হয়ে রামেশ্বর ঠাকুর তাকে যাকে বলে একেবারে পাকড়াও করে ধরেন।

বৃষ্টি অনেকক্ষণ থেমে গেছে। ভেজা হাওয়ার সঙ্গে জুঁইয়ের গন্ধ ঢুকছে তেতলার ছাতের ঘরে। এ ঘরটা দাদার। কিন্তু অপু ঘরটাতে সমানেই ভাগ বসায়। এখন দাদা সিগারেট খেতে খেতে ছাতে ঘুরছে, অনেকক্ষণ ঘুরবে এইভাবে। এটা ওর রাতের বিলাস। ছাত থেকে হাওয়ায় সিগারেটের গন্ধ ওপরে উড়ে যাবে, মা বা জেঠু টের পাবে না। দাদার এই ধারণা। অথচ আজকাল দাদার জামা কাপড় মুখ সব কিছু থেকে সিগারেটের গন্ধ বেরোচ্ছে। বললে বিশ্বাস করবে না। বারণ করলে বলে—'তোর যেমন গানের নেশা, আমার তেমনি ধোঁয়ার নেশা।' —'দুটোতে কোনও তুলনা চলে?' অবাক হয়ে অপালা বলে, 'আমি গানের জন্যে কত সাধনা করি, কত কষ্ট করি, আনন্দ পাই, আনন্দ দিই, তোরটা তোর ক্ষতি করছে, আমারটা কি তাই?'

—'বাঃ আমি সাধনা করি না? গলায় ধোঁয়া নেওয়া রীতিমতো সাধনাসাপেক্ষ তা জানিস।· এই দ্যাখ আমি রিং ছাড়ছি একটার পর একটা, তুই যেমন কতকগুলো সুরের চক্কর ছাড়িস। আর তুই ভাবছিস তোর নেশাটা ইনোসেন্ট, ক্ষতি করবে না? অফ কোর্স তোর ক্ষতি করবে। বদ্‌সংসর্গে পড়বি, সংসারে অশান্তি হবে গাইয়ে মেয়ে নিয়ে, রেজাল্ট খারাপ হবে···'

দাদার কথার অবশ্য কোনও মানেই হয় না। সিগারেটের নেশার সঙ্গে গানের নেশার তুলনা সে-ই করতে পারে যে আবদুল করিমের গানে বেড়ালের কান্না শোনে। তবু কথাগুলো বুকের মধ্যে বিঁধে থাকে। তার রেজাল্ট খারাপ

হবে…সে বদসংসর্গে পড়বে… সংসারে অশান্তি হবে। হাঁটুর ওপর থুতনি দিয়ে তক্তপোশের ওপর সে বসে থাকে। বসে থাকতে থাকতে কখন ভুলে যায় চিলেকোঠার ঘর, কীর্তি মিত্র লেন। চলে যায়, রবীন্দ্রসদন। জমজমাট হল। গমগম করছে। আলো নিভে গেল অডিটোরিয়ামে। মঞ্চের একধারে বিচারকদের আসন। তানপুরার আড়ালে অর্ধেক মুখ লুকিয়ে সে গাইছে, গেয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ যেন তার সঙ্গে অনেকে গেয়ে ওঠে, আরো অনেক স্বর মিশে যাচ্ছে তার স্বরে। মুখটা কে আরম্ভ করলেন ? কেসরবাই কেরকার ? কিরকম একটা অদ্ভুত কূট কাজ দিয়ে আরম্ভ করলেন। আহা আহা করে উঠল কারা হল থেকে। বিলম্বিত একতালে বিস্তার শুরু করেছেন মঘুবাই। ধীরে ধীরে বাড়ছেন। সঙ্গে কণ্ঠ দিচ্ছেন কোকিলের গলায় রোশেনারা বেগম। ঝরনার মতো তান ঝরে পড়ছে হীরাবাঈয়ের গলা থেকে। ছোট ছোট টুকরা লড়ি পেশ করছেন সরস্বতী। নিজের কণ্ঠও শুনতে পেলো অপালা—সুনি ম্যঁয় হরি আওন কী আবাজ। কখনও এমন হবে কিনা। এই সমস্ত ভারতবর্ষীয় কোকিল-দোয়েল-শ্যামা-বুলবুলদের উত্তরাধিকার কণ্ঠে নিয়ে সে গেয়ে যেতে পারবে কিনা—এ প্রশ্ন তার এই সুরেলা, কালবৈশাখী-অন্তের সিক্ত দিবাস্বপ্নে আদৌ প্রবেশ করে না। এ প্রশ্ন যে উঠতে পারে এ ধারণাই তার এখন নেই। বসে বসেই অপালা ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিনের উত্তেজনায়, প্রত্যাশায়, ক্লান্তিতে, তৃপ্তিতে। অনেক তৃপ্তিতে। অনেক রাতে মা যখন ডাকতে এলেন, তখন তার দাদাও তাব পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দাদা শুয়ে, বোন হাঁটুতে মুখ গুঁজে। জুঁইয়ের গন্ধের সঙ্গে মিশে আছে সিগারেটের মৃদু গন্ধ। মা ডাকলেন—'অপু, এই অপু নীচে চ'। রাত সাড়ে এগারটা বাজল।' ঘুমে অসাড় হাত-পা চলে না, কোনমতে দেয়ালে ভর দিয়ে নেমে আসতে আসতে অপালা ভারী গলায় বলল— 'ছাতের ঘরটা আমায় দাও না মা !'

—'তুই একা ছাতের ঘরে শুবি ? মাথা খারাপ নাকি ?'

—'আমার রেওয়াজের সুবিধে হয়। দাদাটা বড্ড বেলা করে ওঠে।'

—'তাহলে খোকা কোথায় থাকবে ?'

—'রান্নাঘরের পাশের ঘরটা তো পরিষ্কার করে দিতে পারো। না হয়, তোমার সঙ্গেই থাকল।'

—'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোর ? অতবড় ছেলের একখানা নিজস্ব ঘর না হলে চলে ?'

—'আর এতো বড় মেয়ের বুঝি দরকার হয় না কিছুর ?'

সে কথার জবাব না দিয়ে মা বললেন— 'মাঝরাতে আর জ্বালাসনি অপাই, চল।'

॥ ২ ॥

তখন ধূপছায়া রঙের ভোরবেলা। দরজার কড়া-নাড়ার আওয়াজ শুনে অপালার মা সুজাতা প্রথমটা পাশ ফিরে শুয়েছিলেন। আবার ঠকঠক, তবে তো তাঁদেরই বাড়িতে। ঠিকে-ঝি এত সকালে এলো আজ। যাই হোক, এসেছে

যখন এখুনি দরজা না খুললে বিপদ। তিনি ধড়মড় করে নীচে নেমে দরজা খুলে দিয়েই লজ্জায় মাথায় কাপড় টেনে দিলেন।

—'ওমা, মাস্টারমশাই। আপনি এখন এতো সকালে!'

—'কেন দিদি, এতো সকালে আসার কোনও কারণ অনুমান করতে পারেন না? অপালা কোথায়? ঘুমোচ্ছে?'

—'হ্যাঁ মাস্টারমশাই।'

—'নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে বেটি! বাঃ এই তো চাই। প্রকৃত শিল্পীর লক্ষণ। আমি তো সারাটা রাত উত্তেজনায় ঘুমোতে পারিনি দিদি। কখন ট্রামের ঘন্টি বাজবে। না আছে হাতের কাছে একটা টেলিফোন, না একটা গাড়ি-ঘোড়া। সারাটা রাত ছটফট করেছি।'

—'আচ্ছা। আপনি ভেতরে এসে বসুন তো আগে!' মাস্টারমশাই-এর হাতে সেই বিশাল তুম্বিঅলা মেহগনি পালিশের তানপুরা।

দাওয়ায় শতরঞ্জি বিছিয়ে তাঁকে বসিয়ে সুজাতা তাড়াতাড়ি ওপরে গিয়ে অপালাকে ঠেলে তুললেন। —'অপু শীগগিরই নীচে যা। তোর মাস্টারমশাই এসে বসে রয়েছেন।'

ধড়মড় করে উঠে বসল অপালা, চোখ থেকে ঘুম কাটেনি। তাড়াতাড়ি করে মুখে-চোখে জল দিয়ে শাড়ি বদলে সে যতক্ষণে নীচে এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে তার মা কাপড় ছেড়ে চা করতে লেগে গেছেন। ভোরের ধূপছায়া ভাবটা কাটতে শুরু করেছে সবে। এবার সত্যি-সত্যি ঠিকে লোকের কড়া নড়ল।

অপালা মাস্টারমশাইকে প্রণাম করে দাঁড়াল। তার চোখে মুখে দ্রুত ঝাপটার জল চিকচিক করছে। কুচো চুলগুলোর আগা থেকে জলের ফোঁটা দুলছে। হালকা বেগুনি রঙের একটা শাড়ি কোনমতে গায়ে জড়িয়েছে। কিছু বলছে না।

—'অনুমান করতে পারছো মা, কেন এসেছি?'

যে শুভসংবাদটা সে প্রত্যাশা করেছে সেটা মুখে ফুটে বলতে পারছে না অপালা। কিন্তু তার সমস্ত চোখমুখ ভেতরের আভায় উদ্ভাসিত হয়ে যাচ্ছে।

—'প্রথমেই বলে রাখি মা, হতাশ হয়ো না। তুমি কিন্তু প্রথম হওনি। প্রথম হয়েছে সাদিক হোসেন। শিলং থেকে এসেছে। গেয়েছে ভালোই, একেবারে ব্যাকরণসম্মত। কিন্তু তুমি যা গেয়েছো মা তার তুলনা নেই। ক্রিকেট দেখো?'

অপালা হেসে ফেলে বলল— 'না।' যদিও দাদার কল্যাণে ক্রিকেটের নাড়ি-নক্ষত্র তারও অজানা নেই।

—'দেখা থাকলে বলতাম কুপার-হান্ট এদের খেলার সঙ্গে কানহাই সোবার্সের খেলার যে পার্থক্য এ তাই। গাইছে ভালো। তৈরি গলা। যদিও সে গলার কোয়ালিটি আহা-মরি কিছু নয়। সবই বেশ যথাযথ করল। কম্পিটেন্ট। বাস। তবে আমি আচার্য, আমি আশা করব, আশীর্বাদ করব সবাই বড় হোক। ভালো হোক। সে আমার ছাত্রই হোক আর অন্যের ছাত্রই হোক। গোপনে বলি, তুমি স্বয়ং পণ্ডিতজীর হাতে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছো। জনৈক

বিচারক, নাম করব না, তাঁর হাতে অসম্ভব নম্বর পেয়ে সাদিক তোমার থেকে দু নম্বরে এগিয়ে গেছে। তুমি দ্বিতীয় হয়েছো অপু। কিন্তু তোমারই প্রথম হওয়ার কথা, সেই প্রথম পুরস্কার ওরা না দিলেও আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম।' মাস্টারমশাই তানপুরাটির দিকে তাকিয়ে বললেন— 'এ তম্বুরা আজ থেকে তোমার।' সুজাতা চা নিয়ে এসেছেন। কয়েকটা বিস্কুট। এতো সকালে তিনি আর কিছু জোগাড় করে উঠতে পারেননি। তাঁর দিকে তাকিয়ে রামেশ্বর বললেন—'দিদি, অপুর জীবনে একটা মস্ত বড় সুযোগ এসেছে। ও একটা স্কলারশিপেরও স্কলারশিপ পাচ্ছে। লাখে একটা। লখ্‌নৌ-এর নাজনীন বেগম ওকে ঠুম্‌রির তালিম নিতে ওঁর কাছে ডেকেছেন। অপু তুমি তো জানো, বছরে দু-এক জন ছাত্র-ছাত্রীকে উনি এভাবে নিয়ে থাকেন। ওঁর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা মহাল আছে। সেখানে কারও জাতপাতের নিয়ম লঙ্ঘন না করে উনি তাদের খাওয়া-শোয়ার বন্দোবস্ত করেন। রাজার হালে থাকবে। প্রাণভরে শিখবে। নাজনীন বেগম সাহেবার তালিম মানে তুমি ভারতের এক নম্বর ঠুমরি-দাদরা-গজল গায়িকা হয়ে গেলে।' সুজাতার দিকে তাকিয়ে রামেশ্বর বললেন— 'দিদি মেয়ে আপনার ষাট-সত্তর বছরের পুরনো হার্মোনিয়মে গান সেধেছে। মাইল মাইল ঠেঙিয়ে পরের বাড়ি গিয়ে তানপুরায় রেওয়াজ করেছে। আজ তাই ঠাকুর নিজে যেচে এসেছেন। দু-চার দিন চিন্তা করে নিন। তারপর মেয়েকে এ সুযোগটা নিতে দিন। কোনও দিক থেকেই কোনও অসুবিধে নেই। এই আমার অনুরোধ।'

অপালা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। নড়তে পারছে না। তার সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলছে। নাজনীন বেগম! নাজনীন বেগম ছিলেন নাকি তার ওই শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে? বিচারের আসনে তো কোনও মহিলাকে দেখেছে বলে মনে পড়ছে না। তবে ভালো করে তাকায়ওনি সে। পণ্ডিত চন্দ্রকান্তকে দেখেই তটস্থ হয়ে গেছে। নাজনীনের পুরো রেকর্ডের সংগ্রহ তাকে উপহার দিয়েছেন মাস্টারমশাই। তার যা কিছু মূল্যবান প্রিয়তম উপহার সবই মাস্টারমশাইয়ের দেওয়া। শেষ সংযোজন হল তাঁর নিজের ব্যবহৃত ঐতিহ্যময় এই তানপুরো। এই যন্ত্রটাকে কানের পাশে ধরে সে যখন এর চার তারের ওপর দিয়ে আঙুল চালায় তার শরীরের ভেতর মর্মে মর্মে সুর পৌঁছে যায়, মনে হয় সে যেন শুনতে পাচ্ছে বিশ্বের সেই আদি ধ্রুবপদ যার তানে সুরব্রহ্ম এই বিশ্বকে বেঁধে দিয়েছেন। নাজনীন বেগম এখন প্রকাশ্য কনফারেন্সে বড় একটা গান না। তিনি গান একেবারে সোজা বড় বড় গাইয়ে-বাজিয়েদের নিজস্ব ঘরোয়া আসরে। লখনৌ-এর এক মস্ত শিল্পপতি কোথাকার মহারাজ কুমারকে বিয়ে করবার পর তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। অনেকে আবার বলে তিনি আজকাল তাঁর ইষ্টকেই শুধু গান শোনান। মোট কথা নাজনীন বেঁচে থাকতেই এখন কিংবদন্তী। লেজেন্ড। এর ওর কাছ থেকে শোনা কথা গেঁথে অপালা মনশ্চক্ষে দেখে দুধারে ঝাউ, বেঁটে-বেঁটে ঝাউ। মাঝখান দিয়ে পথ চলে গেছে নাকি অন্তত কোয়ার্টার কিলোমিটার। এ পথের শেষে গম্বুজঅলা একটি দোতলা হর্ম্য। তার মধ্যে সাদা পাথরের ঘর ; সেখানে বেগম গান করেন এক শূন্য, মূর্তিহীন ঘরে, যা

মসজিদও নয়, মন্দিরও নয়। কিন্তু আত্মিক দিক থেকে দেখতে গেলে সরস্বতীর খাসমহল। দোতলার জাফরির মধ্য দিয়ে নাজনীন তাঁর এই খাসমহলে আগন্তুক গানের পথিকদের দেখেন। মহারাজকুমারের সঙ্গে নাকি তাঁর চুক্তি বছরের মধ্যে ছ মাস অন্তত তাঁকে তাঁর গানের কাছে সমর্পিত থাকতে দিতে হবে। তাতে কোনও অসুবিধে নেই কারণ নাজনীনের স্বামী বেশির ভাগ সময়েই ব্যবসায়িক কারণে ভ্রমণরত থাকেন। তাঁর হেড-অফিসই লন্ডনে। নাজনীনের এই আমন্ত্রণের অর্থ, ছ মাস তাকে লখনৌ থাকতে হবে। সরাসরি বেগমের কাছে তালিম। অপালা কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি। সুদূরতম কল্পনাতেও না। গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে যেসব বেদিয়ারা রাস্তায় রাস্তায় গান করে বেড়ায় তাদের যন্ত্রগুলোর থেকেও অনেক খারাপ তার হারমোনিয়ামটার অবস্থা। তাছাড়াও ক্রোম্যাটিক স্কেলে বসানো বলে হারমোনিয়মে মার্গসঙ্গীতের স্বরগুলো ঠিকমতো আসে না। বড় বড় শিক্ষকরা হারমোনিয়াম ব্যবহার করতে একরকম নিষেধই করে দেন। তার যন্ত্রটার একটা রীডে চাপ দিলে অন্য একটি বেসুরে বাজতে থাকে। কোন কোনটা থেকে স্বরই বেরোয় না। দাদাকে অনেক খোসামোদ করে সে হারমোনিয়ামটাকে সারাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বিশেষ কিছুই হয়নি। দোকানে বলে— 'এটাকে এবার ফেলে দিন, এটা জাঙ্ক হয়ে গেছে।' তা সেই হারমোনিয়ামেই তার আজন্ম গান সাধা। মাস্টারমশাই যখন তাকে জোর করে ছাত্রী বানালেন, প্রতিদিন সন্ধ্যেয় তাঁর বাড়ি গিয়ে সে রেওয়াজ কবত। পরীক্ষা বা প্রতিযোগিতাগুলোর আগে মাস্টারমশাই তাকে একটা ছোট তানপুরা ধার দিতেন। এই বড় দামী তানপুরা এ বাড়িতে আনতে ভয় হত তার। কোথায় রাখবে? কোনও আলাদা চৌকি নেই। চৌকি রাখবারও জায়গা বিশেষ নেই। দাদা অনেক রাত পর্যন্ত পড়বে। আর বেলা করে উঠবে। দাদার ঘরেই থাকে তার গানের সরঞ্জাম। ভোরবেলা ছাতের ওপর মাদুর পেতে সা পা সা টিপে দিনের পর দিন সে পাল্টা সেধেছে।

মাস্টারমশাই যাবার সময়ে মাথায় হাত রাখলে অপালার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। মাস্টারমশাই বললেন— 'মনে করো না অপু তোড়ি গাওয়ার জন্য তোমার স্থান নীচে নেমে গেল। ওইটুকু সময়ের মধ্যে তোড়ির আলাপে তুমি রূপটি এতো অপরূপ ফুটিয়েছিলে যে পণ্ডিতজীর কিছু মনে আসেনি। গান ধরতে, তখন সম্বিৎ ফিরে আসে। উনি আমাকে জনান্তিকে বললেন— "এ রত্নটিকে কোথা থেকে আহরণ করলেন রামবাবু!" সভায় সব গুণিজনও তোমার গান শুনে অভিভূত হয়ে গেছেন। আমার ধারণা তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় বেশি দেওয়া হয়েছে ইচ্ছে করে মা, ছুতো করে, তোমার গান আরেকটু শোনবার জন্যে। তোমাকে আমি কোমল ধৈবতের পুরিয়া শিখিয়েছি। এ ধৈবত সাধারণ কোমল ধৈবতের থেকে একটু উঁচু শ্রুতিতে। হারমোনিয়মে আসে না। উনি তোমার ওই ধা-এর বিউটি তোমার গান্ধারে আর নিখাদে দাঁড়ানো শুনতে চাইছিলেন বারবার। দ্রুত বন্দেশে তুমি মারোয়ায় যাও কিনা দেখতে অত্যন্ত উৎসুক হয়েছিলেন।'

॥ ৩ ॥

অবিকল বৃষ্টি-ধোয়া গন্ধরাজ ফুলের মতো সকাল। আকাশ এখন নিকোনো তকতকে, স্বয়ং গোপাল-গোবিন্দর গায়ের রঙটি চুরি করে পরে ফেলেছে। গাছপালাগুলোও যেখানে যা ছিল সব তেমনি সাবান মেখে নেয়ে-ধুয়ে দ্যুতিময় সবুজ পরিচ্ছদে সেজেছে। আশীর্বাদের মতো সকাল। অপ্রত্যাশিতভাবে প্রবাসী প্রিয়জনের ফেরার মতো সকাল। জানলার বাইরে থেকে গোছা গোছা রাধাচুড়োর ডাল ঘরের ভেতর অনুপ্রবেশ করবার চেষ্টা করছে। পর্দাগুলোও খুব সুন্দর একটা হালকা সবুজ। তাই সকালের এই বিশ্বজোড়া আলোর মধ্যেও ঘরের ভেতর কেমন একটা সবুজাভ অন্ধকার। অন্য দিন হলে এমন একটা সকালে জেগে উঠতে সোহমের দারুণ লাগত। পৃথিবী সকালের মুখ দেখারও কত আগে সে তার নিজস্ব, একদম একলার ঘরে তানপুরো নিয়ে ভৈঁরো সেধে যেত। আরম্ভ করত মন্দ্র সপ্তকে, ধীরে ধীরে বাড়িয়ে মধ্য-সপ্তকের পা পর্যন্ত বাস। আবার ফিরে আসা, আবার ভিন্ন পথে ভিন্ন মিড়ে সুরের ক্ষুরধার অলিতে গলিতে ঘোরাফেরা। কিন্তু আজ তার উঠতে ইচ্ছে করছে না। শরীরটা ভারী হয়ে আছে, মন ততোধিক ভারী। সে জানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একবার মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি যাওয়া দরকার। মাস্টারমশাই তো আশা করবেনই। উপরন্তু মিতুল অপেক্ষা করে থাকবে। কিরকম গান শুনল। কারটা কি রকম সব ক্যারিকেচার করে দেখাবে মিতুল। কিন্তু সোহম শুধু এপাশ থেকে ওপাশ ফিরে শুলো। একবার আধবোজা চোখ দিয়ে দেখে নিল মাথার কাছে রাখা টাইমপিসটাতে নটা বেজে গেছে। আরও কিছুক্ষণ সে গড়াবে। তাদের বাড়িতে কারুর প্রাইভেসি, স্বাধীনতা কেউ নষ্ট করে না। মা বেঁচে থাকলে হয়ত এসব অভিজাত নিয়ম মানত না। কিন্তু মা তার তেরো কি চোদ্দ বছর বয়স থেকে সামনে চুল ফেরানো মাথায় আধঘোমটা দেওয়া এক সারদাদেবী গোছের ছবি হয়ে তার পায়ের দিকের দেওয়ালে ঝুলছে। ঘুম ভাঙলেই প্রথম চোখ পড়ে এই ছবিটার ওপর। বউদিদের কারও এতো আগ্রহ বা সাহস নেই যে পরিবারের এই সৃষ্টিছাড়া ছেলেটিকে নিয়ন্ত্রিত করে। সকলেই অবশ্য তাকে ভালোবাসে, সমীহও করে। সমীহ করে তার এই বিশেষ গুণকে, যা পরিবারের আর কারো নেই। সোহম তার পরিবারের বিস্ময়। তাদের বংশানুক্রমিক প্রেসের ব্যবসা। কিন্তু তার বাবা নিজে তো উচ্চশিক্ষিত বটেই, তার তিন দাদাও রেডিওফিজিসিস্ট, অর্ডন্যান্সের বড় অফিসার এবং কেমিস্ট। মাঝখান থেকে সে-ই গানের সঙ্গে কেমিস্ট্রি ল্যাব চলবে না বলে সায়েন্স ছেড়ে দিয়ে এক বছর নষ্ট করে স্ট্রীম বদলালো। এবং হু হু করে গানের জগতে ওপরে উঠতে লাগল। ব্যাপারটা তার অ-শিল্পী কিন্তু উচ্চশিক্ষিত পরিবারে প্রথম প্রথম অস্বস্তি জাগাত, এখন সম্ভ্রম জাগায়। তার বাবা মনে মনে আত্মপ্রসাদের সঙ্গে ভাবেন—'আমার সব ছেলেগুলিই ট্যালেন্টেড কে জানে ছোটটা সবচেয়ে বেশি কিনা।'

দ্বিতীয়বার পাশ ফিরতে যাচ্ছে, ঘরে কে ঢুকছে মনে হল। মেজ বউ-দি নাকি? তার মাঝে মাঝে এ ধরনের সাহস এবং ইচ্ছে হয়। ভালো করে চোখ

মেলে সোহম দেখল দীপালি। এরকম অবস্থায় তার পক্ষে শুয়ে থাকা সম্ভব নয়। ভেতরে ভেতরে ভীষণ লজ্জা পেয়ে—'আরে দীপালি নাকি, বোসো, বোসো, প্লীজ, আমি বাথরুম থেকে আসছি।' চোখ কচলাতে কচলাতে একদম এক লাফে সে বাথরুমে পৌঁছে গেল।

দীপালি সোহমের বাড়ি প্রায়ই আসে। অপুর বাড়িও যায়। কিন্তু সোহমের বাড়িতে যে ধরনের অবারিত দ্বার, স্বাধীনতা, আধুনিক রুচি-মেজাজ ও আতিথ্য তা তো অপুর বাড়ি নেই। এখানে তুমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সোহমের সঙ্গে গল্প করো, গান করো, কেউ না ডাকলে উঁকি দিয়েও দেখতে আসবে না, সোহমের ফরমাশ মতো খাবার পৌঁছে যাবে হোটেলের ক্ষিপ্রতায় এবং কেতায়। ওদিকে অপু তার খুব প্রিয় হলেও অপুর তো নিজস্ব একটা ঘরই নেই। নেই দীপালিরও! তারা তিন বোন এক ঘরে শোয়। কিন্তু তিনজনেই বোন তো! অপুর যা কিছু নির্জনতা তার চিলেকোঠায় ঘরে। সে ঘর তার দাদার। স্বভাবতই তার দাদা এবং দাদার বন্ধুরাও অনেক সময়েই ঘরখানা অধিকার করে থাকে। তার জ্যাঠামশায়ের শেয়ারে অবশ্য দুখানা ঘর—একখানা শোবার, একখানা বসবার। কিন্তু সেদিকে অপু কেন বাড়ির কেউই পারতপক্ষে যায় না। বাকি রইল একখানা ঘর। যেটাতে অপু তার মায়ের সঙ্গে শোয়। সে ঘরে খাট, আলনা, বাড়তি বিছানার মাচা, খাটের তলায় হাঁড়ি কুঁড়ি, চৌকিতে সেলাই-কল, কি আছে আর কি নেই হিসেব করতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। একতলার এক দিকটা ভাড়া। সেদিকের উঠোনের অংশটা তো প্রায়ই খুব অপরিষ্কার হয়ে থাকে। এদিকে রান্নাঘর। সামনে দাওয়া, আর একটা ছোট্ট ঘর, যেটাকে ওরা গুদোম ঘর বলে ব্যবহার করে। বাথরুমে যেতে হলে উঠোন পার হয়ে যেতে হবে। দোতলাতেও অবশ্য একটা ছোটমতো আছে, জ্যাঠামশাইয়ের অংশের লাগোয়া, তাতে তোলা-জল থাকে। জলের হিসেবে কম পড়লেই, কাউকে না কাউকে নিচ থেকে এনে ঢাউস বালতিটা ভর্তি করে রাখতে হবে।

অপুকে ভালো লাগলেও অপুর বাড়ি যেতে ভালো লাগে না দীপালির। তারা পাঁচ বোন। অপুর মতোই পিতৃহীন। কিন্তু মা এবং পাঁচ বোন মিলে তাদের ফাটা সিমেন্টের মেঝে, চৌপাল্লার জানলা, জায়গায় জায়গায় আগড়হীন দরজা এবং সাবেক কালের আলমারি, পা-মেশিন, ট্রাঙ্ক-বাক্স, দেরাজ-আয়না এতো গুছিয়ে রাখে যে অল্প জায়গাকেও অল্প বলে মনে হয় না। তার বড়দি পাশ করা নার্স, মেজদি স্কুলের সেলাই-টিচার, সেজ জন একদিকে নাচ শেখে আর একদিকে রাজ্যের পুঁচকে পুঁচকেকে নাচ শেখায়, চতুর্থ সে। সে-ও গান শিখিয়ে ভালোই উপার্জন করে। ছোট এখনও স্কুলে, কিন্তু হলে হবে কি এতো ভালো সাজাতে পারে, আলপানা দিতে পারে যে বিয়ের মরশুমে তাকে নিয়ে রীতিমতো কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। এবং কোনটাই সে একেবারে বিনা দক্ষিণায় করে না। ফলে তাদের সংসার মৌচাকের মতো বিন্দু বিন্দু মধু দিয়ে ভরা। সবার ওপরে রানী মৌ মা। সংসারের কর্তৃত্ব এবং তাদের পাঁচ বোনের পরিচালনার দায়িত্ব মোটামুটি তাঁরই হাতে। সকলেই স্বাবলম্বী। সকলেই হিসেবী, গোছালো। তাই তাদের পয়সা-কড়ির অভাবও তেমন কিছু নেই।

যদিও প্রত্যেককেই অসম্ভব খাটতে হয়। মা চান, এইবার একটি একটি করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতে। কিন্তু কিছুতেই, একটা মেয়েরও বিয়ে হচ্ছে না, অথচ প্রত্যেকে গুণী, প্রত্যেকে স্মার্ট, গৃহকর্মনিপুণা। দেখতে-শুনতেও অল্পবিস্তর সুশ্রী। দীপালি হেসে বলে—'ব্যাপারটা কি জানিস অপু হবু জামাইরা এতগুলো শালী দেখে ভড়কে যায়, ভাবে সব গুলোই বুঝি ঘাড়ে চাপবে।'

সোহম এই বাড়ির এক চতুর্থাংশের অধিকারী। দোতলায় তার শোবার ঘর এবং পড়া ও গানের ঘর পাশাপাশি। এছাড়াও আছে, ঘরের সঙ্গে টয়লেট, চমৎকার একটি ব্যালকনি এবং ছোট্ট একটু কিচেনেট। সোহমদের বাড়ির তিন চারটি কাজের লোকের মধ্যে একটি বনমালী। তাকে আদেশ করলেই সে ছোটবাবুর ফরমাশমতো খাবার-দাবার ঐ ছোট্ট রান্নাঘরে বানিয়ে দেয়। বউদিদের কাউকেও ফরমায়েশ করতে হয় না। আর নানা ধরনের মজলিশ সোহমের ঘরে যখন তখনই হয়। তার কলেজের বন্ধু, গানবাজনার জগতের বন্ধু, পাড়াতেও সে অঢেল পপুলারিটি পায়।

দীপালি দক্ষিণের দিকে তাকালো চমকে। চমৎকার একটা গন্ধ ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে ভেসে এলো। ওদিকেই সুন্দর ঝুলবারান্দাটা। সবুজ-পর্দাগুলো লেসের, সরু সরু, ছোট্ট ছোট্ট কাঁচুলির মতো। তাদের ওপর দিয়ে, ভেতর দিয়ে হাওয়া আসছে। মাথার ওপর ঘুরছে বাজারের সবচেয়ে দামী ফ্যান। খাটের উল্টোদিকে দেওয়াল জোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি। কোনও আর্টিস্টের আঁকা তেলরঙ। এই পাহাড় দেখতে দেখতে রোজ ঘুমোয় সোহম। খাটের পায়ের দিকে ওর মায়ের রঙিন ছবি। বেশ ভালো করে রি-টাচ্ করা।

এর আগে কখনও ঠিক এই ঘরটিতে এসে বসেনি দীপালি। পাশের ঘরটাই সোহমের আড্ডাখানা। সেটাকে গানঘরও বলা যায়। মেহগনি কাঠের, কাচের পাল্লা বসানো দেরাজে পর 'পর শোয়ানো আছে তানপুরো তানপুরো আর একটা, বাঁয়া তবলা, একটা সারেঙ্গি। শখ করে এটাও মাস্টারমশায়ের কাছে শিখছে সোহম। আজকে বাড়িতে ঢুকতে প্রথমেই মেজ বউদির সঙ্গে দেখা। ইনি বেশ মাই-ডিয়ার গোছের বউদি। ফিজিক্স-বউদি অর্থাৎ বড়বউদির মতো গম্ভীর-গাম্ভার অল্পভাষী নয়। ওকে ঢুকতে দেখে মেজ-বউদি বললেন 'ওমা, দীপালি, তুমি এতো সকালে?' দীপালিকে এঁরা সবাই পছন্দ করেন। সে সপ্রতিভ, সে পরিচ্ছন্ন, ফ্যাশনদুরস্ত। তার সাজপোশাক, কথাবার্তা চালচলন দেখলে কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না সে ভবানীপুরের একটা বারো ফুট গলিতে এক তলার দুখানা ঘর, এক চিলতে উঠোন, একটা টিনঘেরা কলঘর নিয়ে থাকে। এতো সকালেই দীপালির প্রসাধন সারা। আসলে দীপালি যখনকার যা তখনকার মতো প্রসাধন ছাড়া বেরোনোর কথা কল্পনাই করতে পারে না। অপুর মতো তেল চকচকে মাথা, নাকের ডগা লাল, মুখে পাউডার নেই, ব্লাউজে সেফটি-পিন—এসব তার চিন্তার বাইরে। সে রঙ মিলিয়ে নীল রঙের হালকা, সিনথেটিক শাড়ি-ব্লাউজ পরেছে। দেশীই কিন্তু দেখলে মনে হবে বাইরের। তার চোখে কাজল, ঠোঁটে ঈষৎ লিপস্টিক, হাতে দামী বিদেশী

ঘড়ি—এসব কোথায় কম দামে পাওয়া যায়, তার নাড়ি-নক্ষত্র দীপালির জানা। পায়ের চটিটি পর্যন্ত নেভিব্লু রঙের, রঙ মেলানো, সে মেজবউদির কথার উত্তরে হেসে বলেছিল—'কেন, বুঝতে পারছেন না বউদি ? সোহমকে কংগ্র্যাচুলেট করতে, আবার কি ? আর খুব সকালও নেই। নটা বেজে গেছে, গাইয়েদের সকাল অনেক আগে হয়। আপনি রেজাল্ট জানেন না ?'

—'কি করে জানবো ভাই ? কাল মাঝরাত্তিরে কেলে হাঁড়ির মতো মুখ করে এসে শুয়ে পড়ল, কিছু খেল না, দেলো না, বাবা বললেন,—"অতবড় কম্পিটিশন। নিশ্চয়ই খাইয়েছে। ওকে এখন বিরক্ত কর না।"

দীপালি বলল—'কোনও মানেই হয় না। সোহম থার্ড এসেছে। পুরো ইস্টার্ন রিজিওনের ট্যালেন্ট সার্চ কম্পিটিশন করেছে সুরলোক। একেবারে কনফারেন্স স্টাইল। সেখানে খেয়ালে থার্ড হওয়া ইয়ার্কি নাকি ?'

—'তাই বলো'—মেজ বউদি লম্বা চুলের তলায় গিঁট বাঁধতে বাঁধতে বললেন। তাকিয়ে তাকিয়ে দীপালি ভাবল—অন্তত রঙে সে সোহমের মেজবউদির কাছে হারছে না। চুলও তার একটু একটু কোঁকড়া, মেজবউদির গুলো একেবারে সোজা।

—'তাই বাবুর রাগ হয়েছে।' মেজ বউদির মুখে হাসি, 'ফার্স্ট কে হল ? অপালা মিত্র ?'

—'নাহ !' দীপালি হতাশ ভঙ্গিতে বলল—'অপালাও না। সাদিক হোসেন বলে কে একটি আসামের ছেলে, কোনদিন নামও শুনিনি। অপালা সেকেন্ড এসেছে।'

মেজ বউদি বললেন— 'তুমি সোজা ওর ঘরে চলে যাও। বেলা নটা পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। আমি চা-টা সব পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাল রাত-উপোসী আছে, উঠেই খাই খাই করবে।'

বউদির অনুরোধ এবং অনুমতির সূত্র ধরেই দীপালির প্রথম এই ঘরে ঢোকা। পর্দা দুহাতে সরিয়ে ঘরে ঢুকতে তার কেমন গা শিরশির করছিল। ছেলেরা কেমন করে শুয়ে থাকে কে জানে। কে জানে খালি গায়ে নাকি ? সোহমের বুকে সামান্য চুল আছে, তার খোলা শার্ট বা পাঞ্জাবির মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যায়। অনেক কষ্টে নিজের ভেতরের শিরশিরোনি থামিয়ে সে ঘরে ঢুকেছে এবং ঢুকে অবাক হয়ে গেছে। এতো পরিচ্ছন্ন, এতো সুবাসিত, এতো সুন্দর ও শালীন যে একটা এই বয়সের ছেলের ঘর হতে পারে সে ভাবতেও পারেনি। উত্তর-দক্ষিণ মুখোমুখি জানলা খোলা, মাথার ওপর তা সত্ত্বেও ফ্যান ঘুরছে। সোহম তার ডোরা-কাটা নাইটড্রেস পরে দুটো বালিশের ওপর একরকম উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। তার অবিন্যস্ত অজস্র চুল বালিশ ছাড়িয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দীপালি একটা দোলনা চেয়ার টেনে বসেছিল। সে বসে থাকাকালীনই সোহম তিন-চারবার ওল্টালো পাল্টালো, দীপালির বুক দুরদুর করছিল, কিন্তু কোনও অশালীন অশোভন উন্মোচন ঘটল না। অবশেষে তার উপস্থিতি বুঝতে পেরে সোহম ধড়মড় করে উঠে বসল এবং তারপর একলাফে বাথরুমের দরজায়।

একটু দেরি হল সোহমের। সে একেবারে স্নান সেরে বেরিয়েছে। কোনও

একটা ও-ডি-কালোন, না-কি বাথসল্ট ফল্ট ব্যবহার করেছে বোধহয়। ঘরময় মৃদু সুবাস ছড়িয়ে যাচ্ছে। সোহম মেয়েদের মতো শৌখিন। পাটভাঙা সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি পরে, চুল উল্টে আঁচড়ে বেরিয়েছে। একটু তাড়াহুড়োর ছাপ। চোখগুলো ওর এমনিতেই একটু রক্তাভ। রাত-জাগা বা বেশি ঘুমোনোর জন্যে আরও বেশি লাল হয়ে উঠেছে। ঘুমন্ত এবং অবিন্যস্ত থাকার ক্ষতিপূরণ স্বরূপই বোধহয় সে আজ একটু বেশি সেজেছে। পাঞ্জাবিতে নীল কাজ। সৌরভটা একটু বেশি রকমই ঢেলেছে।

বিছানাটা দ্রুত হাতে গুছিয়ে ফেলতে ফেলতে সে বলল— 'ওয়েট এ মিনিট।'

দীপালি বলল— 'আমি একটু হাত লাগালেই...'

—'ক্ষেপেছিস!'

—'কংগ্র্যাট্‌স্‌ সোহম।'

—'টু হেল উইথ ইয়োর কংগ্র্যাট্‌স্‌।'

—'অত রাগছিস কেন বাবা? মনে রাখিস এটা কোনও সাধারণ কম্পিটিশন নয়। এরকম আগে হয়নি। পরে হবে কিনা তাই বা কে বলতে পারে।'

সোহম এবার কোমরে হাত দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

—'যেতে দে ওসব কথা। গানটা অবশ্য আমি একেবারেই খারাপ গাইনি। ওয়ান অফ মাই বেস্ট দীপু।'

—'তুই কি করে ভাবিস মাস্টারমশাই থাকতে তুই অপালাকে ছাড়িয়ে যাবি?'

—'সেটা তো আরও বড় প্রশ্ন আমার। অপালা কাল যা গেয়েছে, আমি ওর গলাতেও অদ্যাবধি অমন গান শুনিনি। আর ওইরকম বাগ-বিতণ্ডার পর। ও যে অত স্মার্টলি জবাবগুলো দেবে ভাবতে পেরেছিলি? তানপুরো হাতে নিলেই অপালা মিত্র আর মনুষ্যলোকে থাকে না। কিভাবে নিজেকে কালেক্ট করল! যে রাগ তৈরি করে এসেছিল, সেটা ছাড়া অন্য সাজেশন এলো অমনি মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে। অথচ অবলীলায় 'গেয়ে গেলো, আহা! সু প্‌নো মে আওয়ে পিয়া', সুর করে গেয়ে উঠল সোহম। বলল—'মধ্যলয় থেকেই তো আমার ওড়িশি নাচতে ইচ্ছে করছিল। প্রতিটি গান্ধারে আর নিখাদে যেই থামছিল আমার দীপু সত্যি মনে হচ্ছিল কোণার্কের টপ্‌-ফেজের সেই যক্ষিণী না সুরসুন্দরী বলে তাদের কথা। যেন নাচতে নাচতে কেউ ঠিক অমনি ভাবে ত্রিভঙ্গ পোজে থেমে গেল।'

দীপালি বলল—'তুই কি আজকাল নাচও শিখছিস নাকি?'

—'শিখছি না, তবে দেখছি, দেখেছি, ভালো প্রোগ্রাম থাকলে একটাও মিস করি না। আর কোণার্ক দেখেছি অলরেডি বার চারেক, ভবিষ্যতেও কতবার দেখব বলতে পারছি না।'

দীপালি বলল— 'দ্যাখ সোহম, তোরা একটু বাড়াবাড়ি করিস। ভয়ানক ইমোশন্যাল, ইম্পালসিভ। প্রথমত, অপালা ভালো গাইলেও অত বড় ওস্তাদকে ওভাবে বলবার সাহস পায় কোথা থেকে রে? "সকালের রাগ কখন গাইব?" পাণ্ডিত্য ফলানো হচ্ছে চন্দ্রকান্তজীর সামনে? মার্গসঙ্গীতের জগতে

সহবৎ একটা মস্ত জিনিস তা জানিস ?'

—'কি জানি, আমার তো ওকে কোথাও বে-সহবৎ মনে হয়নি। অপালার বিনয় নিয়ে বোধহয় কোনও দ্বিমত নেই। আমি তো শ্রোতাদের মধ্যেই ছিলুম। অনেককেই তারিফ করতে শুনেছি।'

দীপালি বিরক্ত হয়ে বলল— 'এটাও জেনে রাখিস সমস্ত জিনিসটা মাস্টারমশাইয়ের শিখিয়ে দেওয়া। গিমিক। নইলে আমরা এতোজন সন্ধের রাতের রাগ তৈরি করে গেলুম, ও হঠাৎ তোড়ি আরম্ভ করল কেন ? ওরা কিছু নিয়ম-কানুন করেনি ঠিকই। কিন্তু এটা তো কমনসেন্স ! জানবি তোড়ি দিয়ে আরম্ভ, সওয়াল-জবাব যে কোনও রাগ গাইতে চাওয়া এ সমস্তই মাস্টারমশাইয়ের শেখানো। ওর রেঞ্জ দেখানোর চেষ্টা। ভোরের রাগে আলাপটা ও তো সত্যিই বেশি ভালো করে ! দেখলি না পুরিয়াতে চট করে গান ধরে দিল !'

সোহম বলল—'যদি ওর ভালো তৈরি নয় এমন কোনও রাগ গাইতে বলতেন পন্ডিতজী, কী করত ও ?'

দীপালি মৃদু হেসে বলল—'দ্যাখ সোহম, কিছু মনে করিস না আমরা প্রয়াগ, চন্ডীগড় এ সব পরীক্ষাগুলোয় ছাত্র-ছাত্রী বসিয়ে বসিয়ে ঘুণ হয়ে গেছি। আমরা পরীক্ষকদের সাইকলজি পরিষ্কার বুঝি। পণ্ডিতজীর প্রিয় রাগ পুরিয়া, লোকে বলে উনি পুরিয়ায় আর শুধ্ কল্যাণে সিদ্ধ। নিজেই সময়ের প্রশ্ন তুলেছেন, এটা এখন অনুমান, কিন্তু নাইনটিনাইন পার্সেন্ট অভ্রান্ত অনুমান যে উনি ওকে পুরিয়া গাইতে বলবেন। আর গাইলও তো দেখলি ওঁরই বন্দিশ, ওঁবই প্যাটার্নে।'

—'এটা কিন্তু ঠিক বললি না দীপু। পণ্ডিতজীর স্টাইল সাংঘাতিক ভিরাইল, গমকে হলক তানে ভর্তি। অপু ওঁর কিছু কিছু জিনিস করেছে। ওঁর ছোট ছোট তান, মুরকি, ফিরৎ, কিন্তু গেয়েছে সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং ফেমিনিন স্টাইলে। অ্যান্ড হোয়াটেভার ইট ইজ, ও গেয়েছে প্রাণের সমস্ত আবেগ দিয়ে, দুর্দান্ত। ইন ফ্যাক্ট আমি বহু লোককে বলতে শুনেছি সুবিচার হয়নি। সাদ্বিক কি গেয়েছে, বল ? একদম স্টিরিওটাইপ্‌ড়। ইমপ্রোভাইজেশন, তান, শুনলেই বোঝা যায় সব তৈরি। খুব রেওয়াজি গলা, তৈরিও করেছে ভালো, কিন্তু নো অরিজিন্যালিটি। কোনও তুঙ্গ মুহূর্ত পেলুম না। পেয়েছিস ?'

'তানগুলো তুবড়ির মতো করছিল সোহম। তা সত্ত্বেও আমার মতে তোরই ফার্স্ট হওয়া উচিত ছিল। অপালা সেকেণ্ড। সাদিক থার্ড।'

—'আমি ফার্স্ট অপালা থাকতে ? অপালা ওইরকম গাইতে ? আমি আশাও করি না। হলে আমার চেয়ে দুঃখিতও কেউ হত না। তোর জাজমেন্ট বায়াজ্‌ড় বলতে বাধ্য হচ্ছি।'

—'হতে পারে', দীপালি দাঁতে নখ কাটল। 'তবে অপালার মতো ব্যাকিংও তো তুই পাস না !'

—'এটা বলিস না দীপু! মাস্টারমশাই আমাদের তিনজনের সঙ্গে হারমোনিয়াম সঙ্গত করে গেছেন। অপুর নেবার ক্ষমতা বেশি, অনেক বেশি তো কী করা যাবে ? একে তো কিন্নর কণ্ঠ, তারপর গলাটা আপনি ঘোরে, মনে

হয় না তার জন্যে ওকে আলাদা করে কোনও এফর্ট দিতে হচ্ছে।'

—'যাই বলিস সোহম। অপালা কিন্তু ঠিক খেয়াল গাইল না। ওর দ্রুত গানটা তো একেবারে ঠুংখেয়াল হয়ে গেল।'

—'ও যে খেয়ালের মেজাজে গাইতে পারে সেটা ও ওর তোড়ির আলাপেই দেখিয়ে দিয়েছে। আর দীপু, এক এক জনের একেকটা স্টাইল আছে। তুই নারায়ণ রাও ব্যাসের রেকর্ডগুলোর কথা মনে কর, বড়ে গোলাম আলি সাহেবের স্টাইলের কথা মনে কর। যাক গে, বাজে কথা ছাড়, কত তো বুঝি! আমার প্রধান দুঃখ অপু ফার্স্ট হল না। আমি সেকণ্ড এলাম না। আর দ্বিতীয় দুঃখ তুই নিজেকে বড্ড নেগলেকট করছিস। ছুকরিগুলোকে শেখানো একটু বন্ধ কর এবার। শেখাতে শেখাতে তোর নিজের রেওয়াজ হচ্ছে না। মাস্টারমশাইয়ের জিনিসগুলো গলায় তোল। অত হেলফেলা করিসনি।'

বনমালী কফি এবং খাবার নিয়ে এসেছে। প্রচুর। লুচি, ঘুগনি, মাংস, চাটনি, মিষ্টি।

সোহম বলল—'কি রে বনমালী? রাতের ডিনার নিয়ে এলি নাকি? সাত সকালবেলা? মার-ধোর খাবি মনে হচ্ছে?'

বনমালী দাঁত বার করে হেসে বলল— 'মেজ বউদিমণি বলে পাঠিয়েছে এক টুকরো পড়ে থাকলে কর্তাবাবুর কাছে খবর যাবে। কাল রাতে দাঁতে কুটো কাটোনি।'

দীপালি বলল—'জানিস তো সোহম, গান একরকমের কুস্তি। কালোয়াতি গান। আগেকার ওস্তাদরা পুরী, হালুয়া, মালাই, রাবড়ি এসব না খেয়ে গানে বসতেন না। অনেকে আবার তার আগে কতকগুলো ডন বৈঠক সেরে নিতেন। খেয়ে নে।'

সোহম বলল— 'খিদে অবশ্য পেয়েছে ঠিকই। যাকগে কি বলছিলুম। গান শেখানো বন্ধ কর।'

দীপালি বলল— 'আমার গান শেখানো বন্ধ করাও হবে না, কোনও কম্পিটিশনে স্ট্যান্ড করাও হবে না। আমি রব চিরদিন নিষ্ফলের, হতাশার দলে।'

—'ছাড় তো। যত বাজে চিন্তা। দীপালি তোর কিন্তু খুব ন্যাচার‍্যালি সুরেলা গলা। বাজে গান গেয়ে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। খেয়ে নে। খেয়ে নিয়ে চল মাস্টারমশায়ের কাছে যাই। উনি নিশ্চয়ই এক্সপেক্ট করছেন। আমাদের তিনজনের সঙ্গে সমানে হারমোনিয়াম সঙ্গত করেছেন। ভাগ্যিস ওরা হারমোনিয়ামটা অ্যালাউ করেছিল। নাহলে অত জমাটি হত না। কাল বড্ড রাগ হয়েছিল। সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। আজ তুই আসাতে মেজাজটা ভালো হয়ে গেল। আফটার অল এক গুরুর দুই ছাত্র-ছাত্রীকে ওরা প্লেস দিয়েছে। দ্যাট ইজ সামথিং।'

দীপালি বলল— 'সকালে গিয়ে লাভ নেই। মাস্টারমশাই নিশ্চয়ই অপুকে খবরটা এবং সান্ত্বনা দিতে গেছেন।'

সোহম বলল— 'তা হোক, মিতুল তো আছে। মিতুলও এক্সপেক্ট করবে।'

দীপালির মুখ একটু চানেধাচের। খুব ফসা, ছোট ছোট ফুলো ফুলো বাকা চোখ। গোলগাল চ্যাপ্‌টা মুখ এবং শরীরের গড়ন। এ ধরনের মুখে মনের ভাব চট করে ফোটে না। সে শুধু বলল— 'মিতুল ? মিতুল কি করবে ? মিতুল তো তোমার খবর জেনেই গেছে। তা ছাড়া মিতুল নিশ্চয় এতক্ষণে স্কুলে চলে গেছে।'

সোহম একটু অপ্রস্তুত গলায় বলল— 'তা অবশ্য। তা অবশ্য। ঠিক আছে, বিকেলের দিকেই যাবো। তবে তখন তো মাস্টারমশাই ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন কিনা! তোর এখন কী প্রোগ্রাম ?'

দীপালি হাত উল্টে বলল— 'আমার আবার কি প্রোগ্রাম হবে ? খাড়া বড়ি থোড়, আর থোড় বড়ি খাড়া। তোকে কংগ্র্যাচুলেট করতে এসেছিলুম। এবার বাড়ি চলে যাবো। অনেক কাজ বাকি। সকালে এক ব্যাচ আসার কথা ছিল। ফাঁকি মেরেছি। কিন্তু দুটো মেয়ে আসে ইনডিভিজ্যুয়ালি। তাদের আমায় অ্যাটেন্ড করতেই হবে। বেসুরো-বেতালার দল সব। কিন্তু তাদের মা-বাবারা তাদের সঙ্গীতপ্রভাকর করে তুলবেই। আমি তাদের জন্যেই বলিপ্রদত্ত ভাই।'

সোহম অন্যমনস্ক গলায় বলল— 'ঠিক আছে। আমি আজ সকালটা রিল্যাক্স করি। কিম্বা 'ক্রিটিক অব পিওর রীজন' বলে একখানা পাঠ্য বই আছে। দেখি উদ্ধার করতে পারি কিনা। কর্তাবাবুর কড়া হুকুম, ভীষ্মদেবই হও আর তারাপদ চক্কোত্তিই হও, এম এ হতেই হবে।'

দীপালিকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে, দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে একটা সিগারেট ধরালো সোহম। দীপালি বাঁক ফিরছে। মুখ পেছনে ফিরিয়ে একবার হাতটা নাড়ল। তারপর প্রিয়নাথ মল্লিক রোড়ের বাঁক ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল। বড় ভালো মেয়ে দীপালি। এমন সেতারের মতো সুরেলা মিঠে আওয়াজ নিয়েও আজ কতগুলো বচ্ছর একই জায়গায় আটকে আছে। তবু কোনও নালিশ নেই। সোহম, অপালা, বিশেষত সোহমের জয়েই যেন ওর জয়। এই ধরনের ঈষহীন পরিবেশের জন্যেই মাস্টারমশাই-এর কাছে শিখতে আরও ভালো লাগে তার। আরও অনেক সফল শিক্ষক আছেন। তাঁরা গলায় সব কিছু করে দেখান। মাস্টারমশাই যখন গলায় পারেন না হার্মোনিয়মে, এসরাজে, সেতারে দেখান। ফলে হয়ত আরও সূক্ষ্ম কাজ, আরও লম্বা লম্বা মিড় আরও তড়িৎগতি তান তাদের গলায় এসে যায়। মিতুল কি হয়ে উঠবে কে জানে ? শী ইজ সুইট সিক্সটিন। ওর মা নাকি খুব সুন্দরী ছিলেন। মিতুল নিশ্চয়ই তাঁর মতনই হয়েছে। আহা! তার মার মতো ওর মা-ও ওর মাত্র পাঁচ বছর বয়সে হঠাৎ হার্ট-অ্যাটাকে মারা যান। বাবার গলার সুর ও পায়নি। কিন্তু মাস্টারমশাই অসীম ধৈর্যে ওকে নিয়ে পড়ে আছেন। বলা কিছু যায় না। চার পাঁচ বছর পর হয়ত ওর ওই ধরা ধরা গলা দিয়ে অন্যরকম সুর বেরোবে। ওর ঝোঁক আপাতত লাইট ক্ল্যাসিক্যালের দিকে। গায়। প্রচুর শোনে। সবচেয়ে ঝোঁক অবশ্য নাচে। ওর কাছে কিছু-কিছু নাচ দেখেছে সোহম। সম্পূর্ণ অশিক্ষিত পটুত্ব থেকে যে এ ধরনের নাচ হওয়া সম্ভব তা সোহম না দেখলে বিশ্বাস করত না। কিন্তু ভারী চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে। ধৈর্য কম। ঠিক তৈরি হয়ে উঠতে পারছে না।

দীপালি চলে যাবার আধঘণ্টা পর সোহম চুলটা আঁচড়ে শার্ট প্যান্ট পরে নিল। বনমালীকে ডেকে বলল—'বউদিকে বলে দিস আজ কলেজ যাচ্ছি না। দুপুরে এসে ভাত খাবো। বেলা হতে পারে।'

সে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের মুখে যাচ্ছে। মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। আজ শনিবার। মিতুলের স্কুল ছুটি থাকে। যাবার সময়ে সে একটা মনোহারি দোকান থেকে বেছে বেছে কিছু ভালো চকলেট কিনল। মিতুল চকলেট খেতে দারুণ ভালোবাসে।

॥ ৪ ॥

অতন্দ্র আকাশে খালি ধ্রুবতারার মতো জেগে থাকেন নাজনীন বেগম। ধ্রুবতারার মতো স্থির অথচ শুকতারার মতো উজ্জ্বল। 'মেরে তো মন শ্যামসুন্দর বনমালী' তিলঙে বাজতে থাকে কানের মধ্যে, প্রাণ নিংড়ে নেওয়া সুরের চলা ফেরা, কখনও মেঘলেশহীন আকাশে চলে যাবে, কখনও একটি মাত্র মেঘের পেছন থেকে চাঁদের কিরণের মতো বহুধা সৌন্দর্যের বিস্ময়ে ছড়িয়ে পড়বে আকাশময়, পৃথিবীময়। জ্যোৎস্নাবিধৌত গঙ্গা-যমুনা-কৃষ্ণা-কাবেরী-গোদাবরীর ওপর কখনও তির্যকভাবে, কখনও সোজাসুজি পড়েছে সুরের ছটা 'বিনাদরশন মন বিরধ রতনহি। মদন মোহন গোপাল।'

বাবাকে বেশ ছোট বয়সেই হারিয়েছে অপালা। তবু বাবার স্মৃতি অমলিন। মুখটা স্মৃতিতে আবছা হয়ে গেছে। কিন্তু বাবার বাবাত্বটুকু একেবারে স্পষ্ট। তিনি ঠিক কি রকম ছিলেন, কি ভাবে কথা বলতেন, আদর করতেন বিশদ মনে নেই, খালি তিনি ওইরকম ধ্রুবতারার মতোই একটা উপস্থিতি। খুব উজ্জ্বল নয়, কিন্তু আছেন, সর্বদা আছেন, পথ দেখাতে, আলো দিতে, দিক নির্ণয় করতে। সব সময়ে। খুব মৃদুভাবে, নিজেকে একদম জাহির না করেও আছেন। বাবা মারা যাবার পর থেকে অপালার জীবনে সুখ-শান্তি ইত্যাদি বলতে যা বোঝায় তার কিচ্ছু নেই। আরাম, আশ্রয়, অবসর বলতে কিচ্ছু নেই। আর শান্তিরও অভাব। যা যা সে করতে চায় তার প্রত্যেকটাতে যদি প্রথমেই না না না শুনতে হয়, আর তার মতো লাজুক নম্র স্বভাবের মেয়েকে সেই 'না'কে 'হ্যাঁ' করতে হয় তাহলে শান্তি বলতে আর কী রইল ? তবু অপালা একদিকে জেদী আরেক দিকে স্থিতিস্থাপক। এখন মোটামুটি একটা স্থিতিশীল পর্যায়ে এসেছে তার জীবনযাত্রা। বাড়ির সকলে মেনে নিয়েছে গানটা সে করবেই। সে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটের মুখে যাবেই। তার কিছু-কিছু মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে ছেলে-বন্ধুও থাকবেই। তার সঙ্গীত ক্লাসের বন্ধু। অনেক সময়ে তাদের সঙ্গে বাসে-ট্রামে অথবা সোজাসুজি তাদের বাড়ির গাড়িতে সে আসবেই। এসব নিয়ে অশান্তি হয়েছে। এখনও হয়। তবে কম।

বিপত্নীক হবার পর জেঠু আবার বিয়ে করেননি। নিজে নিঃসন্তান, ভাইয়ের সংসারেই থাকতেন, এবং ভাই মারা যেতে তার সংসারটি টেনে চলেছেন এটা

একটা মস্ত ভরসা। কিন্তু জেঠুর বাবার মতো স্নেহ নেই। শাসন আছে, দাবি আছে, কর্তব্যবোধ আছে, চূড়ান্ত অহং আছে, কিন্তু মমতা নেই। মা ব্যবহার করেন জেঠুর ক্রীতদাসীর মতো। মাথায় আদ্যিকালের দু ব্লেডের পাখাখানা চললেও, ঝালর দেওয়া হাতপাখা নিয়ে মা জেঠুর খাওয়ার কাছে ঠায় বসে থাকেন। রান্নাঘর নীচে, তারা সবাই রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বসে খেয়ে নেয়। খালি জেঠুর খাবারটাই মাকে চারবেলা ঠাকুবের নৈবেদ্যর মতো থালায় বাটিতে সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক জামাইষষ্ঠীর স্টাইলে ওপরে নিয়ে যেতে হয়। এই সময়ে অপালার দাদা প্রদ্যোৎ নানারকম টিপ্পনী কাটে। দু ভাইবোনের কেউই পারিবারিক প্রথার মধ্যবিত্ততার মধ্যে জেঠুর এই জমিদারি চাল যার বেশির ভাগ দায়টাই তাদের মা বেচারিকে বহন করতে হয়, সেটা পছন্দ করে না। কিন্তু প্রতিবাদ করার কথাও তাদের মনে আসে না। প্রদ্যোৎ খুব হাসি-খুশী ধরনের ছেলে। একেবারেই 'রাগী যুবক' নয়, আর অপালা বড়ই শান্ত, খানিকটা ভিতু। জেঠুর মুখোমুখি হওয়ার মতো ব্যক্তিত্বই তার নেই। জেঠুর দুবেলার ভোজনের এই যে পূজা-পর্যায় এই সময়টা যত রকম সাংসারিক কথার আদান-প্রদান চলে। জেঠু বলবেন, মা শুনবেন, মৃদুস্বরে জবাব দেবেন।

—'বউমা, এ মাসে বাজার খরচটা যেন বড্ড বেশি মনে হচ্ছে, বাজেট ছাড়িয়ে গেছে!'

—'আনাজের দাম আকাশে চড়েছে দাদা, তাছাড়া দেশ থেকে বনবিহারী এসে দুদিন থেকে গেল না?'

বনবিহারী অর্থাৎ দেশে তাঁদের যা সম্পত্তি আছে, তার তদারকি যে করে এবং বেশির ভাগটাই ভোগ করে সে মাঝে মাঝেই কিছু আম, কিছু ডিম, আলু, সর্ষের তেল এবং চাল, একেক সময়ে হয়ত একেকটা নিয়ে উপস্থিত হয়। তখন সে কদিন থেকে যায়। হগ মার্কেট, কালীঘাটের মন্দির, দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি, জাদুঘর, চিড়িয়াখানা—এসব তাকে দেখে যেতেই হবে। প্রত্যেকবার।

বট্‌ঠাকুর বলেন—'বনবিহারী তো রইল, দুদিন কি তিনদিন।'

বউমা বলতে পারেন না বনবিহারীর এক দিনে যা আহার্য লাগে তা প্রায় তাঁদের চারজনের সমান।

সুতরাং বটঠাকুর আবার বলেন, 'তবে কি দুধটা কমিয়ে দেবো?'

বউমা জানেন দুধ কমাবার অর্থ তাঁর ছেলেমেয়ের সামান্য অংশটুকু বাদ পড়া। কারণ বটঠাকুর তো দুধ ছাড়া থাকতেই পারবেন না। দুধটাকে সামান্য ঘন করতে হয়, তাঁর গোঁফে লেগে থাকে সেটা তিনি পরিতৃপ্তি সহকারে মুছে নেন, এ প্রতিদিনের অনুষ্ঠান। বউমা চুপ করে থাকেন। সহজে তিনি ভেঙে পড়বার পাত্রী নন, কিন্তু এখন তাঁর চোখ টলটল করতে থাকে। স্বামী হঠাৎ মারা গেলেন। কিছুই রেখে যেতে পারেননি। এই বাড়ির ভাগ আর দেশের সম্পত্তির ভাগ এইটুকু তাঁদের নিজস্ব আয়। বাকি সবই বড় ভাসুর।

বড় ভাসুর হঠাৎ উদার কণ্ঠে বলেন—'না, না, আমারই ভুল। ছেলেটার ডাক্তারি পড়ার খাটুনি কি সোজা খাটুনি? মেয়েটাও তো হ্যামেহাল কলেজ, গান, সংসারের ইতি-কর্তব্য করে যাচ্ছে। তবে কি জানো বউমা, যা থাকবে

তোমার ছেলে-মেয়েরই থাকবে। আমি তো আর সঙ্গে নিয়ে যাবো না।'

এ কথা 'সুজাতা খুব ভালোই জানেন। ভাসুরের আর কেউ নেই। দুটিই ভাই। বোন-টোনও নেই। ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের ভালোও বাসেন খুব। তবে তাঁর নিজের ধরনে। প্রদ্যোৎ বলেছিল এঞ্জিনিয়ারিং পড়বে, তাড়াতাড়ি কোর্সও শেষ হয়ে যাবে, চাকরি পাবারও সুবিধে, কিন্তু জেঠু সেই যে ধরে বসলেন ডাক্তারিতে যখন চান্স পেয়েছে, ডাক্তার হওয়াই চাই, সে থেকে তিনি এক চুলও নড়লেন না। প্রদ্যোৎ এঞ্জিনিয়ারিং পড়লে সংসারটা তাড়াতাড়ি সাবালক হতে পারত। তাঁর নিজেরও যথেষ্ট সুবিধে হত। কিন্তু তিনি কোনও যুক্তিতেই কান দিলেন না। বাড়িতে, বংশে একটা ডাক্তার থাকা দরকার। তাঁদের ঠাকুর্দা খুব সফল ডাক্তার ছিলেন। অপালার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি লড়াই করতে হয় সুজাতাকে। সায়েন্স তাকে পড়তেই হবে। এদিকে মেয়েটা অঙ্ককে ডরায়। জেঠুর যুক্তি, গান করছে, তার ওপর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, তালের অত সূক্ষ্ম হিসেব, রাখে কি করে? মন দিলেই অঙ্ক পারবে। জেঠুর ইচ্ছের বিরুদ্ধে চুপচাপ গিয়ে আর্টস নিয়ে ভর্তি হয়ে এসেছে অপালা। জেঠু খুব অসন্তুষ্ট। তার পর ফলও ভালো হচ্ছে না। মেয়েকে যতটা পারেন আড়াল করে চলতে হয় তার মাকেই।

অপালা ভাবে এই স্যাঁতসেঁতে এঁদো ঘর, জেঠুর ভ্রূকুটি, দাদার উদাসীনতা, যা প্রায় স্বার্থপরতার মতো লাগে একেক সময়ে, মায়ের অসহায়ত্ব, একটা নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র নেই, এরপর কি সত্যি সে লখনৌ যাবে? নাজনীন বেগমের খাসমহলে কিংবদন্তীর গানঘরে তানপুরো নিয়ে বসতে পারবে? সত্যি? একটু পরিবেশের অভাবে বাড়িতে তার গান গেয়ে তৃপ্তি হয় না। সারা বর্ষাকাল ছাতে বেরোতে পারে না, গ্রীষ্মকালেও বড় জোর ছটা। তার পর আর বসা যায় না। দাদা তক্তপোশে ঘুমোয়। বালিশের পাশে উপুড় করে রাখা মোটা মোটা বই। অর্থাৎ অনেক রাত পর্যন্ত পড়েছে। সে আস্তে, খুব আস্তে সুর ধরে, দাদা ঘুমে লাল চোখ মেলে বলে—'আরম্ভ করলি তো ক্যাঁও-ম্যাঁও? অপালা বলে—'হ্যাঁ করলুম।' বেশ স্থির সিদ্ধান্তের তেজ তার গলায়। একটু পরে আরেক ঘুম দিয়ে নিয়ে দাদা বলে—'নাঃ গলাটা তোর সত্যিই খাসা রে, ঘুমের ব্যাঘাত তো হয়ই না, উপরন্তু এই ভোর সকালে একটা দুর্দান্ত স্বপ্ন দেখে ফেললুম। কি সুর গাইছিলি রে ওটা?'

—'ললিত।'

—'বড় ভালো রে সুরটা। নোন তোম তেরে নেরে ওটা কি করিস রে?'

—'আদি যে মার্গসঙ্গীত, সেটা ঈশ্বরকে লক্ষ্য করে গাওয়া হত। তাই রাগের আলাপের একটা বাণী ছিল 'অনন্ত হরিনারায়ণ', পরে মুসলমানী যুগে খানিকটা অশিক্ষিত, খানিকটা সংস্কৃত না জানা গাইয়েদের মুখে ওটা নোম তোম হয়ে গেছে।'

—'ও রে বাব্বা, এ তো বেশ জ্ঞানের ব্যাপার রে?'

—'তা তুই কি মনে করেছিলি গান মানে ভ্যারেন্ডা ভাজা?'

—'ঠিক আছে, ঠিক আছে তুই তোর নোম তোম কর, করে যা, ফ্র্যাঙ্কলি স্পীকিং অপু আমি ভাবতুম সেই 'তুমি আমার আর আমি তোমার' টাইপের কিছু

একটা হবে এটা।'

এবার অপুর হাসি পেয়ে যাবে। ললিতের সুরটা কেটে গেছে। গম্ভীর সন্ধি প্রকাশের সুর। সে হাসি চেপে বলবে— 'তাহলে ওই জাতীয় একটা শোন, আর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে প্রকাশভঙ্গির গভীরতা, ডিফারেন্সটা দ্যাখ, দেখবি ?'

অপুর দিকে ফিরে চোখটা বুজিয়ে প্রদ্যোৎ বলবে—'ঠিক আছে। গেয়ে যা। যদি ভোরের স্বপ্নটা ফিরিয়ে দিতে পারিস তো তোকে একটা প্রাইজ দেবো।'

তখন অপালা যোগিয়ায় ধরবে—'পিয়া কে মিলন কি আশ সখিরি...' মীড়ে মীড়ে ভরিয়ে দেবে দাদার চিলেকোঠার ঘর, দু চারবার দাদা মাথা নাড়বে, আহা আহা করবে শুনিয়ে শুনিয়ে, তারপর ঘুমিয়ে পড়বে।

নাজনীন বেগমের গানমহলের খোলা জানলা দিয়ে ঝাউয়ের সারি দেখা যায়। কিরকম ঝাউ কে জানে ? কতরকমের আছে ? সবগুলোই অপালার ভালো লাগে। যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয় কোনটা বেশি ভালো লাগে ? ইমন না পুরিয়া না শ্রী সে কি বলতে পারবে ? বেছে নিতে পারবে ? বাছা খুব শক্ত। ফোয়ারায় রামধনু রং তুলে ভোরের সূর্য উঠবে। সম্পূর্ণ শূন্য, প্রশস্ত মহলে গুরু-শিষ্যার যুগলবন্দীতে 'বাজুবন্ধ খুলু খুলু যায়।'

ক'দিনই মনটা তার খুব ভালো আছে। সুরলোকের নির্বাচিত বিচারকরা তার ওপর সুবিচার করেননি, প্রথম হলে সে একটা ভালো স্কলারশিপ পেতো, তার আর্থিক সুবিধে হত অনেক, এসব তার মাথায় নেই। ইংরেজি ক্লাসে রমলাদি একদিন বললেন—'অপালা, অপালা মিটার, উই আর প্রাউড অফ য়ু, দা স্টেটসম্যান মিউজিক ক্রিটিক হ্যাজ প্রেইজড্ ইয়োর পার্ফম্যান্স সো এলোকোয়েন্টলি !' কলেজের যাবতীয় ফাংশনে অপালার গান বাঁধা, লেখাপড়ায় সাধারণ হলেও সকলেই তাকে চেনে। তবে ইংরেজির প্রোফেসররা বিশেষত রমলাদি বা আর জি বড্ডই হাই-ব্রাও। সেই তিনি ক্লাসে সবার সামনে এভাবে তাকে প্রশংসা করবেন, ভাবাই যায় না। অপালার মুখ একটুতেই লাল হয়ে যায়, সে মুখ নিচু করে ফেলল। তার দুষ্টু-বন্ধুরা পরে বলতে থাকল—'দ্যাখ অপালা, তুই যতই ভালো গাস, স্টেটসম্যান যদি তোকে ওভাবে মাথায় না তুলত, আর জিও তোকে নিয়ে এত প্রাউড হতেন না।' আর জির কথার মাত্রাই এক এক সময়ে হয়ে যায় 'অ্যাজ দা স্টেটসম্যান সেইজ।' স্টেটসম্যান নাকি বলেছে 'দি অ্যাওয়ার্ড মে গো টু অ্যাসাম'স সাদিক হুসেন, বাট দি অ্যাক্রেম গোজ ডিসাইডেডলি টু বেঙ্গলস অপালা মিট্রা, শী ইজ দা রিয়্যাল ট্যালেন্ট দ্যাট দা সুরলোক ওয়াজ লুকিং ফর।' পল সায়েন্সের চন্দনাদি যাঁকে তাঁর বদমেজাজের জন্য মেয়েরা বলে চণ্ডী তিনি পর্যন্ত বললেন : 'আমার এক ক্লোজ রিলেটিভ গিয়েছিলেন, শুনলাম অপূর্ব গেয়েছো। গানটাই তোমার আসল ভোকেশন। পরীক্ষার রেজাল্টের জন্য মন খারাপ করো না। ভালো করার চেষ্টা অবশ্যই করবে। কিন্তু দুটো যদি এক সঙ্গে পেরে না ওঠো, কি আর করতে পারো ?'

মনীষা কলেজে অপালার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু, নিজেও গায়। সে গিয়েছিল শুনতে। মনীষা বলল—'তুই একদিন হীরাবাই-টাই দরের গায়িকা

হয়ে যাবি অপু। তোর একটা বিশেষত্ব কী জানিস ? বেশির ভাগ ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত গায়িকারাই কিরকম একটা ট্যারা আওয়াজ বার করেন গলা থেকে। পুরুষের ভঙ্গির মতো। খুব সম্ভব সকলেরই শিক্ষা মেল ওস্তাদদের কাছে তো, তাই। তোর একে ওরকম অপূর্ব গলা, তার ওপর ওই ধরনের কোনও অ্যাফেকটেশন নেই। যারা ক্ল্যাসিক্যালের অতশত বোঝে না, তাদেরও তোর গান ভালো লাগবে।' মনীষা রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, একটু ভারী গলা। কলেজ সোশ্যালের নৃত্যনাট্যগুলোতে পুরুষ ভূমিকার গানগুলো তার বাঁধা। নায়িকার গানগুলো গায় অপালা। তার উচ্চাঙ্গসঙ্গীত-দুরস্ত গলায় একটু বেশি কাজ অনেক সময়ে এসে যায়। বাঁধা স্বরলিপিতে গাইতে অসুবিধে হয়। এসব জায়গায় মনীষা তাকে সাহায্য করে। মনীষা বলল—'দ্যাখ অপু, আমাদের দ্বারা পড়াশুনো বেশিদূর হবে না। তোতে আমাতে মিলে একটা গানের স্কুল খুলব। তুই ক্ল্যাসিক্যাল, আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত, আর তোর ওই বন্ধু দীপালি, নজরুল-টুলগুলো দারুণ গায়, ও ওগুলো শেখাবে। কি বলিস ?' আর তখনই অপালা মনীষাকে তার লখনৌ-এর স্কলারশিপটার কথা বলল। কাউকে না বলবার অঙ্গীকার করিয়ে অবশ্য। মনীষা লাফিয়ে উঠল—'বলিস কি ? তুই তো এবার অনেক উঁচু আকাশের তারা হয়ে যাচ্ছিস তা হলে ? আর কি তোর নাগাল পাবো ?'

কলেজ বিল্ডিং-এর পেছনের দিকে বাগানে একটা রেন-ট্রি। সেইখানেই বসে ওরা সাধারণত গল্প করে। অপালা গাছটার উঁচু শাখাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল— 'মনীষা, আমি আমিই, তারা-টারা কোনদিনও হবো না। গান গেয়ে অসম্ভব আনন্দ পাই। সত্যি কথা বলতে, গানকে আমি ঠিক একটা মানুষ, একটা ভীষণ প্রিয় মানুষের মতো ভালোবাসি। গানের চেয়ে বেশি কিছুকে, কাউকে ভালোবাসি না।'

মনীষা বলল—'তুই একটা পাগল। গান তো একটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট জিনিস। তাকে আবার কেউ মানুষের মতো ভালবাসতে পারে ? ধর তোর মা, তোর দাদা, ধর এর পরে তোর বিয়ে হবে, ছেলে-মেয়ে হবে, এদের তুই ভালোবাসবি না ?'

অপালা বলল—'ভালো তো বাসি। বাসবও। মায়ের ওপর আমার ভীষণ মায়া। খালি মনে হয়, মাকে কবে একটু অবসর একটু স্বাধীনতা দিতে পারব। কিন্তু গান আমাকে যা দেয়, তা আর কেউ, আর কিছুই দিতে পারে না রে ! সত্যি বলছি।'

—'কেন, তোর সোহম ?'

অপালা একটু চমকে উঠল, 'কি বলছিস তুই ?'

—'সোহম আর তোর মধ্যে কিচ্ছু নেই, বিশ্বাস করতে বলিসনি আমায়। এই তো সেদিন দেখলুম মেডিক্যাল কলেজের সামনে দিয়ে একটা নীল অ্যামবাসাডর বেরিয়ে গেল। তার মধ্যে তুই আর সোহম বসে কথা বলছিস। এমন মত্ত হয়ে যে আমাকে দেখতেই পেলি না।'

অপালা হেসে বলল—'আমাকে দেখতে পেয়েছিলি, সোহমকে দেখতে পেয়েছিলি, তানপুরার ডাণ্ডিটা যে গাড়ির জানলার বাইরে বেরিয়েছিল দেখতে

পাসনি ? মাস্টারমশায়ের তানপুরাটা এই কমপিটিশনের জন্য প্র্যাকটিস করার উদ্দেশ্যে সোহমের গাড়ি দিয়ে মাস্টারমশাই আমার বাড়ি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তোর মুখের এই অদ্ভুত কথাটা আমি এই প্রথম শুনছি, মনীষা, আমাদের কারুরই কোনদিন মনে হয়নি। দুজনে এক গুরুর কাছে নাড়া বেঁধেছি, তালিম নিচ্ছি এক সঙ্গে অনেক দিন হয়ে গেল। পরস্পরকে হেল্‌প্‌ও করি খুব। খুব সুন্দর বন্ধুত্ব আছে আমাদের। তার বেশি কিছু না। কেনই বা থাকবে ?'

মনীষা বলল—'দ্যাখ, গান আমিও করি। গানের মতো রোম্যান্টিক জিনিস আর নেই। খুদে খুদে ছাত্রী বয়স্ক মাস্টারমশায়দের প্রেমে পড়ে যায়, আর যারা এক গুরুর কাছে শেখে, ক্ষমতায় পরস্পরের কাছাকাছি তাদের মধ্যে লাভ্‌ আসবে না ? হতে পারে ?'

অপালা একটু সীরিয়াস ধরনের মেয়ে। চট করে ঠাট্টা-তামাশা করে উঠতে পারে না। তবু খানিকটা ঘাস ছিঁড়ে, সেগুলোকে টুকরো টুকরো করতে করতে চাপা হেসে বলল—'তোর এরকম কোনও অভিজ্ঞতা আছে মনে হচ্ছে ?'

মনীষা ফিক করে হেসে বলল—'এখনও হয়নি। কিন্তু হলেও তো হতে পারে। সোহম কিন্তু ভালোবাসার মতো ছেলে। সুন্দর চেহারা। লেখাপড়ায় অন্তত তোর চেয়ে ভালো। অমন ব্যাকগ্রাউন্ড, তারপরে ওইরকম ট্যালেন্টেড।'

অপালা বলল—'তুই কি পাত্র-পাত্রী কলামে বিজ্ঞাপন দিচ্ছিস নাকি ?'

অপালা খুব শান্ত ধীর স্বভাবের মেয়ে। বেশি কথা বলে না। মনের কথাও চট করে বলতে পারে না। দু চোখ শুধু ভারী হয়ে যায় দুঃখ হলে। আনন্দে গাল চকচক করতে থাকে। এই পর্যন্ত। বাইরে থেকে দেখে বোঝা না গেলেও সে আজ উড়তে উড়তে বাড়ি ফিরল। কলেজ থেকে বাড়ি অনেক দূর। অর্ধেক বাসে ওঠা যায় না। আজ চারটে পঁয়তাল্লিশ অব্দি ক্লাস ছিল। বাড়ি ফিরতে ফিরতে ছ'টা। দরজার কড়া নাড়তে গিয়ে অপালা দেখল দরজাটা খোলা, খুলতেই মা বলল—'অপু, এতো দেরি ?'

—'শেষ পর্যন্ত ক্লাস ছিল তো।'

—'ঠিক আছে। শিগগিরই বাথরুমে যা। গা ধুয়ে আয়। আমি চুলটা বেঁধে দিচ্ছি। শাড়ি জামা সব বার করে রেখেছি।' অপালা দেখল মায়ের পরনেও পাট ভাঙা শাড়ি। ধোপার বাড়ির সুন্দর গন্ধটা বেরোচ্ছে। চুল-টুল পরিষ্কার বাঁধা। মা যেন কোথাও যাবে।

সে বলল—'কেন মা কোথায় যাবো ?'

—'তুই চলই না আগে।'

দোতলায় উঠে অপালা আবার জিজ্ঞেস করল—'কি ব্যাপার বলো তো মা, জেঠুর কি আবার থিয়েটার যাবার শখ চেপেছে ?' খুব মাঝে মাঝে হলেও পুরো পরিবার নিয়ে সিনেমা থিয়েটার বা দক্ষিণেশ্বর বেলুড় ব্যান্ডেল চার্চ এসব যাওয়া জেঠুর একটা শখ।

মা তখন বলল—'জনাকয়েক ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা এসেছেন, জেঠুর বসার ঘরে বসে আছেন, তাঁরা তোকে দেখতে চান।'

—'আমাকে ? কেন ?' অপালা অবাক হয়ে বলল।

—'তোকে দেখতে এসেছেন। বিয়ে, বিয়ের জন্য।'

অপালা একটা পাথরের টুকরোর মতো বসে পড়ল। মায়ের বিছানায়। মা ভয়ে ভয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন—গাল দুটো রক্তহীন হয়ে গেছে। জ্যাঠামশাইয়ের চটির আওয়াজ শোনা গেল। —'কই তোমাদের হল ?'

ঘরের দরজার পর্দা টানা। তিনি দোর থেকেই ফিরে গেলেন। মা ফিসফিস করে বললেন—'যা অপু, শিগগির যা।'

অপালা ধরা গলায় তেমনি বসে বলল—'আমি বিয়ে করব না মা।'

মা বললেন—'বিয়ে করব না বললে মেয়েদের চলে ? আজ নয় কাল বিয়ে তো করতেই হবে।'

—'বেশ তো পরে ওসব কথা ভেবো।'

—'আমি কোনদিকে যাই অপু। এঁরা নিজে এসেছেন। ছেলেটি তো রাজপুত্তুরের মতো। তোমার গান শুনে, খোঁজ খবর করে ওঁরা এসেছেন। যাও দেখা করে এসো। যা-ও বলছি, যেতেই হবে। আমি বাথরুমে শাড়ি-ব্লাউজ রেখে এসেছি।'

অপালা উঠল। বাথরুমে ঢুকে গেল প্রাণহীন পুতুলের মতো। মা বাইরে অপেক্ষা করছেন তো করছেনই। কুড়ি মিনিট হয়ে গেল। দরজায় আস্তে ধাক্কা দিতে যাচ্ছেন, দরজা খুলে গেল। অপু বেরিয়ে এসেছে। যে ধানীরঙের ধনেখালি শাড়ি পরে সে কলেজ গিয়েছিল সেই একই শাড়ি তার পরনে। চোখ দুটো টকটকে লাল। চোখের নোনতা জল পড়ে মুখের রঙ চকচক করছে। মাথার চুলে পর্যন্ত সে চিরুনি চালায়নি। যেমন সিঁথির দুপাশের চুলগুলো উড়ে একটা ধোঁয়াটে কুন্ডলিমতো হয়েছিল, তেমনি আছে। হা-ক্লান্ত চেহারা।

—'এ কি ? গা ধুসনি ? চুল ঠিক করলি না ? গাড়োয়াল শাড়িখানা রাখলুম..'

অপালা জবাব দিল না।

—'মুখে সাবান দিসনি। চোখ এতো লাল। এভাবে কারো সামনে যাওয়া যায় ?'

অপালা জবাব দিল না এবারও। মার হাতে এক গ্লাস দুধ, তাতে আজ জেঠুর বরাদ্দ বোর্নভিটা। —'খেয়ে নে।'

অপালা বলল—'খিদে নেই।' অগত্যা টেবিলের ওপর দুধের গ্লাস নামিয়ে রাখলেন মা। বললেন—'চল।'

জেঠুর বসার ঘরে একটি আরামকেদারা। পুরনো কালের গোল শ্বেতপাথরের টেবিল ঘিরে গদি মোড়া কিছু বেতের সোফা, কাঠের হাতলওলা। অপালাকে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই তিনটি পুরুষ উঠে দাঁড়ালেন। একজন মহিলা উৎসুক চোখে চেয়ে আছেন।

জেঠু সোৎসাহে বলে উঠলেন—'এই আমার ভাইঝি। মানে টেকনিক্যালি ভাইঝি। আসলে আমার মেয়েই তো। এই মাত্তর কলেজ থেকে ফিরল। ভীষণ সিম্পল। সাজ নেই গোজ নেই। মায়ের সঙ্গে হাতে-হাতে সব করছে। তার ওপর কলেজের বি.এ. অনার্সের পড়া, গান। কোনটিতেই ফাঁকি

নেই।'

অপালা দরজার দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে ছিল। একজন পুরুষ শশব্যস্ত হয়ে বললেন—'আপনি বসুন।'

হঠাৎ এই কণ্ঠস্বরের ভদ্রতায় বা সমাদরে কে জানে কিসে অপালার মাথা ঘুরে উঠল, গা বমি করছে, গলার ভেতর কিসের প্রচণ্ড চাপ, সে আস্তে আস্তে বসে পড়ল। কে বলছে। কোথা থেকে বলছে কিছুই দেখল না।

মহিলা একটু বয়স্ক, ভারীভুরি, তিনি বললেন—'তোমার থেকে অনেক বড় আমি। তুমিই বলছি। সেদিন সুবলোকের আসরে তোমার গান শুনে আমরা মানে আমি, আমার স্বামী, আর এই আমার ভাই। আমরা অভিভূত হয়ে গেছি।'

জেঠু বললেন—'একটা গান শুনিয়ে দাও না মা! সেই যে 'মহা সিন্ধুর ওপাব হতে', কিম্বা 'প্রভু আমার প্রিয় আমার', খালি গলায় গাইবে দেখবেন কিচ্ছু লাগবে না। একটি সুর এদিক-ওদিক হবে না।'

একটি পুরুষ বলে উঠলেন—'না না, ওঁকে ভীষণ ক্লান্ত মনে হচ্ছে। গান শোনাতে হবে না। গান তো আমরা শুনেছি, গান শুনেই তো আসা!'

মহিলা বললেন—'মাসিমা, ওকে নিয়ে যান, পরে একদিন আলাপ হবে'খন।'

অপালা চৌকাঠ পেরোতে পেরোতে শুনল, মহিলা বলছেন—'খুব লাজুক না?'

জেঠু বললেন—'লাজুক, নম্র, শান্ত, ধীর। অথচ কী স্টেজ ফ্রি ভাবতে পাববেন না।

'পাঁচ ছ-বছব বয়স থেকে স্টেজের ওপর শ'এ শ'এ লোকের সামনে গাইছে। তাছাড়া আপনাদের আসার কথাও তো আমরা ওকে জানাইনি।'

—'সে কি? কেন?'

—'আরে এসব মেয়ে-দেখানো-টেখানো আজকালকার মেয়েরা পছন্দ না-ও করতে পারে। হয়ত মনে আঘাত লাগবে।'

মহিলা বললেন—'তো বেশ তো! বললেই হত, কোনও রেস্তোরাঁয় কিম্বা লেক-টেক, ভিক্টোরিয়া-টিয়ায় ব্যবস্থা করা যেত।'

—'তা যদি বলেন প্রবালবাবু, আমি বয়স্ক মানুষ। আমার ওসব পছন্দ নয়। আর আজ না হয় আপনারা দেখতে এসেছেন। এর পরে আপনাদের শ্বশুর-শাশুড়ি এঁরাও আসবেন। তখন কি বয়স্ক, মানী মানুষকে আমি বলব —"চলুন ভিক্টোরিয়ায় চলুন!"

ছোট্ট একটু হাসি শোনা গেল। মহিলা বললেন—'তা অবশ্য। আমরা কর্তাগিন্নি বা আমার ভাইয়েরা যে-রকম লিবর‍্যাল, বাবা-মা ন্যাচার‍্যালি তেমন না। তাঁরা হয়ত চুল খুলিয়ে, হাঁটিয়ে মেয়ে দেখে নিতে চাইতে পারেন। এ রান্নায় কী ফোড়ন, অম্বলে ঘি লাগে কি না...তখন কিছু মনে করবেন না কাকাবাবু।'

জেঠু বললেন—'মনে করব কি? আমিও তো ওই দলে! ঘরে নেবেন, বরাবরের মতো, বাজিয়ে নেবেন না?'

জেঠুর ঘর থেকে মায়ের ঘরের দিকে আসতে আসতে গলার আওয়াজগুলো ক্রমশই মৃদুতর হয়ে যাচ্ছিল।

অপালা ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। প্রদ্যোৎ ঢুকল, মা বললেন—'খোকা, কোন সকালে মেয়েটা এইটুকু খেয়ে বেরিয়েছে। দুধটা ওকে একটু খাওয়া তো! আমার ওদিকে এক গাদা কাজ। ওঁরা তো মেয়ে আসবার আগে একটু চা ছাড়া কিছু মুখে করেননি।'

প্রদ্যোৎ দুধের গেলাস হাতে খাটে বোনের পাশে এসে বসল, বলল—'তুই কি খুকুমণি? ডুডু খাইয়ে দিতে হবে?'

অপালা মড়ার মতো পড়ে ছিল। কোনও জবাব দিল না।

দাদা বলল—'অপাই, ভালো করে আমার কথা শোন। তুই তো তোর পাণিপ্রার্থী ভদ্রলোককে দেখিসনি। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, এ. জি. বেঙ্গলে কাজ করেন। টকটকে ফর্সা। চমৎকার স্বাস্থ্য, রীতিমতো সুপুরুষ। খুব গান ভালোবাসেন। মানে তোর ওই নুম, তুম, দিরে, নানা। তোদের লাস্ট সুরলোকের যে কমপিটিশনটা হল, তাইতে তোর গান শুনে, অর্থাৎ তোর গুণ নিজের কানে যাচাই করে, তোকে দা-রুণ পছন্দ করেছেন। একেবারে ফেল্যাট। দ্যাখ, যারা গান ভালোবাসে তারাই সেধে তোকে নিতে চাইছে। এখানে তোর গাইবার ঘর নেই। পরিবেশ নেই। জেঠু দিনরাত টিকটিক করছে। অপাই, এখানে বিয়ে হলে তুই বেঁচে যাবি। লক্ষ্মী মেয়ে। দুধটা খেয়ে নে। দাঁড়া অনেকক্ষণ খালি পেটে আছিস, আগে একটা বিস্কুট খা।'

অপালা বলল—'ডাক্তারি করিসনি দাদা। সলিড গলা দিয়ে নাববে না। দুধটা দে, খেয়ে নিচ্ছি।'

—'তবে? রীজনেব্‌ল্ হতে হবে তো? আমি নিজে তো কবে জেঠুর গারদখানা থেকে ছাড়া পাবো, তার দিন গুনছি। মেয়ে বলেই তোর কত সুবিধে।'

অপালা দুধটা খেয়ে পাশ ফিরে শুলো।

ঘণ্টাখানেক পরে জেঠু ঘরে ঢুকলেন। তাঁর চটির শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা যায়। প্রদ্যোৎ বলে এ বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধাই আছে।'

—'অপাই! শুয়ে আছো কেন? কান্নাকাটি করছো নাকি? শোনো, ভালো ঘর। ভবানীপুরে নিজেদের বাড়ি, দুটি ভাই, এটি বড়, দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। অত্যন্ত ভালো লোক। বাবাজীটির তো কথাই নেই। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। ভালো ডিগ্রি, ভালো রোজগার, তোমাদের খেয়াল-ঠুংরিতে রীতিমতো ইন্টারেস্ট। তোমার আপত্তিটা কিসের? আমি তো মনে করি এটা গড-সেন্ড। এতো ভালো সম্বন্ধ আমরা নিজেরা হাজার চেষ্টা করলেও জোগাড় করতে পারতুম না। আর বাইজি হয়ে ঘরে ঘরে মুজরো নেবার বদলে ঘরের বউ হয়ে সংগীত চর্চা করাটাই আমি ভালো মনে করি। আমি কেন, যে কোনও ভদ্রলোক তাই মনে করবে।'

অপালা এখনও তেমনি শুয়ে আছে। কিন্তু উৎকর্ণ। জেঠু এসব কি বলছেন? বাইজি-টাইজি? এতো খারাপ কথা সে কখনও তাঁকে বলতে শোনেনি।

—'লখনৌ যাবে ? নাজনীন বেগমের কাছে গান শিখতে ? সেখান থেকে তুমি আর ভদ্রঘরে ভদ্রসমাজে ফিরে আসতে পারবে মনে করেছো ? বউমার কাছে সব শুনে আমি গতকাল রামবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। বলি, তোমার গার্জিয়ান কে ? তিনি না আমি ? আজ যদি আমি চোখ বুজি, তিনি তোমায় দেখবেন ? সারা জীবনের মতো ভার নিতে পারবেন ? না নেবেন ? ডু যু নো হু দ্যাট নাজনীন বেগম ইজ ? একটা তওয়ায়েফ। চরিত্রহীন, ভ্রষ্টা রমণী। তাঁর হাতে আমি তোমাকে তুলে দেবো ? আমার ভাইয়ের কাছে, স্বর্গত আর সব পিতৃপুরুষের কাছে কী কৈফিয়ত দেবো আমি ? ভাবতবিখ্যাত তয়ফাওয়ালি হয়ে মঞ্চে মঞ্চে চোখে সুর্মা আর পেশোয়াজ পরে কানে হাত দিয়ে গান করে বেড়াচ্ছো আর হয়ত অনেক টাকা বোজগার করছো—এর চেয়ে অনেক বেশি অভিপ্রেত আমার কাছে যে তুমি তোমার মায়ের মতো গৃহস্থঘরের বউ হয়ে, কস্তাপেড়ে কাপড় পরে স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে জাজ্বল্যমান সংসারে গিন্নিপনা করছো। আজ তুমি ছেলেমানুষ। বাইরের চটক, গ্ল্যামার এই সবেই মন যাচ্ছে। স্বাভাবিক, দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু ভবিষ্যতে একদিন এই বুড়ো জেঠুকে মনে করবে, বলবে, বলতে হবে—জেঠু যা বলেছিল, ঠিক বলেছিল। সংসারে অসতীত্বের মূল্যে কেনা নাম টাকার চেয়ে সদুপায়ের সুখ শান্তি সামান্য শাক ভাত অনেক বড়। অনে-ক বড়।' জেঠু ভারী ভারী পায়ে চলে গেলেন।

অনেক রাতে দাদার চিলে-কোঠার ঘরে অপালা আস্তে আস্তে জিগগেস করল—'দাদা, তওয়ায়েফ কী রে ?'

—'ওঃ অপু, তুই বড় এমব্যারাসিং কোশ্চেন করিস।'

—'বল না।'

—ওই বাইজি-টাইজি হবে আর কি ?'

—'কিন্তু নাজনীন বেগম তো বেগম—বেগম মানে রানী—কোন মহারাজকুমার মানে হিন্দু রাজকুমারকে বিয়ে করেছেন। নিয়মিত স্কলারশিপ দেন, আগেকার গুরুকুল পদ্ধতিতে গান শেখান। ওঁর সম্পর্কে জেঠু ওভাবে বললেন কেন ?'

—'আমি তোদের গানের জগতের কিছু জানি ? তোর মাস্টারমশায়কে জিজ্ঞেস করিস। কে জানে হয়ত ভদ্রমহিলা বিয়ের আগে ওইরকম কিছু ছিলেন-টিলেন। তা ছাড়া লখনৌ, বেগম ইত্যাদি সব একসঙ্গে শুনে জেঠুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। জানিসই তো সব।'

—'তুই, তুই নিজে কী মনে করিস ?'

—'কী বিষয়ে ?'

—'মানে আমার কোনটা চুজ করা উচিত ?'

—' দ্যাখ অপাই, তোর এই লখনৌ-এর স্কলারশিপের ব্যাপারটার পুরো টার্মস অ্যান্ড কনডিশনস না জানা থাকলে তো কোনও মতামত দেওয়া সম্ভব নয়। আমি যেমন এফ. আর. সি এস হতে চাই। ইংলন্ডে যেতে চাই। একটা ওয়াইডার লাইফ, একটা বড় চান্স পেতে। এটাও তোর খানিকটা তেমন। শুধু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষাটার যেমন একটা সোশ্যাল স্যাংশন আছে, তোরটার তেমন

নেই। তোর ব্যাপারটা খুব আনসার্টন। আমাদের যদি উদ্বৃত্ত টাকা-পয়সা থাকত, উচ্চবিত্ত শ্রেণীর হতাম, অন্ততপক্ষে বাবাটাও যদি বেঁচে থাকত, হী ওয়াজ এ ডেয়ারিং অ্যান্ড সেনসিব্‌ল ম্যান, তাহলে সেই ভরসায় তোকে এই চান্সটা দেওয়া যেত। কিন্তু আন্ডার দীজ সার্কামস্ট্যান্সেস, আমি জানি না। সত্যিই জানি না, তুইই ডিসাইড কর। এইটুকু বলতে পারি তোর বর, তার দিদি, জামাইবাবু এঁদের আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু এরাই তো সব নয়। শ্বশুর-শাশুড়ি টাইপের লোকগুলোও তো আছে! অ্যাডজাস্টমেন্ট, হ্যানা-ত্যানা। তোর লাইফটা একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে। তবে সিকিওর থাকবে। তাছাড়া যারা গান-বাজনা ভালোবাসে তারা তো তোকে গান কনটিনিউ করতে দেবেই। এটা একটা প্লাস পয়েন্ট।'

অপালা বলল—'ধর, আমি কিছুতেই বিয়েতে রাজি হলাম না, লখনৌ গেলাম। গেলে আমি শিখবই। তোদের ভাষায় অনেক ওপরে উঠবই। এ আমি জানি। কিন্তু ধর সমাজ আমাকে নিল না, মানে সামাজিক সিকিউরিটি যাকে বলছিস তা আমার রইল না। সে ক্ষেত্রে তুই আমার পাশে এসে দাঁড়াবি না ? তুই আমায় সিকিওরিটি দিবি না ?'

—'আমি ?' প্রদ্যোৎ বলল—'আমার নিজেরই সিকিওরিটি কোথায় তার ঠিক নেই। ডাক্তার হয়ে বেরোতে, এস্ট্যাবলিশড্‌ হতে কত বছর লাগে জানিস ?'

অপালা ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে বলল—'আজ আমার নীচে যেতে ভালো লাগছে না। দাদা তোর কাছে শুতে দিবি ? প্লীজ !'

—'শো না। আরে বোকা! তাতে কি হয়েছে ? জেঠু অ্যালাউ করলেই হল।'

অপালা বলল—'তুই এম. আর. সি. পি এফ আর সি এস করতে লন্ডনে যাবি, আমাকে একটু একটুখানি মনে রাখিস। যদি কখনও কোনও একান্ত দরকার হয়, একটু সাহায্য, একটু সাপোর্ট দিবি তো ?'

—'শিওর ! কী পাগল বল তো তুই। আফটার অল আমরা দুটোই তো ভাই বোন। পরস্পরকে দেখবো না ? কে বলতে পারে তোকেই হয়ত সাপোর্ট দিতে হবে আমায়।'

আরও রাতে সুজাতা ছাতের ঘরে এসে দেখলেন—দু-ভাই বোন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। অপালা সাধারণত একটু কুঁকড়ে শোয়। তার একটা হাত তার দাদার গায়ে আলতো ভাবে পড়েছে। খোকা বোধহয় কোনও বই পড়ছিল। বইটা যথারীতি বুকের ওপর উল্টো করে রাখা। দু হাত মাথার ওপর তোলা।

দৃশ্যটা জেঠু পছন্দ করবেন না সুজাতা জানেন। কিন্তু ক' বছরের আড়াআড়ি এই দুই ভাইবোনের অসহায় ঘুমিয়ে থাকার দৃশ্য তাঁর চোখে জল এনে দিল। তিনি বুঝলেন আজ আর অপুকে তুলতে পারবেন না। এটুকু। মাত্র এইটুকুই তার বিদ্রোহ। কিম্বা বিদ্রোহও নয়। অভিমান। চোখ উঁচু করে আকাশে সপ্তর্ষির দিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনি। এতখানিক আকাশ, এতখানিক পৃথিবী, অথচ তাঁর ছেলেমেয়ের জন্য একচিলতে ঘরের বেশি কেন নেই! কেন! তিনি আস্তে আস্তে নিচে নেমে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে

॥ ৫ ॥

সামনে ব্যাকেলাইটের হাতল-ওলা কফির পট। দুটো কাপে মাপমতো কফি এবং দুধ ঠিকঠাক ঢালতে ঢালতে দীপালি বলল—'সোহম সত্যি তুমি এটা জানতে না ? না ন্যাকা সাজছ ?'

—'হোয়াট ডু ইউ মীন ? ন্যাকা সাজছি মানে ?'

—'সরি। কিন্তু আমার ধারণা বিশ্বশুদ্ধু লোক জানে।

—'অপালা জানে না।'

—'অপালার কথা ছেড়ে দাও। সে কাবও কোনও ব্যক্তিগত ব্যাপারে থাকে না। একটা পুরোপুরি মানুষই না। কিরকম নন-হিউম্যান মেয়ে।'

—'আই অবজেক্ট দীপালি।'

—'আমি আসলে ঠিক তা বলতে চাইনি। ও আসলে নিজের গান নিয়ে এমন মশগুল থাকে যে অন্যসব ব্যাপার ওর নজর এড়িয়ে যায়। একেবারে ওয়ান-ট্র্যাক মাইন্ড। যাই হোক, টেক ইট ফ্রম মি। মাস্টারমশাইয়েব স্ত্রী। অর্থাৎ মিতুলের মা মাস্টারমশাইয়ের এক শিষ্যের সঙ্গে ইলোপ করেছিলেন। মিতুল তখন জাস্ট পাঁচ বছরের মেয়ে। এর চেয়েও ইন্টারেস্টিং গল্প আমার জানা আছে। মিতুলের মার এই ফার্স্ট ইলোপমেন্ট নয়। উনি প্রথমে ছিলেন মাস্টারমশাইয়ের গুরুজীর স্ত্রী। মিতুল তাঁরই মেয়ে। মাস্টারমশায়ের যখন ফর্ম পড়তে শুরু করেছে, তখনই উনি দ্বিতীয়বার ইলোপ করলেন এক উঠতি বাজিয়ের সঙ্গে। বেশ এলেমদার মহিলা।'

—'বলো কি ?' সোহম আত্মগত বলল, কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে।

—'মিতুল জানে ?'

দীপালি কাঁধ নাচাল। —'কি করে জানবে বলো। ষোলো বছর বয়স তো হলই !'

কানাঘুষোও তো শোনে। মিতুলের মায়ের ছবি কোথাও দেখেছ ?'

—'না। তা অবশ্য দেখিনি।'

—'অস্বাভাবিক মনে হয় না ?'

—'হয়নি কখনও। অনেকের থাকে মৃত স্ত্রীর ফটো দেখলে কষ্ট হয়। আমার বাবাই তো মায়ের ছবি নিজের ঘরে রাখেন না। আমার ঘরে টাঙানো আছে। দেখেছ তো ?

মাস্টারমশায়ের তো তবে খুব কষ্ট।'

—'দ্যাখ্ সোহম, কিছু মনে করিস না। গল্পের প্রথম অংশটা যদি সত্যি হয়, তাহলে উনি নিজের জালে নিজে জড়িয়েছেন। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। লোকে তো বলে ওঁর সেই রাইভ্যাল নাকি ওঁকে সিঁদুর খাইয়েছিল। তাইতেই ওঁর গলা নষ্ট হয়ে যায়।'

—'সিঁদুর ?'

—'হ্যাঁ সিঁদুর। সিঁদুর বিষ। খেলে স্পেশ্যালি গলার বারোটা বেজে যায়।'

—'এসব তুমি জানলে কোত্থেকে ?'

—'আমাদের গানের বাড়ি। আমি গান শেখাচ্ছি পনের বছর বয়স থেকে। দিদিও নাচ নিয়ে আছে। গান-বাজনার লাইনের অনেক কেলেঙ্কারি, অনেক কেচ্ছাই আমার জানা। সামনে দেখছি, আহা কী গুণী, কী সাধুপুরুষ, শিবনেত্র হয়ে আছেন। দিলের সব দরদ মিশিয়ে ছাত্র-ছাত্রী গড়ছেন, ভেতরে ভেতরে দেখবে কে কবে কাকে ফুসলিয়ে এনেছেন। কে শিষ্যাদের কারো কারো ওপর কুনজর দিচ্ছেন, কিছু পাওয়া গেলে ভালো, না পাওয়া গেলে তুমিও আর কিছু পাচ্ছো না গুরুব কাছ থেকে।'

সোহম ভীষণভাবে চমকে উঠল—'কী বলছো ? দীপালি ? কী বলতে চাইছো ?'

—'তোমরা আর কী বুঝবে ? আমরা বুঝি। আমরা জানি। ইন ফ্যাক্ট, আমাকে উনি প্রায় কিছুই শেখান না। ব্যাক করেন না। রাগে। বোঝ না ?'

—'উনি কি তোমাকে...'

দীপালি বাধা দিয়ে বলে উঠল—'এসব কেউ সোজাসুজি বলে না সোহম, ঠারে-ঠোরে চায়। প্লীজ আমাকে এ নিয়ে ঘাঁটিও না। কী দরকার ? আমি ফেড আপ হয়ে গেছি।'

সোহম ইতস্তত করে বলল—'তুমি কি বলতে চাও অপালা ওঁকে কোনভাবে খুশি করে ?'

—'আমি কিছুই বলতে চাই না সোহম। শুধু আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে যতটুকু বুঝেছি বলছি। আর আমার অভিজ্ঞতাটা নেহাত ফ্যালনা নয়। অপালা আমার চেয়ে অনেক বেশি ট্যালেন্টেড—একথা আমি একশবার স্বীকার করছি। সেটা একবারও কোয়েশ্চন করছি না। কিন্তু এটা তো মানবে দ্যাট শী ইজ প্লেইন... লুকিং ! আমার অভিজ্ঞতা আর ওর অভিজ্ঞতা এক হতে পারে না। মানো তো ?'

সোহম অন্যমনস্কভাবে কফির কাপটা নামিয়ে রাখল। অপালাকে দেখতে ভালো, কি ভালো নয় এ প্রশ্ন তার মনে কখনও ওঠেনি। অপালার সঙ্গে সে একসঙ্গে গান শিখছে রামেশ্বর ঠাকুরজীর কাছে তা প্রায় আট দশ বছর তো হবেই। শিখতে শিখতেই বালক-বালিকা থেকে তরুণ-তরুণী হয়ে উঠেছে। অত ছোট থেকে কোনও মেয়ের সঙ্গে মিশলে তার চেহারা সম্পর্কে ধারণা গড়ে ওঠা খুব শক্ত। তাদের সব সময়েই ভালো লাগে। সোহম তাই চোখের সামনে শূন্যের ওপর অপালাকে দেখবার চেষ্টা করল। ছোট কপাল। একপাশে সিঁথি কেটে একটা খুব লম্বা মোটা বেণী করে অপালা। ওর বাড়ি গেলে ওকে খোলা চুলে দেখা যায়। পুরো পিঠ জুড়ে বেশ কালো চুল। তাতে বোধহয় একটু বাদামির মিশ্রণ আছে। খুব লম্বা না হলেও অপালার চেহারাটা লম্বাটে। সেন্টিমিটারে কতটা আসবে, কল্পনার চোখে দেখে বলা যাচ্ছে না। কালো ? হ্যাঁ সোহমের নিজের পরিবার, দীপালি, মিতুল, এদের সবার সঙ্গে তুলনায় অপালা বেশ কালো। কালো ? তা সে যতই কালো হোক, অপালাকে কোনদিন খারাপ লাগেনি। সোহম হঠাৎ লজ্জিত হয়ে অনুভব করল সে অপালার শরীরের উচ্চাবচতা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছে। মাথাটা

একটু নেড়ে নিজেকে নাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে সে একটু ঝাঁঝাল গলায় বলল—'ওসব বাদ দাও তো !'

—'বাদ তো দেবই ! আমার যে জিনিসটা খারাপ লাগে সেটা হল, মিতুল তো ওই মায়েরই মেয়ে ! যে মা দু দুবার ইলোপ করেছে ! দ্বিতীয়বার একটা পাঁচ বছরের মেয়ে ফেলে। মিতুল কিরকম চঞ্চল দেখেছো ?—মাস্টারমশাইয়ের সব ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কিরকম ভাবে মেশে ! এর গলা জড়িয়ে ধরছে। ওর চুল টেনে দিচ্ছে। তাকে ভেঙাচ্ছে !'

সোহম দেখেছে। চাঞ্চল্যটা মিতুলের এক ধরনের আকর্ষণ ! ভারী ছটফটে। ভারী ফাজিল।

দীপালি বলল—'ও আবার না মায়ের মতো পালায় ! বাড়িতে তো বাবা ছাড়া কেউ নেই। বাবারা মেয়েদের কতটুকু বুঝতে পারে ! দলে দলে ছাত্র আসছে যাচ্ছে। কত ছেলে বাপরে বাপ ! দিলীপ সিন্‌হাকে দেখেছ ? কনটেসা চড়ে আসে ? ওদের এক্সপোর্টের ব্যবসা, অনেক বড়লোককে সেভর‍্যাল টাইমস্ কিনে নিতে পারে। সরোদিয়া। এদিকে মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার। ফার্স্টক্লাস পাচ্ছে। চেহারাও দারুণ। ছোট থেকে সিলভার-টনিক খাওয়ার চেহারাই আলাদা। ওর বাজনা শুনেছো ? পুরো গোয়ালিয়রের ঘরের বাজনা। দা-রুণ। তবু মাস্টারমশায়ের কাছে আসছে। আরও ভ্যারাইটি, আরও ডিফারেন্ট গতের জন্য। শুনেছো ওর বাজনা ?'

—'শুনেছি। ভালো বাজায়।'

—'মিতুল তো শুনছি ওর কাছে আজকাল তালিম নিচ্ছে। মাস্টারমশাই নাকি বলেছেন মিতুলের ভোক্যাল হবে না। ও যন্ত্র ধরুক। সরোদ—না সেতার ধরছে। তোমায় বলেনি ? হয়ত ওর সঙ্গেই...'

সোহম প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। সে আনমনে কফি ঢেলেই যাচ্ছে।

দীপালি বলল—'সোহম, আমরা টেবিলটা অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। বেয়ারাটা বড্ড ঘোরাফেরা করছে। চলো আমরা ময়দানের দিকে গিয়ে একটু বসি।'

সোহম হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভঙ্গিতে বলল—'ময়দান-ফয়দান ভালো লাগছে না। ওঠা যাক।'

দীপালি বলল—'আমাদের বাড়ি যাবে ? কিম্বা যদি বলো তোমাদের বাড়ি।'

—'বাড়ি ? বাড়ি-টাড়ি নয়।' সোহম মাথা নাড়ল, এত জোরে যে দীপালি একটু অবাকই হয়ে গেল।

সোহম হঠাৎ প্রায় লাফ দিয়ে উঠে কাউন্টারে গিয়ে বিলটা চুকিয়ে দিল। দীপালি পেছন পেছন আসছিল। তার দিকে সামান্য ফিরে সোহম বলল—'আচ্ছা দীপু চলি। পরে দেখা হবে, একটু কাজ আছে।' সে এমন হন হন করে এগিয়ে গেল যে দীপালি তাকে ধরবার চেষ্টাই করতে পারল না।

গোধূলি শেষ হয়ে গেছে। প্রথম সন্ধের অন্ধকারে বিজ্ঞাপনের আলোগুলো জ্বলছে নিবছে। এই সময় থেকে আরম্ভ করে চৌরঙ্গি সুন্দরী হতে শুরু করে। পাশে একজন পুরুষ-বন্ধু নিয়ে এই সুন্দরী চৌরঙ্গির পেভমেন্ট দিয়ে পথ চলাও

যে কী আরামের, কী তৃপ্তির, কত নবজীবনদায়ী হতে পারে! দীপালি কখনও অসহায় নয়। শৈশবে পিতৃহীন। তারা পাঁচ বোন এবং মা এই ছ'জন নারী মিলে তছনছ হয়ে-যাওয়া সংসার দাঁড় করিয়েছে। অসম সাহসে। বাবা এসরাজ বাজাতেন। মার্চেন্ট অফিসের কর্মী হলেও গান-বাজনার জগতের সঙ্গেই তাঁর দহরম-মহরম ছিল বেশি। সংসারে অনেক রকম উল্টোপাল্টা লোক এসেছে। বাবা মারা যাবার পর বহু লোক সুযোগ নিতে চেয়েছে। তারা বোনেরা মাকে রক্ষা করেছে, মা রক্ষা করেছে তাদের। কিন্তু রক্ষা-করার কাজটা ঠিক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়। একেবারেই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। দীপালি, ছাইয়ের মতো মুখ নিয়ে মনুমেন্টের দিকে তাকালো। শহীদ মিনার। চৌরঙ্গির যে কোনও কোণে দাঁড়িয়ে সামনে তাকালেই ওই শহীদ-মিনারের চুড়োটা চোখে পড়ে। এতো ভিড় তবু একলা। এতো মিছিল, এতো বক্তৃতা, তবু শান্ত। এই সগর্জন জীবন-মত্ততার ভেতরে শহীদ-মিনার নিশ্চুপ। সোহম কোনদিকে গেল? যদি দক্ষিণের বাসে উঠত তো অনায়াসেই তাকে সঙ্গে নিতে পারত, আর যদি উত্তরে কিম্বা পূর্বে কিম্বা পশ্চিমে যাওয়ার থাকত সে তো দীপালিকে বলে যেতে পারতো! দীপালির সঙ্গে তার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা। এমন কী গোপন প্রয়োজন যে ওইরকম লাফ দিয়ে চলে যেতে হবে? দীপালির সঙ্গ কি তার সহ্য হচ্ছিল না? এত দিন তো বেশ সহ্য হচ্ছিল! দীপালির সঙ্গ পেলে অনেকেই তো কৃতার্থ হয়ে যায়! মিষ্টি গলা, কথা বলে সুন্দর, দেখতে নয়ন শোভন। পোশাক পরিচ্ছদ রুচিসম্মত, খবরাখবরও রাখে যথেষ্ট। আজকাল সে নাভির ঈষৎ নীচে নামিয়ে শাড়ি পরতে শুরু করেছে। কিন্তু বাইরে থেকে সেটা বোঝা যায় না। শাড়ি হাওয়ায় উড়লে, স্বচ্ছ আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদের মতো তার পরিষ্কার নাভিমণ্ডলী দেখা যায়। আর নাইলন ডেক্রন ইত্যাদি কৃত্রিম সুতোর কাপড় পরলে পাতলা মেঘের আস্তর-ঢাকা চাঁদের মতো দেখায়। নিজেদের আলমারির লম্বা আয়নায় শাড়ি পরবার সময়ে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই শোভা দেখে। সত্যি কথা বলতে কি নিজে নিজেই মত্ত হয়ে যায়। দীপালি চন্দন-আতর ব্যবহার করে খুব একটুখানি, দুই কবজির ওপর এবং তুলোয় একটু আতর ঢেলে বুকের খাঁজে রেখে দেয়। একদিন এভাবে রাখলে দুতিনদিন অনায়াসে চলে যায়। মৃদু চন্দনের সুগন্ধ তাকে সবসময়ে ঘিরে থাকে। দীপালির ভেতরে ভেতরে কান্না পাচ্ছিল। অপমানের কান্না। হতাশার কান্না। তার চেয়েও দুর্বোধ্য কিছু একটা তার বুকের ভেতর থেকে কান্নার আকারে ঠেলে ঠেলে উঠছিল। চন্দনের গন্ধটা তার এতো অসহ্য লাগছিল যে বুকের ভেতর থেকে তুলোর টুকরোটা বার করে সে মিউজিয়ামের এক পাশে পেভমেন্টের ওপর ফেলে দিল। কোথায় যাবে সে এখন? আজ, মাত্র আজ, এই শুক্রবার দিনটা তার পূর্ণ ছুটি। আজ সে যা খুশি করতে পারে। সোহমকে টেলিফোন করে আজকের পুরো সন্ধেটা তার সঙ্গে কাটাবার পরিকল্পনা করে সে এসেছিল। সে আজ পরিপূর্ণ গোলাপি। অনেক কিছু না পেয়ে পেয়ে এবং সম্পূর্ণ নিজের ক্ষমতায় অনেক কিছু করতে পেরে তার আত্মবিশ্বাস, দম্ভ, জেদ, উচ্চকাঙ্ক্ষা সবই এখন তুঙ্গে। তার মনে হল সোহমকে ঠিক এই মুহূর্তে আর একবার দেখতে না পেলে সে মরে যাবে,

এখনই তার বুক ফেটে যাচ্ছে। এখন সে পরিষ্কার চিন্তাও করতে পারছে না। সোহমের চিবুকের ভাঁজটা, উঃ কেন ভগবান এরকম ভাঁজ তৈরি করেন, সোহম হাফ-হাতা শার্টও একটু গুটিয়ে পরে। বাইসেপ্‌স্‌ না ট্রাইসেপ্‌স্‌ সে সব বেশ ভালোভাবে দেখা যায়। সান্ধ্য চৌরঙ্গির সমস্ত বিজ্ঞাপনের আলো, ব্যানার, চলমান জনতা কিছু নেই, কিচ্ছু নেই, আছে খালি সোহমের গুটনো হাতার তলা থেকে দৃশ্যমান স্ফীত মাস্‌ল্‌। তার জামার ওপরের বোতাম খোলা, তার মধ্যে দিয়ে সরোদের জমজমার মতো রোম! একটা অন্ধ তাড়না ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে জোয়ারের স্রোতে তাকে যেন কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

তবে কি অপালা ? সোহম কি অপালার বাড়ি গেল ? দীপালি রাস্তা পার হল। নর্থের বাসে তুমুল ভিড়। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ডিপো থেকে একটা গ্যালিফ স্ট্রীটের ট্রাম ধরল। একটু ঘুরে ফিরে যাবে, তবু যাবে তো ? আজকে রাত ঘন হবার পর সোহমকে তার একবার দেখাই চাই। তারপরে অনেক রাতে, নিজের ঘরে, বোনেদের সঙ্গে ভাগের বিছানায় সে ঘুমের ঘোরে সোহম চক্রবর্তীর সঙ্গে পিলু বারোঁয়া হয়ে যাবে। সোহম যখন তার ভরাট পুরুষালি গলায় গায়, দীপালি তার নিজের আসনে বসে মন্ত্রমুগ্ধ মৃগীর মতো নিস্পন্দ হয়ে থাকে। সোহম তার বিলম্বিত বিস্তার পেরিয়ে হঠাৎ বিনাভূমিকায় হলক তান আরম্ভ করে দেয়। অমনি দীপালির শিরা-উপশিরায় ঝলকে ঝলক নীল রক্ত ছুটতে শুরু করে হৃৎপিণ্ডের দিকে, সোহম অভিমুখে। সোহম যদি ঠুমরি বা গজল ধরে, দীপালি সেখান থেকে চলে যায়, কারণ প্রচণ্ড আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ, চোখের জলে তার মুখ প্লাবিত, 'তোরে দেখনে কো জিয়া লাল চায় সজনোয়া !' সে যে এত লোকের মাঝখানে সোহমের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছে না, সেই কারণে সমস্ত উপস্থিত জনমণ্ডলীকে তার স্লেটের ওপর স্পঞ্জের টুকরো দিয়ে মুছে ফেলতে ইচ্ছে করে। অর্থহীন, বিদ্যুৎ-হীন মুখ সব। অপ্রয়োজনীয়। কেন আছে ওরা ? শুধু কতকগুলো নীরস পাথরের দেয়ালের মতো। যাতে সে এইসব বাধা পেরিয়ে সোহমের কাছে পৌঁছতে না পারে।

ট্রামে একেবারে কোণের দিকের লেডিজ সিটটা সে পেয়েছিল। ডান দিকে তাকালেই সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রীদের দেখা যায়। দীপালি তার ব্যাগ খুলে গোগো সানগ্লাস পরে নিল, যদিও সূর্য নেই, রোদ নেই। গগল্‌সের তলায় সে রুমাল চেপে ধরল। গরম চোখের জল শুষে নিতে লাগল টার্কিস তোয়ালের টুকরো। তার মেজাজ এখন তার সপ্তকের ধৈবতে। আস্তে আস্তে নিখাদের দিকে উঠছে, তীব্র, তীব্রতর নিখাদ। যেখানে সোহম, তার সোহম। এতো তীব্র, তপ্ত, এতো ক্ষিপ্ত এ ছুট তান যে ট্রামের সিটে মাথা কুটতে চাওয়া শরীর মনটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে দীপালির সমস্ত দম ফুরিয়ে গেল। সে যখন অপালাদের কীর্তি মিত্র লেনের বাড়িতে পৌঁছলো তখন সে একটা মাঝদুপুরের ঝলসানো পাতা, কিম্বা সম্পূর্ণ নিংড়ে নেওয়া গামছা, শক্তিহীন, দীপ্তিহীন, অবসন্ন। সুজাতা তাকে এ সময়ে দেখে অবাক হয়ে বললেন 'আরে! দীপালি। এতো রাতে ? অপাই ছাতে আছে। খুব ভালো হয়েছে তুমি এসেছো। আজ কিন্তু খেয়ে যাবে।'

অপুর মার আতিথ্য এইরকমের। সন্ধে পেরিয়ে গেছে, অতএব খেয়ে যাবে। আয়োজন হয়ত খুব সামান্যই। কিন্তু অসামান্য তাঁর হাতের গুণ আর আন্তরিকতা।

দীপালি বলল—'আর কেউ আসেনি ?'

—'কে আসবে আর ? কেউ না।' দীপালির মুখে যেটুকু আলো ছিল, এবার তা এক ফুৎকারে নিভে গেল। অপুদের বাড়ির ছাতে যাবার উৎসাহ আর বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। কিন্তু এখন তো আর পিছোনো যায় না। সে আস্তে আস্তে উঁচু উঁচু সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠল।

ছাতের এক কোণে পাঁচিলের ওপর বসানো ফুলের টবের ওপর হাত রেখে অপালা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তার ঈষৎ ঢেউ খেলানো চুল আবাঁধা, পিঠের পেছনটা অন্ধকার। সামনেও অন্ধকার। তারার আলোয় শুধু মুখের আদলটুকু দেখা যায়।

কাছে গিয়ে দীপালি বলল—'এ কি রে অপু, তুই কাঁদছিস ?'

—'না তো !' অপালা মুখ ফেরালো। তারার আলো পড়ে তার গাল চকচক করছে, নাকের ডগাটাও। কিন্তু এখনও দীপালির মনে হল অপালা কাঁদছে। কান্না তো এক রকমের হয় না। মল্লার কত রকম আছে, সারং কত রকম আছে, কান্না কেন এক রকমের হবে ! দীপালি নিজেও তো এখন কাঁদছে, গরম চোখের জলে তার আপাদমস্তক নোনা, অপু কি দেখতে পাচ্ছে ? সোহম কি বুঝতে পারছে ?

দীপালি বলল—'কি খবর রে অপু ? কবে যাবি ঠিক করলি ?'

—'কোথায় ?' অপালা জিজ্ঞেস করল।

—'লখনৌ, আবার কোথায় ? তুই না বললেও খবরটা আমাদের কানে এসেছে।'

অপালা একটু চুপ করে থেকে বলল—'যাবো। তবে লখনৌ নয়, হরিশ মুখার্জি রোডের কাছে একটা কি রাস্তা, বেণীনন্দন না কি, তোরা ভালো বলতে পারবি।'

—'কেন, সেখানে আবার কোন ওস্তাদ থাকেন ? একজন নাম-করা সেতারী থাকেন। তুই কি তাঁর কাছে শিখবি ? তুই নাজনীন বেগমের স্কলারশিপটা নিবি না ?'

—'কোনও স্কলারশিপই নিচ্ছি না দীপুদি। ওই গলিটাতে আমার বিয়ে হচ্ছে।'

—'বিয়ে ?' দীপালি আকাশ থেকে পড়ল। 'তোর বিয়ে ? কোনদিন ভাঙিসনি তো ?'

—'আমি নিজে জানলে তো ভাঙব। জেঠু ঠিক করে ফেলেছেন। হঠাৎ। কে ভদ্রলোকের নাকি আমার গান শুনে খুব ভালো লেগেছে। জেঠু অ্যাডাম্যান্ট।'

—'এ তো খুব ভালো কথা রে অপু !'

—'তুইও এ কথা বলছিস দীপুদি ?'

দীপালি মৃদুস্বরে বলল—'কি জানি, আমি তো বিয়ে হলে বেঁচে যাই।'

অপালা চুপ করে রইল।

দীপালী বলল—'বলছিস গান শুনে পছন্দ করেছে, সেখানে তোর গানেব অসুবিধে তো হবে না। লখনৌ-এর অফারটা হয়ত অ্যাকসেপ্ট করতে পারবি না এখনই। কিছু মনে করিস না অপু, তোর মতো বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ার চেয়ে বড় সৌভাগ্য মেয়েদের আর হতে পারে না। সে স্কলার মেয়েই হোক আর সঙ্গীতপ্রভাকরই হোক।'

অপালা যেন দীপালির কথাগুলো শুনেও শুনল না। আস্তে আস্তে বলল—'একটাই আশা। ভদ্রলোকের মা বাবা নাকি বলেছেন বড্ড রোগা আর কালো।'

দীপালি হেসে ফেলল, বলল—'এটাকে একমাত্র আশা বলছিস?'

অপালা দূরের দিকে তাকিয়ে বলল—'নাজনীন বেগমের কাছে ঠুমরির তালিম নেওয়ার আশা বোধ হয় নেই। সে এ-বিয়ে না হলেও না।'

দীপালি বলল—'নাজনীন বেগমের কাছে তালিম না নিলেও তুই ঠুমরি খুব ভালো গাস। সুরলোক যদি ঠুমরির আইটেমটা রাখত, তোর ফার্স্ট প্লেস কেউ হাজাব পলিটিক্স করেও আটকাতে পারত না। অত ভেঙে পড়ছিস কেন?'

অপালা বলল—'শুধু তো বেগমের কাছে তালিম না। দিবারাত্র একটা গানের আবহাওয়ার মধ্যে বাস করার অর্থ বুঝিস দীপুদি! শুধু ওঁর গান রোজ শুনতে পাবো তাই নয়, গানটা কি ভাবে তৈরি হয়ে উঠছে বুঝতে পারবো, ওঁর সাধনার সঙ্গে মিশে যাবো। আরো কত গুণী নিশ্চয়ই আসবেন, আসেন শুনেছি। তাঁদের গান টিকিট কেটে কনফারেন্সে শোনা যায় না। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও হয়ত কেউ অলৌকিক প্রতিভাধর থাকতে পাবে যার সঙ্গে শিখে ধন্য হতে পারতুম। আচ্ছা দীপুদি, তওয়ায়েফ না তয়ফাওয়ালী কী রে?

দীপালি বলল—'তুই বড্ড ছেলেমানুষ অপু, অন্য কেউ হলে তোকে ন্যাকা বলত। তওয়ায়েফ আর কি, গানবাজনাই যাদেব প্রফেশন, বড বড় রাজবাড়িতে জমিদার বাড়িতে মুজরো নেয়। সর্ট অফ বাইজি আর কি! তবে সাধারণ বাইজিদের সঙ্গে এদের একটু তফাত আছে। এরা উচ্চ মানের গান নাচ করে। বড় বড় ওস্তাদদের সঙ্গে সমানে সমানে। তুই গহরজানের নাম শুনিসনি? গহরজান, মালকাজান। এরাও অন্য বাইজিদের মতো দুর্দান্ত ফ্লার্ট করতে পারে, কিন্তু যার তার কাছে পয়সার বদলে দেহ দেয় না।

অপালা ভীষণ শিউরে উঠল, বলল—'নাজনীন বেগম কি তাই ছিলেন?'

—'বোধ হয়। শুনেছি উনি যখন সবে আসরে বার হতে শুরু করলেন রূপে আর গানে তামাম হিন্দুস্তান লিটর‍্যালি পাগল হয়ে গিয়েছিল। তারপর বম্বের কোন ঘরোয়া উৎসবে গান করতে গিয়ে মধ্যপ্রদেশের কে এক রাজকুমারের সঙ্গে আলাপ হয়। বছর পাঁচেক ওঁর পেছনে লেগে থেকে থেকে ভদ্রলোক অবশেষে ওঁকে বিয়ে করেন। এর জন্য বোধ হয় ভদ্রলোককে ওঁর পরিবারের ত্যাজ্য-ট্যাজ্য হতে হয়েছে। খেতাবও ব্যবহার করেন না। এস্টেট না-ই রইল। বিজনেস ম্যাগনেট। টাকার পাহাড়ের উপর বসে আছেন। নাজনীনের কোনও সাধ নাকি অপূর্ণ রাখেননি। ইস্‌স্‌ অপু তোর আমার যদি

এইরকম একটা বিয়ে হত। বছরে ছ মাস ইয়োরোপ, আমেরিকা, হংকং, সিঙ্গাপুর, আর ছ মাস নিজের মহালে বড় বড় গুণী ওস্তাদদের নিয়ে গানা-বাজনা-নাচনা। তবে তোর বর তো গান শুনেই মুগ্ধ। তুই হয়ত ছোটখাটো নাজনীনই হতে চলেছিস।'

অপালা হাসল, বলল—'বেণীনন্দনের নাজনীন? ভালো বলেছিস।'

—'তবু তো কিছু একটা হচ্ছে। জীবনটা এগোচ্ছে। আমায় দ্যাখ। নাজনীন-টিনের মতো সুন্দরী না হলেও লোকে বলে আমার নাকি গ্ল্যামার আছে। কত ছেলে আমার পেছনে ল্যা-ল্যা করে ঘোরে, সে তো আমিও জানি। কিন্তু নোবডি ইজ এ রাজকুমার। নোবডি ইজ সিনসিয়ার। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ব্যাচ-কে-ব্যাচ পার করে যাচ্ছি। গাধা পিটে পিটে ঘোড়া করার নিরর্থক চেষ্টায় দ্যাখ জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়টা কেটে গেল। এ যে কী শূন্যতা...নাঃ তুই বুঝবি না।'

—'কেন রে দীপুদি, মাস্টারমশাইও তো সব সময়ে শেখাচ্ছেন, ওই রকম ব্যাচ-কে-ব্যাচ। ওঁর তো ওরকম কিছু মনে হয় বলে বুঝি না।'

—'আরে উনি তো ছাত্র-ছাত্রী পাচ্ছেন অপালা মিত্র, দীপালি মিশ্র, সোহম চক্রবর্তী, দিলীপ সিনহা, সৌম্যকান্তি বিশ্বাস...এদের। আমার মতো গা টিপলে ধা বলে এমনি মাল নিয়ে কি ওনার কারবার?'

সোহমের নামটা মুখে আনতে পেরে দীপালির বুকের ভেতরের আটকানো পাথরটা যেন ধস-এর মতো নেমে গেল। ভেতরটা তার থরথর করে কাঁপছে। এতক্ষণে ভালো করে চাঁদ উঠেছে। একটা বাড়ির চিলেকোঠার পেছন থেকে একটু তোবড়ানো ফুটবলের মতো গোলগাল চাঁদ। সেই আলোতে দুজনেই দুজনকে আরও স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে।

অপালা বলল, 'সেদিন তো আমি চলে এলুম, তুই কী গাইলি রে? আর সোহম?'

—'আমার কথা ছেড়ে দে। গাইলুম খম্বাজ। চার্মিং রাগ বলে। থেকে থেকেই তিলং এসে যাচ্ছিল। নিজেই বুঝতে পারছি বিস্তার করতে করতে ধা বাদ যাচ্ছে মধ্যমে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি সমানে। 'অঞ্জলি লহ মোর' ইনট্রুড করছে থেকে থেকে। কেউ একটা প্রশ্ন করল না। গানের শেষে প্রথামাফিক হাততালি।'

—'তোর এতো আধুনিক আর নজরুলগীতি গেয়ে গেয়ে আর শিখিয়ে শিখিয়ে এই অবস্থা হয়েছে দীপুদি। তুই একটু রেওয়াজ করিস না, করিস?'

—'দ্যাখ, অপু, আর কেউ না জানুক, কিন্তু তুই ভালো করে জানিস এ ছাড়া আর আমার উপায় নেই। এসব ছেঁদো কথা বলে কি লাভ? আমার কথা বাদ দে। গেয়েছে সোহম। সাংঘাতিক! তুই থাকলে মূর্ছা যেতিস। শাংকরাই গাইল। ফৈয়জ খাঁ সাহেবকে আর একটু মোলায়েম করে নিলে সোহমকে পাওয়া যাবে। এতো ম্যাস্‌কুলিন। সাদিক যে ওর ওই কালারলেস 'দেশ' নিয়ে কি করে ফার্স্ট হয়ে গেল, হলের কেউ বুঝতে পারেনি। 'দেশ' তো গাইলেই ভালো লাগে ভাই। ঠিক মনে হল নোটেশন ফলো করে গাইছে।

বিস্তার পর্যন্ত। তান না হয় তুই তৈরি গাইতে পারিস। কিন্তু বিস্তার এরকম সতর্ক, স্বরলিপি-ধরা হবে। কি জানি বাবা, নাকি ও-ই সবচেয়ে কারেক্ট গেয়েছে। এসব ভেতরের পলিটিক্স ছাড়া কি। সব্বাইকার মত ছিল তুই ফার্স্ট। সোহম সেকেন্ড। ফার্স্ট হলে মাসে দেড়শ টাকা করে স্কলারশিপ পেতিস পাঁচ বছর, তোর কত সুবিধে হত বল তো। আমার অবশ্য মত, সোহম প্রথম, তুই দ্বিতীয়। সোহমের গানের বলিষ্ঠতা আমাকে অ্যাপিল করে বেশি। তুই কিছু মনে করলি না তো ?'

—'দূর মনে করব কি ? আমার গাইতে ভালে লাগে গেয়ে যাই, কার থেকে ভালো গাইলুম অতশত বিচার করতে পারি না। আলাদা করে টেপ শুনলে হয়ত পারবো। পরে। কিন্তু সে সময়ে পারি না। সোহম একটা জিনিয়াস। ও তো প্রথম হতেই পারে।'

—'ছেলেটাকে তোর কেমন মনে হয় রে অপু, তুই তো অনেক দিন ধরে মিশছিস !'

—'আমার খুব ভালো লাগে। মহাপ্রাণ। সরল। কোনও ছোট জিনিস ওর মধ্যে নেই। ওর সঙ্গে যুগলবন্দী গাইতে আমার খুব ভালো লাগে। ওর সঙ্গে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুব ভালো হয় আমার।'

—'জীবনটাও ওর সঙ্গে যুগলবন্দী হলে ভালো হত, নারে অপু ? আসলে ওকেই বোধ হয় তুই বিয়ে করতে চাইছিস, তাই এটাতে এতো আপত্তি, না ?'

অপালা অবাক হয়ে বলল—'কে এসব বলল তোকে ? ও আমার ভাইয়ের মতো বা বলতে পারিস দাদার মতো, এবং খুব ভালো বন্ধু। তা ছাড়া ও তো কবে থেকেই ঠিক করেছে মিতুলকে বিয়ে করবে।'

দীপালি আস্তে আস্তে ছাতের ওপর বসে পড়ল। ভেতরে একটা আগ্নেয়গিরি ফেটে গেছে। মিতুলকে সোহমের ভালো লাগে এটা অনুমান করা যায়। কিন্তু মিতুল একটা ষোল বছরের স্কুলে-পড়া, ফ্রক পরা অতি-তরল-স্বভাব, গাধার মতো গলা-অলা মেয়ে আর সোহম তেইশ-চব্বিশ বছরের, রীতিমতো গুণী গাইয়ে, উচ্চ শিক্ষিত যুবক। সোহমের জীবনে অপালা, অতি সাধারণ দেখতে অপালা কিছু। তার গানের সাথী। মিতুল, অতি-তরল, খেয়ালী, বেয়াদব মিতুলও কিছু—তার ভালোবাসার পাত্রী। খালি দীপালি কেউ না। কিচ্ছু না। কেউ না। যদিও তার সঙ্গেই সবচেয়ে গল্প করে সোহম। কোনও মানে নেই তার। একেবারে অর্থহীন।

অপালা বলল—'দীপুদি, তুই ওরকম বসে পড়লি কেন ? কি হল তোর ? শরীর খারাপ লাগছে ?' অবরুদ্ধ কান্নায় দীপালি খালি বলতে পারল—'অপু, অপু, কী হবে এখন ? আমি...আমি সোহমকে ভালোবাসি। ওহ্, আই লাভ হিম ম্যাডলি !'

অপালার চোখে জল এসে গেছে। সে দীপালিকে প্রাণপণে তোলবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'দীপুদি শোন, আমার কথা শোন। এমন করে ভেঙে পড়িসনি। চল ঘরে যাই আমরা।'

দীপালির গোলাপি শাড়ি ছাতের ধুলোয় লুটোচ্ছে। কোথাও থেকে ঝলকে ঝলকে ভেসে আসা কোনও গন্ধপুষ্পের সৌরভের সঙ্গে মিশে তার

চন্দন-আতরের গন্ধ কেমন গা-ছমছমে লাগছে। যেন শির ছিঁড়ে যায় যন্ত্রণায় এ এমন আকুল করা গন্ধ। দীপালি তেমনি দমচাপা গলায় বলতে লাগল—'অপু তুই কিছু কর। কিছু কর প্লিজ। আমি পাগল হয়ে যাবো নইলে। মিতুল ? হু ইজ মিতুল ? একটা গুড়িয়া, মীনিংলেস, অপদার্থ। জাস্ট একটা পুতুল ছাড়া কী ? সোহম কি করে ওকে অ্যাট অল...ওহ্ অপু তুই আমাকে বিষ দে...।'

এই সময়ে প্রদ্যোৎ ছাতে উঠে আসছে দেখা গেল। একটু চেঁচিয়ে বলল—'অপু, মা খেতে ডাকছে।'

অপালা তাড়াতাড়ি বলল—'দাদা, দীপুদির হঠাৎ বড্ড বুকে ব্যথা করছে, একটু দ্যাখ তো !'

প্রদ্যোৎ ব্যস্ত হয়ে বলল—'সে কি ? আপনার কিছু গণ্ডগোল ছিল নাকি আগে ?' দীপালি কোনও উত্তর দিতে পারছে না।

প্রদ্যোৎ বলল—'অপু, পায়ের দিকটা ধরতে পারবি ? আগে ঘরে নিয়ে যাওয়া দবকার।' প্রদ্যোৎ বুকে পিঠে স্টেথো লাগালো। প্রেশাব মাপলো। তাবপব কান থেকে স্টেথোব নল নামিয়ে বলল—প্রেশারটা একটু হাই। হার্টবিটও একটু বেশি। কিন্তু একসাইটেড হলে ওরকম হতেই পারে।' সে অপালার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। অপালা খুব ছোট্ট করে ঘাড় নাড়লো। প্রদ্যোৎ বলল—'আপনি দেখছি খুব কেঁদেছেন। নিশ্চয় কোনও কারণে মনে খুব ব্যথা পেয়েছেন। ঠিক বলেছি না ? হাসুন। একটু হাসুন তো আগে ! আচ্ছা এইবারে একটা ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি, খেয়ে দেয়ে চুপটি করে শুয়ে থাকবেন। অপু, আর মিনিট দশেক পরে আমরা খেতে যাবো। তারপর আমরা দুজনে ওঁকে বাড়ি পৌঁছে দেবো। কোনও ভাবনা নেই। আরে জীবনে কত দুঃখ যন্ত্রণা, ডিস্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, তাতে ভেঙে পডলে চলবে ?'

॥ ৬ ॥

অফিস পাড়ায় সবে ঘর-ফিরতি ভিড় আরম্ভ হয়েছে। বাস-স্টপগুলোয় জটলা। এই সময়ে পথ-চলতি জনতার চেহারাটা সাইক্লোনের আকার নেয়। উত্তর-যাত্রী আর দক্ষিণ-যাত্রী, পূর্ব-যাত্রী আর পশ্চিম-যাত্রী জনতা পরস্পরের সঙ্গে যেন কাটাকুটি খেলে। রাস্তায় হকারদের উৎসাহ-উদ্দীপনাও এ সময়ে বহুগুণ বেড়ে যায়। গ্র্যান্ড হোটেলের তলায় কাগজের কুমির চলতে থাকে। মাথায় পালকওলা পালোয়ান পুতুলদেব লড়াই শুরু হয়ে যায়। প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ, ফোমের থলি, টি-শার্ট, বাহারী পেন, ঘড়ি, ছাতা ইত্যাদি পণ্য নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তার ওপরে ইভনিং শো সিনেমার খদ্দেরও জমতে থাকে। এই সমস্ত দিগ্‌বিদিক শূন্য জনতার মধ্য দিয়ে পথ কেটে কেটে এসপ্ল্যানেড পাড়ার একটি কাফেতে ঢুকল সৌম্যদর্শন যুবক। পর্দা-ঢাকা একটি ছোট কেবিনের মধ্যে ঢুকে সে বেয়ারাকে কিছু নির্দেশ দিল। পর্দার ফাঁক দিয়ে রেস্তোরাঁর প্রবেশ পথ দেখা যায়। যুবক অপেক্ষা করছে। আপাত দৃষ্টিতে ধীর। কিন্তু ঘন ঘন মুখ মোছা, ঘাড় মোছা, হাতের ভঙ্গি

বদলানো ইত্যাদি থেকে বোঝা যাচ্ছে যুবকটি উত্তেজিত। খানিকটা অধৈর্যও। যুবক নির্ভেজাল গৌরবর্ণ। পরিষ্কার কামানো মুখ। চুল খুব ভদ্রভাবে উল্টে আঁচড়ানো। বাঁ দিকে সিঁথি। বয়স হয়ত ত্রিশ পার হয়নি, কিন্তু মুখের চেহারায় গাম্ভীর্যের সঙ্গে চিন্তাশীল মেজাজ দুটো মিলে তাকে আরেকটু বয়স্ক দেখায়। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক যেমন ব্রজেশ্বর, নবকুমার কি গোবিন্দলালের ভূমিকায় একে বেশ মানাত। খুব সুপুরুষ দেখতে হলেও যুবকটি বোধ হয় তাড়াতাড়ি প্রৌঢ় হয়ে যাবে। কথা বললে দাঁত দেখা যায় না, এত ছোট ছোট এবং পরিপাটি সাজানো দাঁত। এই মুখগহ্বর চুপসে যায় তাড়াতাড়ি। মাথায় ঘন চুল, কিন্তু দু'পাশে পেছনে সরে গেছে। এই বিন্যাস অবধারিত ভাবে ভবিষ্যৎ টাকের লক্ষণ।

হঠাৎ যুবকটি চঞ্চল হয়ে উঠল। দুটি তরুণ-তরুণী ঢুকছে। দুজনেরই রোগাটে গড়ন। তবে তরুণটির চেহারায় ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যের লক্ষণ আছে। সে একটি টি শার্ট ও ট্রাউজার্স পরেছে। মাথার চুল ফুরফুরে, ঢেউ-খেলানো। মেয়েটি লাজুক, শান্ত। ক্ষীণাঙ্গী। হাতের তুলনায় মুখটি চকচকে। গালে একটা লাল আভা। খুব সম্ভব তার হালকা কমলা রঙের শাড়ির রং প্রতিফলিত হয়েছে মুখে। বড় বড় পল্লব-ঘেরা লম্বা টানা চোখ। নাক চাপা। ঠোঁটের পরিধি বেশ ছোট্ট। মাথায় অনেক চুল। সে দুদিকে দুটি বেণী পেছনে ঝুলিয়েছে। ভীরু কিশোরীর যেটুকু লাবণ্য, বা আকর্ষণ থাকে তার চেয়ে একচুল বেশি বা কম তার নেই। যুবকটি পর্দা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। একটা হাত তুলল। অতঃপর তিনজনেই পর্দা-ঢাকা কেবিনটার মধ্যে ঢুকল। তরুণ বলল—'শিবনাথবাবু, আমার বোন আপনাকে কিছু বলতে চায়। ও খুব কম কথা বলে। চট করে নালিশ করে না। শান্ত এবং লাজুক প্রকৃতির মেয়ে। সেই বোন যখন মুখ ফুটে তার ভবিষ্যৎ হ্যাজব্যান্ডের সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চাইল, আমার মনে হল দিস মাস্ট বি ভেরি ভেরি ইম্পট্যান্টি অ্যান্ড উই মাস্ট টেক হার সিরিয়াসলি। আপনার কী মনে হয়?'

শিবনাথ বলল—'কী আশ্চর্য! নিশ্চয়! আপনি বসুন! অ্যাকচুয়ালি আমিও মনে মনে এইরকমই কিছু একটা চাইছিলুম...'

প্রদ্যোৎ বলল—'তাহলে তো কথাই নেই। দুই বাড়ির কেউই যেন ঘুণাক্ষরে এই মিটিঙের কথা জানতে না পারেন। আমি বসছি না। আপনারা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করুন। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘুরে আসছি। তখন ওকে নিয়ে যাবো। ও কে সী ইউ।'

শিবনাথ কিছু বলবার আগেই প্রদ্যোৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল। শিবনাথ দেখল অপালার মুখ নিচু, সে ঘামছে। এই সেই মেয়ে যে রবীন্দ্রসদনে হল-ভর্তি শ্রোতার সামনে পণ্ডিত চন্দ্রকান্তর মতো ভারত বিখ্যাত সঙ্গীতকোবিদ ও ওস্তাদ গায়কের সঙ্গে বিতর্ক জুড়েছিল। যদিও তার মধ্যে আশ্চর্যভাবে কোনও অবিনয়, ঔদ্ধত্য অনুপস্থিত ছিল। বেয়ারাকে বলা ছিল। সে দুটো লস্যি এনে রাখল। শিবনাথ বলল—'ঠাণ্ডা চলে তো? না অন্য কিছু বলব?'

অপালা মাথা নাড়ল। অর্থাৎ ঠিক আছে। তার সিঁথির দুপাশের আলগা চুল এবং কানের মাকড়ি দুলে উঠল। শিবনাথ জানে না সাহানা রাগিণীর

শাস্ত্রীয় রূপ ঠিক কেমন। কিন্তু সেটা যা-ই হোক, এই মেয়েটিকে 'সাহানা' বলে মনে হচ্ছে। নরম, শ্যামল, চকচকে গায়ের রঙ, তাতে কমলা আভা। এইরকম কৃশাঙ্গী। বিরহিণী তাই ক্ষীণা। প্রসাধনরহিতা। এমনি নম্র, শান্ত, বিষণ্ণ।

সে বলল, 'ঠাণ্ডাতে যদি সত্যিই কোনও ক্ষতি না হয় তো শুরু করুন। এই দেখুন, আমি কিন্তু আরম্ভ করছি।'

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ লস্যি পান করার পর শিবনাথ বলল—'কি যেন বলছিলেন?'

অপালা মুখ তেমনি নিচু করেই বলল—'আমি বিয়ে করতে চাই না, জেঠু, মা আমায় জোর করে...আপনি বলে পাঠান না যে আপনার পছন্দ হয়নি...।'

সামান্য তরল গলায় শিবনাথ বলল—'আমাকে আপনার পছন্দ হয়নি, সেটাই মুখ ফুটে বলতে পারছেন না, না কি?'

—'পছন্দের কথা নয়' অপালা আপাদমস্তক কমলা রং হয়ে বলল—'বিয়েটাই পছন্দ নয়। আমি এখন গান শিখতে চাই, গান করতে চাই।'

শিবনাথ বলল—'গান শুনবো বলেই তো আপনাকে ঘরে নিয়ে যেতে চাই। আর শুনতে হলে তো শিখতে দিতেই হবে। কী আশ্চর্য!'

—'কিন্তু আমি অন্য কর্তব্য করতে হয়তো পেরে উঠব না। গান আমার অনেকটা সময় নিয়ে নেয়।'

—'বাড়িতে কী কী করেন, একটু শুনি।'

—'পড়াশোনা করি। কলেজ যাই। ঘরটর একটু-আধটু গুছিয়ে দিই। মায়ের রান্নায় সামান্য, খুব সামান্য সাহায্য করি, রবিবার-রবিবার একটু জামা-কাপড় কাচাকুচি করতে হয়।'

—'বাস বাস। এর চেয়ে বেশি আপনাকে কখনও কিছু করতে হবে না। বাড়িতে আমার মা রয়েছেন। পিসিমা রান্নাঘরে আপনাকে ঢুকতে দেবেন কিনা সন্দেহ। ভীষণ শুচিবাই। বাবার দেখাশোনাও তাঁদের তদারকিতেই। আমার চাহিদা খুব সামান্য। আর আমার ছোট ভাই এখন এঞ্জিনিয়ারিং-এ সবে ঢুকেছে। বাড়িতে থাকেই না। দিদির তো দেখলেনই বিয়ে হয়ে গেছে। জামাইবাবু অসাধারণ গান-পাগলা। আপনার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হবেন তিনিই। অন দি আদার হ্যান্ড আপনি ভেবে দেখুন, আপনার জ্যাঠামশাই যেরকম কনজারভেটিভ দেখলুম তিনি আপনাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবেনই। সে জায়গায় আপনি অনুকূল পরিবেশ পেতে না-ও পারেন।'

অপালা এবার চোখ তুলে তাকাল। তার গালে এখনও কমলার ছোঁয়া। মা বলেছিল রাজপুত্তুরের মতো দেখতে, মিথ্যে বলেনি। অপালার হঠাৎ খুব সাহস বেড়ে গেল। কলেজের বন্ধু মনীষাকে সে যে কথা বলেছিল সেই কথাটাই সামনে-বসা সুন্দরকান্তি যুবকটিকে বলল—'আসলে আমি গান ছাড়া আর কিছুই তেমন করে মানে ভালোবাসতে পারি না।'

শিবনাথের মুখে চাপা হাসি খেলে গেল, সে চাপা গলায় বলল—'ভয় নেই। আমাকে কম ভালোবাসলে আমি কিছু মনে করব না।'

—'আপনি ছাড়াও আরও অনেকে থাকবেন...'

—'আপনাকে দেখে তো ঠিক নিষ্ঠুর প্রকৃতির মনে হচ্ছে না ?'

এবার অপালার হাসির পালা।

শিবনাথ বলল—'আমি আপনার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। যথাসম্ভব সামলাবার চেষ্টা করব।'

এই তন্বী শ্যামলা দীর্ঘকেশী মেয়েটি যখন তার লম্বা চোখ সামান্য খুলে তানপুরা হাতে মঞ্চের ওপর বসে থাকে, কণ্ঠ থেকে সুরের স্রোত ঝরতে থাকে তখন শিবনাথের ভেতরে এক ধরনের বি঳ব ঘটতে থাকে। সে সুরলোকের ফাংশন ছাড়াও অন্য আসরে এর গান শুনেছে। সুবলোকে দিদি জামাইবাবুকে সে-ই ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

বেয়ারা কিছু মিষ্টি এবং নোনতা খাবার এনে রাখল। অপালা বলল—'আমি আর কিছু খেতে পারব না। জোর করবেন না প্লিজ।'

শিবনাথ বলল—'এগুলো যে অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। একটু মুখে দিন। নইলে আমাকে বক রাক্ষস হতে হয়।'

অপালা বলল—'দাদা এসে গেলে বাঁচা যায়।'

—'আমার সঙ্গ কি আপনার খুব অসহ্য লাগছে ?'

—'না, না, তা নয়।' অপালা তাড়াতাড়ি বলল—'আমি আসলে খাবারগুলোর কথা ভেবে বলছিলুম।'

শিবনাথ বলল—'আপনাকে বলে রাখা দরকার—আমাদের বাড়িতে প্রকৃত সঙ্গীতানুরাগী বলতে আমি আর আমার জামাইবাবু, যিনি সেদিন আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলেন। উনি গান রীতিমতো বোঝেন। দিদিও ওঁর সঙ্গে থেকে থেকে ভালোই বোঝে এখন। মা বাবা পিসিমা এঁরা কিন্তু গান বলতে কীর্তন, রবীন্দ্রসঙ্গীত, ভক্তিমূলক, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, এইসব বোঝেন। লোকসঙ্গীতও তেমন অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন না। আর কোনটা ডি. এল. রায় কোনটা রজনীকান্ত তা বোঝবার ক্ষমতাও তাঁদের নেই। তবে গান শুনতে ভালোবাসেন। আমি শুনেছি আপনি স-বই গান। ওঁদের একটু এই জাতীয় গান দিয়ে খুশি করে দিলেই আপনার সঙ্গীতচর্চার পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে বলে আমার ধারণা। আমার ছোট ভাই বিশ্বনাথ হিন্দি ফিল্মি গান থেকে পাশ্চাত্য সঙ্গীত পর্যন্ত স-বই পছন্দ করে। গানটাকে কেরিয়ার করতে আপনার কোনও বাধা হবার কথা নয়। তবে মধ্যবিত্ত সংসারের নিয়মকানুন মেনে। সে তো আপনাকে এখনও মানতে হয়, হয় না ?'

অপালা মাথা নাড়ল।

'পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করবেন তো ?'

'সুযোগ পেলে তো নিশ্চয়ই। গ্র্যাজুয়েট না হলে জেঠু হার্টফেল করবেন।'

'আর আপনি নিজে ?'

অপালা একটু ভেবে বলল—'আমার নিজের খুব একটা এসে যায় না।'

শিবনাথ বলল—'আমার সম্বন্ধে আপনার কিছু জানবার নেই ?'

অপালা একটু লাজুক হেসে বলল—'আপনি তো সবই বলে দিয়েছেন।

'সে কি ? কী বললাম ?'

অপালা টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলল—'শুধু গান শুনে কাউকে পছন্দ করবার ব্যাপারটা আমার একটু অদ্ভুত অবাস্তব লেগেছে। গান তো কোনও কাজে লাগে না !'

শিবনাথ কি বলবে ভেবে পেল না। তার বলতে ইচ্ছে হচ্ছে—'গান আপনাকে ভীষণ সুন্দর করে, আমি সেই সৌন্দর্যে অভিভূত। শয়নে স্বপনে জাগরণে শুধু সেই তানপুরাবাদিনী সুকণ্ঠী মূর্তিই ভাসছে।' কিন্তু কথাগুলো সে বলতে পারল না। তার বদলে বলল—'জীবনটা তো শুধু কাজ নয় !'

'জীবনটা তাহলে কী ? আপনার কাছে ?'

অপালার মতো লাজুক, মুখচোরা মেয়ের কাছ থেকে হঠাৎ এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না শিবনাথ। সে বলল—'মুশকিলে ফেললেন। এক কথায় কি এমন শক্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় ? আর এখন এই মুহূর্তে আমি কি ঠিক করে ফেলতে পেরেছি জীবনটা আমার কাছে কী ? ঠিক আছে প্রশ্নটা আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আপনার কাছে জীবনটা কী ?'

অপালা শিবনাথের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল—'আমার কাছে তো জীবনটার অর্থ খুব সহজ। ধরুন ভৈঁরো থেকে ললিত, ললিত থেকে রামকেলী, রামকেলী থেকে পরজ, পরজ থেকে আলাহিয়া বিলাবল...' বলতে বলতে সে হেসে ফেলল।

শিবনাথও হাসছে।

এই সময়ে প্রদ্যোৎ এসে ঢুকল। দুজনের হাসি মুখের দিকে চেয়ে বলল—'বাঃ। দেখে যেন মনে হচ্ছে মিঞাবিবি রাজি ! এক্সপিডিশন তাহলে সাকসেসফুল। কংগ্র্যাচুলেশনস শিবনাথদা। কংগ্র্যাট্‌স্ অপাই !'

॥ ৭ ॥

জ্যাঠামশাই একটা গাড়ি ভাড়া করেছেন সারাদিনের জন্যে। শুভকর্মের আর মাসখানেক মতো বাকি। এর মধ্যে তিনি কনেকে একলা একলা রাস্তায় ছাড়তে চান না। ডিসেম্বর মাসে বিয়ে। শীত। জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতা দুষ্প্রাপ্যতা দুটিই হ্রাস পাবে। একটি মাত্র কন্যার বিবাহ দিতে হলে এমনি সময়ই প্রশস্ত। সবচেয়ে স্বস্তির কথা কন্যাটি কোনক্রমে হলেও বি.এ. অনার্সটা পার হয়ে গেছে। হতে পারে তাঁরা খুব নামজাদা বনেদি পরিবার নন—কি শিক্ষায়, কি অর্থ সামর্থ্যে। কিন্তু একটি ন্যূনতম মানদণ্ড তো আছে। সেই মানদণ্ডটি তিনি বজায় রাখতে চেষ্টা করেন। আর কিই বা আছে জীবনে ! নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নেই। কর্ম থেকে অবসর নিয়েছেন। ভাইয়ের স্ত্রীকে যথাসম্ভব দুধে-ভাতে রাখা, আর পরিবারের ঐতিহ্য তা সে যত সামান্যই হোক, সেটুকু বজায় রেখে খাওয়া—বাস, এই বই তো নয়। তিনি নিজে নিজের জন্য আর কতটুকু চান। ভোরবেলা একটু বেল-কলা, ইজিচেয়ারের ওপর পা তুলে রোজ গীতা এক অধ্যায়। একটু দুধ। খাওয়ার সময়ে একান্তে একটু বউমার সাহচর্য, পাঁচরকম কুটি-কুটি পদ দিয়ে একটু শাকান্ন। রাত্রে রুটির সঙ্গে একটু ভাজা, একটু মিষ্টান্ন, একটু ঘন দুধ, একটু নিশ্চিন্ত নিদ্রা, ছেলেটি ডাক্তারি পাশ

করে কোনও সরকারি হাসপাতালে জয়েন করুক, মেয়েটি সৎপাত্রস্থ হোক। এই তো তাঁর আশা, এইটুকুই তাঁর আকাঙ্ক্ষা।

অপালা মাস্টারমশায়ের বাড়িতে একাই ঢুকল। জেঠু অবশ্য নামতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এই গলি সম্পর্কে তাঁর ঘৃণা এবং ভীতির কথা মনে করে অপালা তার স্বভাববিরুদ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে জানাল দরকার নেই। তা ছাড়াও সে জানে এ মুহূর্তগুলো শুধু তার আর তার মাস্টারমশায়ের। সে তো শুধু বিয়ের নেমন্তন্ন করতে যাচ্ছে না! এ এক রকম শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা। এই পিতা-পুত্রীর অনুক্ত বেদনার মাঝখানে জেঠুর উপস্থিতি সইবে না।

নীচের তলায় অন্য দিনের মতো সারেঙ্গি বা হারমোনিয়ামের আওয়াজ শোনা গেল না। অপালা ঢুকে ডাকল—'মাস্টারমশাই!' কোনও সাড়া পেল না। এবার সে মিতুলের নাম ধরে ডাকতে লাগল—'মিতুল! মিতুল!' এবার দোতলার বারান্দায় মাস্টারমশাই বেরিয়ে এলেন। অচেনা গলায় বললেন—'কে?'

—'আমি অপু মাস্টারমশাই!'

—'অপু! অপু! নীচে কেন!' চটিতে চটাস চটাস শব্দ করে রামেশ্বর নীচে নামতে লাগলেন।

'না, মাস্টারমশাই ওপরে আর যাবো না,' ভারী হাতে হলুদ চিঠিটা সে মাস্টারমশাইয়ের দিকে এগিয়ে দিল। নিশ্বাস ফেলে মাস্টারমশাই বললেন—'এ এক হিসেবে ভালোই হল মা। ছেলেটি শুনছি সঙ্গীতপ্রিয়। সহানুভূতিশীল। সৌম্যদর্শন। সৌম্যদর্শন পুরুষ দরদী হয়। হয়ত তুমি আরও অনুকূল পরিবেশই পাবে। তোমাকে নিয়ে আমার একটাই ভয় মা।'

অপালা মাস্টারমশাইকে প্রণাম করে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। রামেশ্বর বললেন—'তুমি বড় দুর্বল মা, বড় অভিমানী, আজকের এই স্বার্থপর পৃথিবীতে কার অভিমান কে বুঝবে? তোমার মধ্যে অপার ঐশ্বর্য, শুধুমাত্র অসার অভিমানের জন্যে যদি নষ্ট করো...'

অপালা একটু চুপ করে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বলল—'মিতুল কোথায় মাস্টারমশাই! ওকে কিন্তু সকাল থেকেই যেতে হবে। রাতে থাকবে। গানবাজনা হবে...।'

—'যাবে তো নিশ্চয়ই তবে ওর একটা ছোটখাটো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, ওকে আপাতত ওর এক বন্ধুর বাড়িতে রেখেছি।'

—'সে কি? কী হল?'

'ও কিছু না। ঠিক হয়ে যাবে। এখনও তো দেরি আছে। অপুদির বিয়েতে মিতুল যাবে না, আনন্দ করবে না, তা-ও কি হয়? এর পর কোথায় যাবে?'

'এখান থেকে সোজা সোহমের বাড়ি। তারপর...'

মাস্টারমশাই অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন—'অপু সোহমের বাড়ি যেও না। সোহম অসুস্থ। অত্যন্ত অসুস্থ।'

—'সে কি? কী বলছেন, তবে তো আরও যাওয়া দরকার! জেঠুকে বরং বলব, বাকিগুলো উনি একাই সেরে নিন। আমি সোহমের কাছে একটু

থাকব।'

—'না, অপালা না। এ সাধারণ অসুস্থতা নয়। সোহমের মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। সাংঘাতিক ভায়োলেন্ট হয়ে গেছে। গত পরশু আমাদের বাড়িতে এসে একটা ছুরি দিয়ে মিতুলকে আক্রমণ করে। অশ্রাব্য গালাগাল দেয়। পাড়ার লোকে এসে না বলপ্রয়োগ করলে মিতুল হয় অন্ধ, নয় খুন হয়ে যেত। তারাই ওকে কোনক্রমে বাড়ি পৌঁছে দেয়। কিছুদিন থেকেই দেখছিলুম কিরকম বদমেজাজী, উগ্র, অস্থির হয়ে উঠছে। ছুরিটা ভাগ্যিস ভোঁতা ছিল!

অপালার চোখে আতঙ্ক। সে বড় বড় স্থির চোখে চেয়ে বলল—'কেন? কেন এমন হল মাস্টারমশাই?'

—'কিছুই বুঝতে পারছি না। মিতুলের ওপর তো ওর একটু বেশিই...'

অপালা বলল, 'সোহম আমার আপন ভাইয়ের মতো। ওর এরকম বিপদ। আমি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যেতে পারব না মাস্টারমশাই। আমাকে যেতে দিন।' তার গলায় কাতরতা।

রামেশ্বর বললেন—'চলো, তবে সে ক্ষেত্রে আমিও যাবো।' তিনি চটপট সদর দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

রামেশ্বরকে বেরোতে দেখে জেঠু কৃতাঞ্জলি হয়ে নেমে এলেন। তাঁর ভদ্রতায় কখনও কোনও ঘাটতি থাকে না। বললেন—'মাপ করবেন রামবাবু, আমি নামতে চেয়েছিলুম। আমার কন্যেটি বুড়ো জেঠুর বেতো হাঁটুর জন্যে বড্ড ভাবে তো...'

—'তাতে কী হয়েছে? রসময়বাবু, ওসব চিন্তাও করবেন না। আমাদের অতো ফর্মালিটি নেই। আমরা ভাবগ্রাহী।'

—'তা আপনিও কি অপুর বন্ধুদের বাড়ি যাবেন?'

—'হ্যাঁ, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, সোহমের সঙ্গে বিশেষ করে একটু দরকার ছিল। যান যখন রয়েইছে একটা।'

—'আপত্তি কি? আপত্তি কি? ছি ছি ছি। আসুন...' সাদরে দরজা খুলে দিলেন রসময়বাবু।

সোহমের বাড়িতেও জেঠুকে নামতে দৃঢ়ভাবে বারণ করল অপালা। জেঠুর নামবার কোনও কারণও নেই। তাঁর আসবার কারণও খুব ছিল না। কিন্তু প্রদ্যোৎকে পাওয়া যায়নি। বিয়ের মাসখানেক আগে কনেকে ভাড়া করা গাড়ির ড্রাইভারের ভরসায় ছেড়ে তিনি দেবেন না। তিনি বললেন—'বেশি দেরি করো না মা অপু।'

অপু মাস্টারমশাইয়ের চোখের দিকে চেয়ে বলল—'একটু দেরি হবে জেঠু। মাস্টারমশায়ের কি দরকার আছে বলছিলেন, না? ওঁকে আমরা নামিয়ে দিয়ে যাবো তো!'

এদিক থেকে সোহমের দক্ষিণের বারান্দা দেখা যায়। জানলাগুলো বন্ধ। অপালা আর মাস্টারমশাই ভেতরে ঢুকতেই বনমালী চাকর শশব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এল, পেছনে-পেছনে সোহমের রাশভারী বাবা। তাঁর মুখ থমথম করছে। এগিয়ে এসে বললেন—'আপনারা?'

—মাস্টারমশাই অপালাকে দেখিয়ে বললেন—'অপু মার বিয়ে। ও সোহমকে নেমন্তন্ন করতে এসেছে।'

—'আপনি তো জানেন রামেশ্বরবাবু সোহম এখন ঠিক নেমন্তন্ন নেবার অবস্থায় নেই।'

—'আমি নিষেধ করেছিলুম প্রতাপবাবু। কিন্তু সব শুনে অপু বলছে ও সোহমের সঙ্গে দেখা করবেই।'

—'হী ইজ আন্ডার সিডেশন। তবে কিছুক্ষণ হল ওর ঘোরটা ভেঙেছে। ও যদি অপালাকে আক্রমণ করে, আমি কী করবো ? একেই তো আপনার কাছে অপবাধী হয়ে আছি।'

অপালা বলল—'আমায় ও কিছু বলবে না কাকাবাবু। আমায় একবার যেতে দিন।'

—'কিন্তু ও খুব সম্ভব মেয়ে দেখলেই ক্ষেপে যাচ্ছে। ডু ইউ নো বামেশ্ববববাবু হী থ্রু এ পেপারওয়েট অ্যাট হিজ মাদার্স পোর্ট্রেট, কলিং হার নেমস !'

অপু আবারও বলল—'আমায় একবার, অন্তত একবার যেতে দিন কাকাবাবু।'

একটু ইতস্তত করে প্রতাপবাবু বললেন—'ঠিক আছে এসো। কিন্তু চিঠিটা ওকে দিও না। আমার হাতে দাও। আর রামবাবু আমার অনুবোধ আপনি যাবেন না।'

বনমালী এবং আরেকটি চাকরকে তিনি বললেন অপালাব সঙ্গে সঙ্গে যেতে। নিজেও ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সোহমের ঘরের জানালা সব বন্ধ। সময় বোঝা যায় না। কি একটা কেমিক্যাল সুগন্ধ ঘরে। সাবান হতে পারে, পাউডার হতে পারে, সেন্ট হতে পারে, কিন্তু অচেনা। সোহম বিছানার ওপর খালি গায়ে শুধু একটা পাজামা পরে বসে আছে। তাকে এভাবে খালি গায়ে এবং এমন অবিন্যস্ত কখনও দেখেনি অপালা। তাকে দেখলেই বোঝা যায় সে ঘোরের মধ্যে আছে। চোখগুলো লাল।

বনমালী বলল—'খোকাবাবু, কে এসেছে দেখো।'

লাল চোখ মেলে সোহম দেখল, জড়িয়ে জড়িয়ে বলল—'অপু ! তুই নয় শিওর। কিন্তু আমি জানি সামবডি আমাকে সিঁদুর খাইয়েছে। রক্ষাকালী পুজোর প্রসাদ বলে এক প্লেট কি ছাইভস্ম এনে দিলে। আসলে সিঁদুর, সিঁদুর ছিল তার মধ্যে।'

—'সিঁদুর ?' অপালা একটু এগিয়ে গিয়ে বলল—'সিঁদুর খেলে কি হবে ?'

—'ডোন্ট ইউ রিয়্যালাইজ ? সিঁদুরের মধ্যে মার্কারি থাকে, আরও কি কি থাকে কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে দেখতে হবে। ইট ইজ ব্যাড অ্যাজ ব্যাড ক্যান বি। কক্ষনো সিঁদুর পরিস না অপু। আর গলার পক্ষে ইট ইজ ডেডলি। ওরা আমার গলা নষ্ট করে দিতে চায়। আমি আর গাইতে পারবো না। গাইতে পারবো না।' সোহমের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

অপালা বলল—'কে তোকে এসব বাজে কথা বলেছে ? কোথায় কার

বাড়িতে কালীপুজোর প্রসাদ খেয়েছিলি ?'

—'দ্যাট দিলীপ সিনহা। সরোদিয়া। রামেশ্বর ঠাকুর। সৌম্য। স-ব। দীপালি। দ্যাট সাদিক হুসেন। ওর ওখানে কী দরকার রে ? ও অবধি ছিল। খালি তোকেই দেখলাম না। সবাই মিলে জোর করে আমায় বিষটা খাইয়ে দিল। দেখছিস না গলাটা কি রকম হোর্স লাগছে ?'

অপালা বলল—'তুই বোধহয় খুব চেঁচিয়েছিস সোহম। তাই গলাটা আপাতত ভেঙে গেছে। একটু চুপ করে থাক। কথা বলিস না। ওষুধ খা। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া কর। বিশ্রাম নে। ঠিক্ হয়ে যাবে।'

সোহম মাথা নাড়ল, যত জোরে সম্ভব—'খাওয়া-দাওয়া আমি আর করছি না। দেখছিস না, মাই ফাদার, ব্রাদার্স, সিসটার্স-ইন-ল, এমনকি দীজ হেল্পিং হ্যান্ডস্ এরা পর্যন্ত চায় না আমি গান করি। সব খাবাবের সঙ্গে একটু একটু সিঁদুর মিশিয়ে রেখেছে।'

বনমালী বলল—'সেই পরশু থেকে কিছু খাওয়াতে পারিনি অপু দিদিমণি। আমি, আমি নাকি ছোড়দাবাবুকে বিষ দেবো!' সে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে লাগল।'

সোহম বলল—'অপু তুই প্লিজ যাস না। সেভ মি, সেভ মি ফ্রম দীজ পিপল। ফর গড্স্ সেক অপু!'

অপালা বলল—'ঠিক আছে থাকব। কিন্তু তোকে খেতে হবে।'

আমি দিলে খাবি তো ?'

সোহম বলল—'প্লীজ ডু মি দ্যাট ফেভার। আই অ্যাম স্টার্ভিং।'

অপু বাইরে বেরোতে সোহমের বাবা বললেন —'ডাক্তার লিকুইড দিতে বলেছেন।'

একটু দুধ ওকে যদি খাওয়াতে পারো মা...'

এক গ্লাস ঠাণ্ডা দুধ তাতে ভ্যানিলা দেওয়া, সে সোহমের মুখের কাছে এনে ধরল। আস্তে আস্তে গ্লাসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল সোহম।

বলল—'কোথা থেকে আনলি ?'

অপালা বলল—'আমাদের বাড়ি থেকে। পাশে খাটাল আছে দেখিসনি, সদ্য দুয়ে দেয়!'

—'ঠাণ্ডা হল কী করে ? তোরা কি রিসেন্টলি ফ্রিজ কিনেছিস ?'

অপালা বিনা দ্বিধায় সঙ্গে সঙ্গে বলল—'হ্যাঁ।'

সোহম আস্তে আস্তে দুধটা খেয়ে নিল। তার বাবা বললেন—'ওষুধটাও ওকে খাইয়ে দাও অপালা।'

অপালার হাত থেকে ওষুধটা নিল সোহম, বলল—'ওষুধটা কিসের ? এমনিতেই আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি অফ দীজ ব্লাডি পিল্স্।'

অপালা বলল—'এই যে তুই খেতে পারছিস না। শরীরটা কেমন কেমন লাগছে। এগুলো ওষুধটা খেলে ঠিক হয়ে যাবে। তুই খেয়ে নে। আমিও এটা মাঝে মাঝে খাই।'

সোহম বড়িটা মুখে ফেলে দিল। তারপর বলল—'অপু আমার যদি খিদে

পায়। আমি কি খাবো? কে আমায় দেবে?'

অপালা বলল—'আমিই দেবো, আর কে দেবে! দাঁড়া আমি ব্যবস্থা করছি।'

বাইরে প্রতাপবাবু দাঁড়িয়ে, অপালা বলল—'ওকে আর কি খেতে দিতে বলেছেন ডাক্তার?'

প্রতাপবাবু বললেন—'একদম লিকুইড। তবে যতবার সম্ভব। লেবুর রস রয়েছে। ক্লিয়ার চিকেন সুপ রয়েছে।'

অপালা দুহাতে দু গ্লাস নিয়ে ফিরে এলো। সোহমের বেডসাইড টেবিলে দুটি গ্লাস ঢাকা দিয়ে রাখল। বলল—'এই আমি তোর মুসাম্বির রস করে দিয়ে গেলাম, আর এই গ্লাসটাতে চিকেন সুপ রাখলাম, আমি নিজের হাতে করেছি। তোর যখন খিদে পাবে, যেটা যখন ইচ্ছে, খেয়ে নিস। কেউ তোর ঘরে ঢুকবে না, আমি বারণ করে দিয়ে যাচ্ছি। আর বিকেলে আমি দাদাকে পাঠিয়ে দেবো। দাদার হাতে খাবার পাঠিয়ে দেবো। খাবি তো?'

—'শিওর!' খুব জড়ানো গলায় বলল সোহম। সে শুয়ে পড়েছে। তার চোখ বুজে আসছে।

অপালা বাইরে বেরিয়ে এলো। প্রতাপবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। সেই জলদগম্ভীর চাল, রাশভারী ভাব কিছুই যেন আর নেই। ছোট ছেলের মতো অপালার হাত ধরে কেঁদে ফেললেন, বললেন—'দুদিন পরে ও কিছু খেল মা। তুমি পারলে আবার এসো। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেবো। পৌঁছেও দেবো। ওর মায়ের মৃত্যুর পর এ বাড়িতে, বা আমার জীবনে এত বড় বিপদ আর কখনও হয়নি।'

অপালা বলল—'বিকেলে দাদাকে পাঠিয়ে দেবো। দাদা মেডিক্যাল কলেজে, ফাইন্যাল ইয়ার এখন। আপনারা ওকে খুব ভালো ডাক্তার দেখাচ্ছেন। জানি। কিন্তু দাদাকে ও বিশ্বাস করবে বেশি।'

অপালা তাড়াতাড়ি সিঁড়ি নেমে মাস্টারমশায়ের কাছে এলো। তিনি এতক্ষণ ধরে উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ তাঁকে বসবার একটা চেয়ার দিতেও ভুলে গেছে।

প্রতাপবাবু বললেন—'কিছু মনে করবেন না রামেশ্বরবাবু। আপনি দেবতুল্য মানুষ। কিন্তু গান বাজনার লাইন বড় খারাপ। যতরকম কুৎসিত প্রবৃত্তির রাজত্ব। ছেলেটার ক্ষমতা ছিল। পারিবারিক ট্র্যাডিশন ভেঙে গান করতে চাইল। আই হ্যাড মাই মিসগিভিংস্। এখন দেখছি আই ওয়জ রাইট। ভুল করেছি।'

রামেশ্বর ঠাকুর কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। প্রতাপবাবু বললেন—'আপনার মেয়ে এখন কেমন আছে? ওর চিকিৎসার খরচ সমস্ত আমার। প্ল্যাস্টিক সার্জারি করাতে হলে তাই হবে। বিন্দুমাত্র ভাববেন না।'

রামেশ্বর নম্র প্রায় আর্দ্র স্বরে বললেন—'প্রতাপবাবু, খরচ খর্চার কথা আপনাকে ভাবতে হবে না। তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি। সোহম আমার নিজের সন্তানের মতো, এই অপু যেমন। সে সেরে উঠলেই এখন আমি নিশ্চিন্ত হই।'

রাত ন'টা নাগাদ প্রদ্যোৎ যখন ফিরে এলো তখন এক ভয়াবহ্ গল্প শুনল অপালা। দিন তিনেক আগে সোহম নাকি কোথা থেকে ফিরে গুম হয়ে থাকে, ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করেনি ; দাদারা দু একবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ভালো করে জবাব দেয়নি। ভোরবেলায় ওর ঘর থেকে আওয়াজ পেয়ে সবাই ছুটে গিয়ে দেখে ভারী পাথরের পেপার ওয়েট ছুঁড়ে সে তার মায়ের ছবিখানা ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। মুখে তার মৃত মাকে লক্ষ্য করে অশ্রাব্য খিস্তি। বড়দা রেগে-মেগে তাকে থামাতে গেলে সে তাঁকেও একটা ফুলদানি ছুঁড়ে মারে। এছাড়াও টি ভি ট্রানজিস্টার রেডিও সেট, ওয়াল ডেকোরেশন ঘরের মধ্যে যা-যা ছিল সব ভেঙে ছত্রখান করে। তার চেহারা তখন উন্মাদের মতো। মনে হল কাউকে চিনতে পারছে না। লোক্যাল ডাক্তার ঘুমের ওষুধ ইনজেকশন দিয়েছিলেন, কড়া ডোজে। কিন্তু রাতের দিকে কখন সে উঠেছে কেউ জানে না। রামেশ্বরের বাড়ি গেছে এবং সেখানে কোথা থেকে একটা ভোঁতা ছুরি নিয়ে মিতুলকে আক্রমণ করেছে। অনেক কষ্টে রামেশ্বর এবং পাড়ার কিছু লোকে তাকে ধরাশায়ী করে, বেঁধে ছেঁদে। কোনক্রমে বাড়ি দিয়ে যায়, সবসময়ে তাকে ঘুমের ওষুধ ইনজেকশন দিয়ে যাচ্ছেন ডাক্তার। মিতুলের কপালে গালে বুকে বেশ ভালো মতো লেগেছে। কপালের আঘাতটা চোখ ঘেঁসে বেরিয়ে গেছে। প্রদ্যোৎ খুব চিন্তিত, গম্ভীর। বলল—'অপু ভাবিসনি। আমি বিদ্যুৎদাকে নিয়ে গিয়েছিলুম। উনি বলছেন প্যারানয়েড বলে মনে হলেও আসলে এটা খুব সম্ভব একটা সাময়িক নার্ভাস ব্রেক-ডাউন। এর কারণটা ইমিডিয়েটলি খুঁজে বার করতে হবে। হঠাৎ ও একটা দারুণ শক পেয়েছে। আচ্ছা অপু, ছেলেটা তো তোরই মতো গান-পাগলা, যতবার আমাদের বাড়ি এসেছে দেখেছি সুর ভাঁজতে ভাঁজতে দুটো তিনটে সিঁড়ি একসঙ্গে টপকাতে টপকাতে হয় ওপরে উঠছে নয় নীচে নামছে, আর মা কিছু খেতে দিলেই বলছে—"কি করেছেন এটা মাসিমা, ফাস কেলাস।" তা এমনি মানুষ হিসেবে কিরকম বল তো!'

—'আমি তো যতদূর জানি, বাড়ির খুব আদরের, বুদ্ধিমান, কিন্তু সরল খুব, হিংসে টিংসের বাষ্পও ওর মধ্যে নেই, সহজেই সব কিছু বিশ্বাস করে নেয়।

মিতুলের প্রতি ওর দুর্বলতার কথাটা দাদাকে এক্ষুনি বলবে কিনা ঠিক করতে পারল না, অপালা। কোনও কোনও গোপন কথা জানা থাকলেও তার গোপনতা রক্ষা করা পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করে সে। যদি দাদা কিছু প্রশ্ন করে নিশ্চয়ই বলবে। সোহমকে পুরোপুরি ভালো করে তোলার জন্যে যদি প্রয়োজন হয় নিশ্চয়ই প্রকাশ করতে হবে।

প্রদ্যোৎ ততক্ষণে বলছে—'দেয়ার ইউ আর। ছেলেটা বলছিস সরল আর গালিব্‌ল্। এটা একটা ইমপর্ট্যান্ট ক্লু। ও যে বলছে রক্ষাকালী পুজোর প্রসাদ খেয়েছে এবং সেখানেই ওকে কেউ কিছু মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছে এটা সম্পূর্ণই ওর কপোল কল্পনা, তোর মাস্টারমশায়ের সঙ্গে কথা বলে এলাম আমি। দিলীপ সিংঘি না কি এক ছাত্র আছে ওঁর, তার বাড়িতে রক্ষাকালীপুজো হয়। সারা রাত নাকি কালী কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত হয়, তাতে রামবাবু, মিতুল এরা যায়, গান-টান করে, কিন্তু সোহম সেখানে প্রসাদ খাবে কি। কখনও যায়নি, তার

নেমন্তন্নই হয় না।'

অপালর ঠোঁট কাঁপছে। বলল—'দাদা, আমার ভীষণ ভয় করছে। একে তো বিয়েটা আমার একেবারেই করতে ইচ্ছে করছে না, তারপরে গোড়াতেই এরকম একটা অশুভ ঘটনা।'

প্রদ্যোৎ বলল—'এই জন্যে তোদের ওপর রাগ ধরে। তোর বিয়ের সঙ্গে সোহমের অসুখের কী সম্পর্ক ? তোদের মধ্যে কি লভ-অ্যাফেয়ার-টার আছে নাকি ? সোহম তোর বিয়ের কথা শুনতে পেয়ে উন্মাদ হয়ে গেছে ?'

অপালা প্রদ্যোতের বলার ধরনে হেসে ফেলল, বলল—'চড় খাবি। ঘটনাটা তো অশুভ। এটা তো মানবি! গানের লোকেরা খুব সুপারস্টিশাস হয় জানিস তো ? তাছাড়া সোহমের চিন্তা মাথায় নিয়ে বিয়ে করতে আমার খুব খারাপ লাগবে।' তার মাথার মধ্যে ঘুরছিল সোহমের সেই জড়ানো গলার সাবধানবাণী 'সিঁদুর খুব খারাপ জিনিস, কক্ষনো সিঁদুর পরিসনি, অপু।' কিন্তু একথাটা দাদাকে বলা যায় না।

প্রদ্যোৎ বলল—'বিদ্যুৎদা বলছেন কয়েক মাসের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। তুই ঘাবড়াস না।'

অনেক রাত্তিরে দীপালি এলো। ন'টা বেজে গেছে। জেঠু খেয়ে উঠেছেন। মা জেঠুর থালা বাটি নিয়ে নীচে নামছেন, প্রদ্যোৎ বোধহয় মোড়ের দোকানে সিগারেট কিনতে গেছে, দরজাটা খোলা রেখে গেছে। তিনি দেখলেন খোলা দরজার এক পাট ভেজিয়ে দীপালি দাঁড়িয়ে আছে। তিনি একেবারে অবাক। দীপালির আসা-যাওয়ার অবশ্য অবাধ স্বাধীনতা। কিন্তু তাঁদের বাড়ির রসময়বাবু-শাসিত পটভূমিতে রাত্তির ন'টায় কোনও মেয়ের বন্ধুর বাড়ি ঢোকার কথা তিনি কল্পনা করতে পারেন না। দীপালি কেমন একরকম গলায় বলল—'মাসিমা, আমি আজ অপুর কাছে থাকব। অসুবিধে হবে না তো ? ও তো আর কদিন পরই শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে।'

এতক্ষণে সুজাতা নিশ্চিন্ত হলেন—'নিশ্চয়। নিশ্চয়। বাড়িতে বলে এসেছো তো! নিশ্চয় থাকবে। অসুবিধে কি! এসো আমি ওদের খেতে দিচ্ছি, তুমিও বসবে এসো।'

দীপালি বলল—'আমি খেয়ে এসেছি মাসিমা। ব্যস্ত হবেন না। আমি ছাতের ঘরে যাচ্ছি।'

অপালা তার গলার সাড়া পেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। দীপালি বলল—'অপু খেয়ে ওপরে আয়।' তার গলা কাঁপছিল। সুজাতা রান্নাঘরের দিকে চলে গেছেন। অপালা টের পেল শেষ কথাটা প্রদ্যোৎও শুনতে পেয়েছে। সে এখন সদর দরজা বন্ধ করছে। দীপালির গলার কাঁপুনিতে অবাক হয়ে সে বোনের সঙ্গে চোখাচোখি করল।

কোনরকমে খেয়ে নিয়ে অপালা ছুটল ওপরে, দেখল দীপালি দু হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে থরথর করে কাঁপছে। 'কী হয়েছে দীপুদি ? কী হয়েছে ?'

—'সোহমের খবর শুনেছিস ?'

—শুনেছি। গিয়েছিলাম।'

—'ও যদি আমাকে খুন করতে আসে ? এইরকম রাতেই ও মিতুলকে খুন

করতে গিয়েছিল। মিতুল এখন হসপিট্যালে জানিস তো ? চোখের ওপর, গালে, বুকের মাঝখানে লেগেছে। কে জানে ডিসফিগার্ড হয়ে গেল কিনা মেয়েটা !'

—'তোকে কেন খুন করতে যাবে ?'

—'আরে পাগলদের কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। আসলে মানে মিতুলের কথাটা তো আমিই ওকে বলি।'

—'মিতুলের কথা ! কী কথা !'

—'মিতুলের মা যে মাস্টারমশায়ের এক ছাত্রর সঙ্গে পালিয়ে যান—ইন ফ্যাক্ট্ উনি যে মাস্টারমশায়েরও গুরুপত্নী, মাস্টারমশাই ভাগিয়ে এনেছিলেন, মিতুল ওই স্ত্রীরই মেয়ে। এসব তো আমিই...'

—'এসব তুই বলছিস কি দীপুদি ? কোথা থেকে শুনলি ? যত গুজব ?'

—'গুজব নয়। আমি জানি। আগেকার লোকেরা অনেকেই জানে। আলোচনা করে না।'

—'কই আমি তো জানি না !'

—'তোর কথা আলাদা। স্ট্রিক্ট্ ডিসিপ্লিনে থাকিস। গান শিখিস, বাড়ি চলে আসিস। আমরা গান বাজনার জগতে ছোট থেকে ঘুরি-ফিরি। অনেক কথাই জানি। দিলীপ সিন্‌হা ওই যে রে সরোদ বাজায় ওর সঙ্গে মিতুলের ঘনিষ্ঠতার কথাও আমিই সোহমকে বলেছি।'

—'ঘনিষ্ঠতা ? কতজনের সঙ্গে তো মিতুলের ভাব ! একটা ছোট মেয়ে। মা নেই ! কেন এসব বলতে গেলি ! তুই জানতিস না ! আমি যে সেদিন বললাম !'

—'তার আগে ! আরে এমনি গল্প করতে করতে বলেছি, আমি তো ঘৃণাক্ষরেও জানি না মিতুলের ওপর অত ঝোঁক ! আর যতই বল ওদের কত বড় ফ্যামিলি। ওরা কি কখনও মিতুলের সঙ্গে ওর বিয়ে দিত !'

—'বিয়ে দিত কি না দিত সেসব পরের কথা। দীপুদি তুই খুব অন্যায় করেছিস। আমি চিন্তাই করতে পারছি না এই কথাগুলো তুই একটা ছেলের সঙ্গে আলোচনা করলি কি করে !'

দীপালি বলল—'যা হয়ে গেছে, গেছে। আমি একটা ভুল করে ফেলেছি। তুই আমাকে বাঁচা অপু। সোহম আমাকে খুন করবেই।'

অপালা বলল—'সোহম, হয়ত তোর এসব কথাতেই ওরকম অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাতে তোর কোনও দুঃখ নেই দীপুদি। এই যে সেদিন বলছিলি সোহমকে তুই ভালোবাসিস।'

—'উন্মাদ। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে ও। নিশ্চয় ভেতরে টেনডেনসি ছিল। নইলে এতো সহজে কেউ এমনি খুনোখুনি করে না। আমাকে ও শেষ করে দেবে। তোর কাছে আমায় রাখ।'

—'ঠিক আছে। তুই থাক না এখানে। তবে সোহমের এখন তোর উপর হামলা করবার কোনও সম্ভাবনাই নেই। ওকে স্ট্রং ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। অবস্থা আরও জটিল হলে নার্সিং হোমে রাখা হবে।... আয় দীপুদি আমরা দুজনে মিলে শুধ্ কল্যাণ গাই।'

দীপালি বলল—'তোর এখন গান আসছে ? তুই গা ভাই ! ভয়ে আমার হাতা পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে ।'

অপালার হঠাৎ মনে পড়ল, সে বলল—'কি সিঁদুর সিঁদুর করছে রে ! সিঁদুর খাওয়ালে নাকি গলা নষ্ট হয়ে যায় । এ সব কথাও তুই-ই ওকে বলেছিলি না কি ?'

দীপালির মুখ ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেছে। সে সবেগে মাথা নেড়ে বলল—'না, না, মোটেই না ।'

অপালার এখন মন অনেক শান্ত হয়ে গেছে। সে তার মাস্টারমশাই প্রদত্ত তানপুরো তুলে নিল। রাত যত গভীর হয়, তার গানও ততই গভীরে চলে যায় !' 'মন্দরবা বাজো রে' শুধু 'বাজো রে' দিয়েই সে সুরের সমুদ্র তৈরি করে, বেশি তানের মধ্যে লয়কারির মধ্যে যায় না। শুধু ভাব। ভাব থেকে অনুভব, 'আনন্দ রহো' বলে সে যখন গলা তোলে তারপর টুকরো টুকরো কাজ দিয়ে নেমে আসে, চম্পকের তীব্র মধুর সুবাসের মতো ছড়িয়ে পড়ে কল্যাণের স্বরাবরোহণ। সুর যখন তার নাড়িতে নাড়িতে এমনি করে প্রবেশ করে যায় তখন সুখ-দুঃখ থাকে না, ভাবনা-চিন্তা কিচ্ছু না, তার মনে হয় সে এক প্রবল পরাক্রান্ত কিন্তু অপরিসীম প্রেমী পুরুষকে অনুসরণ করে চলেছে। কী মাধুর্য, কী ধৈর্য, কী মহিমা এই অনুসরণে। অনুসরণের পথটি সোজা নয়। কখনও আঁকাবাঁকা, কখনও ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া, আবার কখনও হে বিরাট নদী—বিশাল রাজপথসদৃশ রাস্তা। তার দুধারে অলৌকিক সৌন্দর্যের সম্ভার। প্রত্যেকটি বাঁকে বিস্ময়ের উপচার নিয়ে অপেক্ষা করছে অদৃশ্য গন্ধর্বরা। অবশেষে মোহনার মতো এক সুরবিস্তারে তার কল্যাণের বিলম্বিত গানটি সুরসমুদ্রের মৌলিক স্রোতে মিশে যায়। সে আবিষ্ট হয়ে যায়। সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে, ঘরটা যেন একটা সুরমণ্ডল। বেজেই চলেছে বেজেই চলেছে, ছাতটা সুরের সেই ত্রিসপ্তক বিস্তৃত আদি মহাসাগর, যেদিকে সে তার অভিসার শুরু করেছিল। দীপালি অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। সটান। শিথিল। তার মাথাটা বালিশের এক দিকে কাত হয়ে পড়েছে। ভয়ের কুঞ্চনগুলো আর নেই। তার মুখে নিষ্পাপ শিশুর আত্মসমর্পণের সরলতা।

অপালা তার তানপুরো পেরেকে ঝুলিয়ে রেখে, তুম্বিটার তলায় একটা ছোট টুল গুঁজে দিল। দীপালির পাশে দাদার বালিশে মাথা দিয়ে সে সিগারেট মিশ্রিত একটা পুরুষ-গন্ধ পেতে লাগল, যেটা তার ঘুমের ব্যাঘাত করতে লাগল কিছুক্ষণ। তারপর ঝরকে ঝরকে ঘুম আসতে লাগল। আনন্দময়, কিন্তু অপ্রগাঢ় নিদ্রা। মধ্যরাতে নাকি ভোরের দিকে অপালা জানে না সে ছাড়া ছাড়া দুটো স্বপ্ন দেখল, সে যেন আকুল আগ্রহে কোনও প্রেমিকের দিকে ছুটে চলেছে। তাকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তার কেমন একটা ধারণা আছে সে অবর্ণনীয়। সে রূপ বড় বড় শিল্পীদের ছবিতে আভাসিত হয় মাত্র। দারুণ সুগন্ধও সে। নিজেকে অপালা এমনকি শারীরিক ভাবেও ধরে রাখতে পারছে না। ওই পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে না পারলে যেন তার নির্মল শুচি সুরময় নারীত্ব মূল্যহীন অর্থহীন হয়ে যাবে। এমনই তার আকুলতা। এসব জিনিস অপালা জেগে জেগে সজ্ঞানে কখনও অনুভব করে না। সেই সঙ্গে সে বুঝতে

পারছে তার পেছনেও ছুটে আসছে আর এক জন পুরুষ। দ্বিতীয়জনকে এড়াবার জন্য সে এঁকেবেঁকে ছুটছে। গান্ধার থেকে সোজা পঞ্চমে না গিয়ে সে রেখাবে ফিরে এলো। তারপর উঠে গেল ধৈবতে, ধৈবত থেকে বক্রভাবে পঞ্চমকে ছুঁয়েই উঠে গেল মধ্য সপ্তকের নিষাদে। এমনি করে সারা রাত সে স্বরের চড়াই উৎরাই ভেঙে আকুল হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল কার কাছ থেকে পালিয়ে, কার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। সে জানে না এরা কারা। ঘুম ভাঙলো দুর্লভ চোখের জলে। বাগেশ্রী, বেহাগ গাইতে গিয়ে এমনিই তার চোখে জল এসে যায়, কেদারার পকড় ধরবার সময়ে ছলছল করে ওঠে চোখ।

চিলেকোঠার ঘরটা এই সময়ে খুব সুন্দর। এতো সুগন্ধ। শীতল। নভেম্বরের গোড়া, অথচ শীত বলতে কিছু নেই। হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে জানলা দিয়ে, তাইতেই শীত-শীত করছে। সে দীপালির গায়ে চাদর টেনে দিল। কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই দীপালি সে চাদর পায়ের ধাক্কায় ধাক্কায় তলার দিকে পাঠিয়ে দিল আবার। সম্ভবত ওর গ্রীষ্মবোধ বেশি। হাওয়ায় তানপুরোর তারগুলো টুং টাং করে উঠল। দীপালি নিভাঁজ, ছেদহীন ঘুম ঘুমোচ্ছে। নিশ্চয় বেশ কয়েকদিন পরে। অপালা আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল। এবারেও একটা স্বপ্ন দেখল। এটা অনেক স্পষ্ট। সে যেন এক জমিদারের জলসাঘরে গান গাইছে। সে নয়। নাজনীন বেগম। কখনও সে নাজনীনকে দেখছে, তাঁর কানবালা, হীরের নাকছাবি, এবং জরিদার বেনারসী শাড়ি সমেত, যেমন রেকর্ডের ছবিতে আছে, কিন্তু সে এও বুঝতে পারছে সে নিজেই নাজনীন। চারপাশে কিছু গম্বুজ। শ্রোতা মাত্র একজনই। তাঁকে দেখতে অনেকটা রামেশ্বর ঠাকুরজীর মতো। কিন্তু তার চেতনা বলছে এটা সোহম। সোহম তার গান শুনছে। কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। শুধু দুজনেরই চোখ দিয়ে অবিরল জল পড়ছে। তারপর এক সময়ে সোহম শুয়ে পড়ল। সটান। অপালার পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গ প্রণামের ভঙ্গিতে। আস্তে আস্তে তার শরীর নিস্পন্দ হয়ে এলো। সে কি ঘুমন্ত না মৃত বোঝা গেল না। কিন্তু কে যেন বলল—'সো যা বেটি, সো যা,' অপালা দেখল সোহম তো নয় দীপালি ঘুমোচ্ছে। দীপালি না মিতুল ঘুমের ঘোরে সে একেবোরই ঠিক করতে পারছে না।

ভোরের প্রথম আলো তির্যকভাবে অপালার ঠিক ডান চোখের ওপর পড়ল। অর্থাৎ এমনিভাবে এই আলো দাদার চোখেও পড়ে। দাদা নিশ্চয়ই পাশ ফিরে শোয়। সে একটুখানি শুয়ে রইল দীপালি ওঠে কি না দেখতে। না, দীপালি এখনও ঠিক সেইভাবে ঘুমিয়ে যাচ্ছে। কে জানে কতদিন ভালো করে ঘুমোয়নি। ব্যথায়, উৎকণ্ঠায়, শেষ পর্যন্ত ভয়ে। সে ছাতে বেরিয়ে এলো। আস্তে আস্তে চুল খুলতে খুলতে। এই সময়টা সাধারণত সে মুখ ধুয়ে রেওয়াজে বসে। ছাতের ওপর একটা মোটা কম্বল তার ওপর মায়ের বিয়ের গালচে পেতে। এরও আগে বসে যায়। কিন্তু আজকে মনের মধ্যে অনেক ভাবনা ঘোরাফেরা করছে। স্বপ্নগুলো তার স্পষ্ট মনে আছে। হঠাৎ অপালা একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে এলো।

সে তরতর করে নীচে নেমে গেল। মায়ের ঘরে দাদা ঘুমোচ্ছে। মা পাশ

থেকে উঠে গেছে। অপালা দাদাকে ঠেলতে লাগল—'দাদা। দাদা।' প্রদ্যোৎ একটুখানি চোখ খুলে তাকে দেখল। বিয়ের ঠিক হওয়ার পর থেকে সে বোনের মধ্যে আলাদা একটা ব্যক্তিত্ব দেখতে পাচ্ছে, মমতাও তার বেড়ে গেছে অনেক বেশি। সে পুরোপুরি চোখ খুলতে অপালা বলল—'একবার ছাতে আসবি। কথা বলিস না। চুপ।'

প্রদ্যোৎ তার স্বভাবসিদ্ধ একটা মিথ্যা বিরক্তির ভান করে জামাটা গলিয়ে নিয়ে ছাতে উঠে এলো। চিলেকোঠার খোলা দরজা দিয়ে সে দাদাকে বলল —'দ্যাখ। দ্যাখ্ না।'

—'কী দেখব?'

দীপালি ঘুমোচ্ছে। পোশাক বদলানো হয়নি। পুরোপুরি পোশাক পরে সে ঘুমোচ্ছে। ঠোঁটের লিপস্টিক প্রায় মুছে গিয়ে ঠোঁট দুটিকে বাসি গোলাপের পাপড়ির মতো বিষণ্ণ করে রেখেছে। তার ফর্সা রঙ, সারা রাতের গাঢ় ঘুমের পর এখন সতেজ, সে সবসময়ে কাজল পরে থাকে। বোজা চোখ, কাজলের রেখাতে শুধু চোখের আকার দেখা যায়। বেণীটা তার বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে বুকের ওপর এসে পড়েছে এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসের তালে তালে —উঠছে নামছে।

এই পর্যন্ত দেখে প্রদ্যোৎ বলল— 'এটা কী করছিস অপু? ঘুমোচ্ছে ও। ওকে এভাবে চুপিচুপি দেখাতে ডেকেছিস আমাকে! তুই তো এতো অসভ্য ছিলি না আগে?'

অপালা বলল— 'দাদা, তুই আগে বল দীপুদি সুন্দর কিনা।'

প্রদ্যোৎ বলল, 'দ্যাট ডিপেন্ডস্।'

—'জবাব এড়াবার জন্যে ইংরিজি বলবি না খবর্দার। বল্ অন্তত আমার থেকে তো অনেক সুন্দর। বল্ বল্ না রে।'

—'আমি জানি না। তোর চেয়ে ফর্সা, এই পর্যন্ত। এর চেয়ে বেশি আমি বুঝি না। এর মানে কি অপু?'

—'আচ্ছা দাদা, দীপুদি আমারই মতো গান জানে। আমার চেয়ে ভালো গায় এক হিসেবে কারণ আধুনিক, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান এসবে ও একেবারে সিদ্ধ। রেডিওতে গায়। জলসায় গায়।'

—'তো কি?'

—আচ্ছা শিবনাথবাবুকে ওকে দেখিয়ে প্রোপোজ করা যায় না, উনি আমার বদলে দীপালিকে বিয়ে করুন। গান ভালোবাসেন, দারুণ গান-জানা বউ পাবেন, সুন্দরী বউ পাবেন। প্লাস ও অত্যন্ত গৃহকর্মনিপুণা, ওদের বাড়িতে কী লক্ষ্মীশ্রী তুই ধারণা করতে পারবি না। ভীষণ গুণী ওরা পাঁচ বোনেই। তার মধ্যে দীপুদি আবার বোধহয় সবচেয়ে সুন্দর। ও বিয়ে করতেও খুব ইচ্ছুক। মাসিমা খুব পাত্র খুঁজছেন।'

প্রদ্যোৎ চোখ বড় বড় করে বলল— 'অপু, তুই কি পাগল? বিয়ের আর এক মাসেরও কম বাকি আছে। এখন আমি পাত্রী-বদলের দরবার করব? দীপালি রাজি হবে কেন? শিবনাথদার বাড়ি থেকেই বা রাজি হবে কেন?'

—'দীপুদিকে রাজি করার ভার আমার। আর ওদের বাড়ি থেকে নিশ্চয়

রাজি হবে। দীপুদি কত ফর্সা দেখছিস না ?'

প্রদ্যোৎ বলল— 'অপু তুই যে কী ছেলেমানুষ, কোন ইউটোপিয়ায় যে বাস করিস! গান তো একটা আর্ট, দিবারাত্র তা চর্চা করেও তোর অনুভূতিই বা এতো ভোঁতা হয় কি করে আমি জানি না। ডোন্ট ইউ রিয়্যালাইজ দ্যাট শিবনাথদা ইজ ইন লভ্ উইথ ইউ ? কালো-ফর্সা ও সব কোনও ব্যপারই নয়। ইট ইজ নট এ সিম্পল কেস অফ ম্যাট্রিমোনিয়াল সিলেকশন।'

অপালা একদম চুপ করে গেল। দাদা তখনও বলে চলেছে— 'লভ্ ইজ নট সো ইজিলি অ্যাভেলেবল্ অপু। আমি বুঝতে পারছি তোর দিক থেকে কোনও রেসপন্স নেই। কিন্তু সেটা ক্রমে ক্রমে আসবে। আসতে বাধ্য। দ্যাট শিবনাথ দত্তগুপ্ত হ্যাজ ডেপ্থ্ অফ ক্যারেকটার। তা ছাড়াও দীপালিরা তো মিশ্র, ব্রাহ্মণ, হঠাৎ এই ধরনের অসবর্ণ বিয়ের প্রস্তাবে ওরা কান দেবে কেন ? ওরাও তো জেঠুর মতোই গোঁড়া। তোর কি কালো-টালো বলেছে বলে ভয় করছে ? রাগ-টাগ হয়েছে ?'

অপালা কিছুই বলল না। আসলে পরিকল্পনাটা মাথায় আসার পর সে মুক্তির আনন্দে আকাশে সাঁতার দিচ্ছিল। দাদা তাকে বাস্তবের মাটিতে আছড়ে ফেলে দিল। যা তার কাছে এতো সহজ এতো সুন্দর সমাধান মনে হচ্ছে তা কেন অন্যের কাছে এতো অসম্ভব মনে হয় ? সে বিয়ে করতে চায় না, অথচ তাকে এরা জোর করে বিয়ের পিঁড়িতে বসাবেই। দীপুদি বিয়ে করতে চায়, এক্ষুনি হলে এক্ষুনি, অত যোগ্যতা, অত রূপগুণ থাকা সত্ত্বেও তার বিয়ে হবে না, হচ্ছে না।

সে বলল— 'আমার জন্যে একটা কাজ করবি ?'

—'কি ? তোর জন্যে তো একটার পর একটা কাজ করে যাচ্ছি ?'

—'আমি কদিন রোজ সোহমের বাড়ি যাবো। আমার ধারণা গান শুনলে ও ঠিক হয়ে যাবে। অন্তত আমার গান। বিয়ের আগের দিন পর্যন্ত।'

—'সর্বনাশ! তুই কি সোহমকে ভালোবাসিস নাকি ?'

—'নিশ্চয়! আমি সোহমকে দারুণ ভালোবাসি। এতো ভালোবাসি আগে জানতুম না।'

—'তাহলে তো ব্যাপারটা খুব কমপ্লিকেটেড হয়ে গেল রে অপু!'

—'না দাদা। তুই যা ভাবছিস, ঠিক তা নয়। সোহমকে আমি বন্ধুর মতো, এক পথের পথিকের মতো করে বোধহয় ভালোবাসি। কিন্তু ওকে ভালো করবার জন্যে যেটুকু আমার করা দরকার, সেটুকু আমায় করতে হবেই।'

প্রদ্যোৎ বলল— 'অপু, তুই আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছিস। তুই অবশ্য বরাবরই ভেতরে ভেতরে জেদী ছিলি। কিন্তু যা করবার চুপচাপ করতিস। খুব বেশি নিয়ম ভাঙতিস না। এখন তো দেখছি তুই মরিয়া হয়ে গেছিস। কোত্থেকে তোর এই চেঞ্জটা এলো ?'

অপালা বিষণ্ণ হেসে বলল— 'তোরা কি ভেবেছিলি তোরা একটার পর একটা নিজেদের গড়া সিদ্ধান্ত আমার উপর চাপিয়ে দিবি। এমন কি একজন সম্পূর্ণ বাইরের ভদ্রলোকের ইচ্ছেটাকেও আমার ওপর জবরদস্তি করে চাপিয়ে দেওয়া হবে। তবু আমি বড় হবো না ?'

প্রদ্যোৎ তার দিকে তাকিয়ে বলল— 'ঠিক আছে দেখি আমি কি করতে পারি।'

॥ ৮ ॥

সকাল সাড়ে নটা নাগাদ প্রতাপবাবুর টেলিফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। কটা দিন তিনি প্রায় সারাক্ষণই বাড়িতে আছেন।

—'প্রতাপ চক্রবর্তী বলছি।'

—'আমি প্রদ্যোৎ। অপালার দাদা।'

—'ও আচ্ছা, আচ্ছা, বলো!'

—'সোহম কেমন আছে?'

—'সিডেশনে আছে তো। ঘোরটা কাটলেই আর বাড়ির কাউকে সহ্য করতে পারছে না। কাউকে না। খাওয়াতেও সেই একই অসুবিধে। তবে ভায়োলেন্সটা অনেক কমে গেছে।'

—'আপনি ভয় পাবেন না কাকাবাবু। আমার যে সারকে নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁর ডায়গনোসিস ভীষণ ভালো। তিনি বলছেন এটা একটা নার্ভাস ব্রেক ডাউন জাতীয় ব্যাপার। খুব শিগগিরই সেরে যাবে। ওকে থাকতে দিতে হবে নিশ্চিন্তে, ওর যেরকম আবহাওয়া পছন্দ তার মধ্যে। ডক্টর বিদ্যুৎ সরকারের সাজেশন, আমার বোনেরও ইচ্ছে ও রোজ একটা সময়ে আপনাদের বাড়ি গিয়ে ওকে গান শোনাবে। কী শুনলে ওর ভালো লাগবে সে সব অপুই ভালো জানে।'

—'সে কি? কদিন পরেই তো ওর বিয়ে?'

—'দরকার হলে বিয়ের আগের দিন পর্যন্ত ও যাবে, তারপর সাত-আট দিন বাদ দিয়ে আবার যাবে। কিন্তু প্রতিদিন ওকে নিয়ে যাওয়া-আসা করার ব্যবস্থাটা আপনাকে করতে হবে কাকাবাবু!'

—'সেটা কোনও প্রবলেম না। ওয়ান অফ মাই কারস উইল অলওয়েজ বি অ্যাট ইয়োর সার্ভিস। কিন্তু .... তুমি কি সত্যিই বলছো এতে ওর উপকার হবে?'

—'আমাদের সেটাই আশা। লেটস ট্রাই অ্যাট লীস্ট।'

—'আমি সকালে কলেজ যাবার পথে সোহমকে খাইয়ে আসব। আর অপু যাবে সন্ধেবেলা।'

—'অল রাইট, মাই বয়, আই ডোন্ট নো হাউ আই কান থ্যাঙ্ক ইউ।'

বিদ্যুৎদা বললেন— 'নার্ভের ওপর সঙ্গীতের প্রভাব নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে। বিদেশে। বিশেষত রাশিয়ায়। ওরা স্কাইজোফ্রেনিয়া পর্যন্ত ট্রীট করছে মিউজিকের সাহায্যে। তোমার বোন সাজেশনটা খারাপ দেয়নি। কিন্তু অপালার দুর্দান্ত সাহস এটা মানতেই হবে প্রথম দু চার দিন আমি আর তুমি হাতের কাছে থাকবো। রি-অ্যাকশনটা দেখা দরকার।'

প্রথম যেদিন প্রতাপবাবুর নীল অ্যাম্বাসাডরটা সন্ধেবেলায় কীর্তি মিত্রর গলিতে এসে দাঁড়াল এবং অপালা নীল শাড়ি পরে দাদার সঙ্গে গিয়ে গাড়িতে

উঠল, সেদিন জেঠুর মুখ অসন্তোষে কুঁচকে উঠেছিল। তিনি শুধু এইটুকু জানেন— সোহমের খুব শরীর খারাপ, সে যাকে বলে বেড-রিড্‌ন্‌। কী হয়েছে নাকি এখনও ধরা যাচ্ছে না। অপাই রোজ তাকে দেখতে যাবে, বেশ কিছুক্ষণ থাকবে— এতো বড় একটা সিদ্ধান্ত এরা তাঁকে না জানিয়েই নিয়ে ফেলেছে— এতে তিনি শুধু বিরক্ত নন, বিস্মিত। ব্যাপারটা তিনি তিনটে কারণে পছন্দ করছেন না। প্রথমত সোহম ছেলেটির কোনও ছোঁয়াচে রোগ হয়ে থাকতে পারে, সে-ক্ষেত্রে বিয়ের আগে অপালার সেখানে রোজ যাওয়াটা খুবই ঝুঁকি নেওয়ার শামিল। দ্বিতীয়ত, কথাটা যদি হবু-কুটুমদের কানে যায় ? তাদের বাড়ির হবু-বউ রোজ সন্ধেয় একটি ছেলে-বন্ধুকে সাহচর্য দিতে যাচ্ছে যেহেতু সে শয্যাবন্দী ? কিভাবে জিনিসটা তাঁরা নেবেন ভেবে কূল পাচ্ছেন না তিনি। তৃতীয় কারণটা একেবারে ব্যক্তিগত, তাঁর নিজস্ব অনমনীয় অহং সম্পর্কিত। 'তাঁকে' না জিজ্ঞেস করে, তাঁকে 'না জিজ্ঞেস' করে এরা দু ভাই বোন কি করে এটা করতে পারল ? এসব ব্যাপারে তাঁর একমাত্র ভরসা বউমা। গাড়িটা বেরিয়ে গেলে তিনি বউমাকে ডেকে বললেন— 'বউমা ওরা না হয় ছেলেমানুষ। সব জিনিসের কার্যকারণ বোঝবার অভিজ্ঞতা নেই। তুমি এটা কী করে অ্যালাউ করলে মা ? ওদের তো আমি বুঝতে পারিই না। এখন দেখছি তোমাকে চিনতেও আমার অনেক বাকি ছিল।'

ভাসুরের সামনে তর্কাতর্কি করবার অভ্যাস সুজাতা দেবীর কোনকালেই নেই। তিনি ঘোমটাটা আরেকটু টেনে নিয়ে বললেন— 'দাদা, মেয়েটা তো বিয়ে করতেই চাইছিল না, অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি, আপনি তো জানেন। একটা আবদার ধরেছে, ধরুন আইবুড়ো বেলার এই শেষ আবদার,' বলতে বলতে তাঁর গলা ধরে এলো।

বউমার চোখের জলের সামনে রসময়বাবু একদম নিরুপায়। তিনি বললেন— 'যা ভালো বোঝো করো। আমি আর কী বলব। ভালোর জন্যেই বলি। বুড়ো মানুষ। বাতিলের দলে।'

এ কথার কী উত্তর দেবেন বউমা। রসময় যে এ সংসারে এখনও সর্বময়, তা তাঁর থেকে বেশি আর কে জানে। কিছুক্ষণ ঘোমটা মাথায়, চুপ করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তিনি চলে এলেন। অ্যামবাসাডরটা তখন হুহু করে ছুটে চলেছে।

নির্জীবের মতো শুয়ে ছিল সোহম। অপালাকে দেখে দুর্বল গলায় বলল —'অপু এসেছিস ? এরা আমায় মেরে ফেলতে চাইছে, মাই ওন পীপল, চিন্তা কর, ঘুমোচ্ছি, খালি ঘুমোচ্ছি, এইবার একদিন আর জাগব না।'

প্রদ্যোৎ বলল— 'তোমার বাঁচতে ইচ্ছে করে তো সোহম ?'

—'করে বই কি ? আমার তো এখনও কিছুই করা হল না। লাইফ হ্যাজ জাস্ট স্টার্টেড। হেগেলের অ্যাবসল্যুট আইডিয়ালিজ্‌ম্‌ আর হংসকিংকিণীর রাগ-পরিচয় মাথার মধ্যে খিচুড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে। আই কাণ্ট থিংক ক্লিয়ারলি।'

প্রদ্যোৎ বলল— 'এই আমার স্যার, ডক্টর বিদ্যুৎ সরকার, এঁর ওপর আমাদের সবাইকার দারুণ কনফিডেন্স সোহম। ইনি বলছেন তুমি আর দিন সাতেকের

মধ্যে দাঁড়িয়ে উঠতে পারবে। সব কিছু করতে পারবে। কোনও ভয় নেই। সার হলেও উনি আমার খুব বন্ধু। উনি তোমাকে ঘুমের ওষুধ দিতে বারণ করে যাচ্ছেন। নো মোর ইনজেকশনস। তা অপুর কি যেন একটা আবদার আছে তোমার কাছে।'

অপালা সোহমের বিছানার কাছে চেয়ার টেনে বসল, বলল— 'জানিস তো সোহম, আমার নিজস্ব একটা হারমোনিয়াম নেই ভালো। এদিকে একটা অডিশন রয়েছে রেডিওয়। তোরটা যদি ধার দিস। আমি কদিন একটু রেওয়াজ করতে পারি।'

—'নে না, নিয়ে যা না। নিয়ে যা বরাবরের মতো। আমি তো আর গাইতে পারব না।'

তার শেষ কথাটাকে অগ্রাহ্য করে অপালা বলল— 'দূর, আমাদের বাড়িতে তোর ভালো হার্মোনিয়ম নিয়ে যাই আর ইঁদুরে কেটে দিক। তার চেয়ে আমিই রোজ এখানে এসে রেওয়াজ করে যাবো। তোর কোনও অসুবিধে হবে না তো। ধর, পাশের ঘরেও গাইতে পারি।'

—'পাশের ঘরে কেন, এ ঘরেই গা না। গা।'

—'কী গাইব সোহম?'

—'তোর যা ইচ্ছে। তোর অডিশন। তুই ঠিক কর।'

—'তুই ঠিক করে দিলে আমার ভালো লাগবে।'

—'দরবারী গা তবে, দরবারী কানাড়া।'

—'ঠিক আছে।'

বিদ্যুৎ সরকার আর প্রদ্যোৎ সোহমের মাথার দিকে বসে রইল। সোহম তাদের দেখতে পাচ্ছে না। সে অবসন্নভাবে বিছানায় শুয়ে। মেঝেতে কার্পেট বিছিয়ে হারমোনিয়ম তানপুরা সবই দিয়ে গেল বনমালী।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে তার বেঁধে তানপুরা কোলেই দরবারীর আলাপ ধরল অপালা। এক ঘণ্টা প্রায় পার হতে চলল। মধ্য সপ্তকের বড় কোমল ধৈবতে অপালার কণ্ঠস্বর হালকা মালতী ফুলের মালার মতো দুলছে। বিদ্যুৎ সরকারের ইঙ্গিতে বনমালী এক বাটি স্যুপ হাজির করল। তার মধ্যে নানারকম আনাজের কুচি। চিকেনের ফালি, নুড্‌ল্‌স্‌, এবং সস দেওয়া। প্রদ্যোৎ বাটিটা হাতে করে সোহমের গলায় তোয়ালে বেঁধে আস্তে আস্তে খাইয়ে দিতে লাগল। আলাপেই গান শেষ করল অপালা। তারপর বড়ে গোলাম আলির দরবারীর একটা ক্যাসেট চাপিয়ে দিল টেপে। এইসব টেপ, ক্যাসেট সবই বিদেশী। এখানে পাওয়া যায় না অত সহজে। কোনও কনফারেন্সে সোহম চুপিচুপি এই তরানা রেকর্ড করেছে। বড়ে গোলামের কণ্ঠের খেয়াল তরানা, তার সঙ্গে প্রাণভরে গাওয়া হরি ওম্ তৎ সৎ। আস্তে চালিয়ে দিয়ে ওরা ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সোহম এখন ঘুমের ঘোরে। বনমালীর ওপর ভার রইল সে সময় বুঝে ক্যাসেট বন্ধ করবে। বাইরে সোহমের দুই বউদি, এক দাদা, এবং বাবা। প্রতাপবাবু বললেন, —'খেলো ঘুমোলোও, কিন্তু ঘুমের ওষুধ দেওয়া হল না, ও যদি মাঝ রাত্তিরে উঠে গোলমাল করে?'

বিদ্যুৎ বললেন— 'আমি মাইল্ড একটা ট্রাংকুলাইজার ওর জলের গ্লাসে

গুলে রেখে এসেছি। যদি ঘুম ভাঙে ও জলটা খাবে, হয়ত সামান্য তেতো লাগবে। কিন্তু খেয়ে নেবে। তাতেই আবার ঘুম এসে যাবে। নইলে স্ট্রং সিডেটিভ রাখছি। প্রদ্যোৎ থাকতে পারে, যদি বলেন। তবে আমার মনে হয় স্ট্রং কিছু দরকার হবে না।'

—'সেই ভালো বাবা, প্রদ্যোৎ যদি থাকে... প্রদ্যোতের হাতে ছাড়া তো ও খাচ্ছেও না।'

অপালা চাইল দাদার দিকে। প্রদ্যোৎ বলল— 'অল রাইট। আমি কাল সকালে ওকে খাইয়ে তারপরে যাবো। বিকেলে কি সন্ধের দিকে অপু আসবে।'

সাত দিনের দিন বিদ্যুৎ বললেন— 'এতো ভালো ফল যে হতে পারে গানে তা তিনি নিজেও ভাবেননি।' খুব সামান্য ট্রাংকুলাইজার দরকার হচ্ছে সোহমের। প্রদ্যোৎ এবং অপালা ছাড়াও বনমালীর হাতে সে খাচ্ছে। হিংস্র ভাবটা একেবারে চলে গেছে। কিন্তু এখনও সে বিভ্রান্ত। মনে হচ্ছে আগেকার কথা কিছু মনে নেই। অপালার গান ছাড়াও অন্যান্য গানের রেকর্ড তার ঘরে, কিংবা পাশের ঘরে মৃদু স্বরে চাপানো থাকে। খালি একদিন সরোদ চাপাতে সে রাগে কি কষ্টে কে জানে গোঁ গোঁ করতে থাকে। রেকর্ডটা চাপিয়েছিল প্রদ্যোৎ। অপালা তাড়াতাড়ি এসে সেটা তুলে নেয়, নইলে কি হত বলা যায় না।

এখন অপালার বিয়ের আর তিনদিন বাকি। বিদ্যুৎ এবং অপালার দাদার আর প্রতিদিন আসার প্রয়োজন হয় না। অপালা এসে গান ছাড়াও অনেক ক্ষণ গল্প করে। তার বিয়ের বাজার করছে প্রধানত দীপালি আর জেঠু। মা ঘর-ভর্তি আত্মীয়-স্বজনকে সামলাচ্ছেন। সোহম বলল— অপু, ওই তিলং ঠুংরিটা জানিস ? *'তোরে দেখনে কো জিয়া লাল চায়...'*

অপালা বলল— 'শুনবি ?'

—'শোনা। প্লীজ !'

মৃদু আলো জ্বলছে ঘরে। বনমালী অপুদিদি আসায় নিশ্চিন্তে আড্ডা দিতে গেছে। বউদিরা কেউ পারতপক্ষে এ ঘর মাড়ায় না। সোহমের বাবাও এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। নিজের এতদিনের কাজকর্ম পড়েছিল, তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

অপালা গান ধরেছে, মিড়ে মিড়ে, ছোট ছোট মুরকির কাজে ভর্তি তার আস্থায়ী। হঠাৎ অন্তরায় আসতে সে দেখল সোহম উঠে এসেছে। তার গলায় গানের কলি। সেই আগকার গলা, আগেকার সুর, খালি আরও অনেক নম্র, ব্যাকুল, মিনতিতে যেন পূর্ণ। সে হারমোনিয়মটা টেনে নিল। হঠাৎ সে গাইতে গাইতে প্রাণপণে অপালাকে জড়িয়ে ধরল। তানপুরা কেড়ে শুইয়ে রাখল কার্পেটের ওপর। হারমোনিয়ামের বেলো খোলা রইল। তারপর সে একটা পুতুলের মতো অপালাকে তুলে নিয়ে গেল তার বিছানায়। উন্মাদের মতো চুমু খেতে খেতে বলতে লাগল —'মিতুল, ওহ্ মাই মিতুল, আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ। তুমি জানো না তুমি আমার কী ? তুমি আমার পরজের পঞ্চম। তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারি না।'

সোহমের চুমোয় অপালার মুখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, জিভে লোনা স্বাদ, তার বুক পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মথিত হচ্ছে সমস্ত শরীর। অপালা শুধু প্রাণপণে বলতে লাগল— 'সোহম, সোহম, আমি মিতুল নই, আমি অপু। আমায় ছাড় সোহম, ছাড় প্লীজ।' অপালাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে সোহম, কিন্তু অসীম মমতায়, আদরে। অপালার শরীর মন বিহ্বল হয়ে যাচ্ছে। এখনও সোহম তার পূর্ণ শক্তি ফিরে পায়নি, তাই অপালা অনেক চেষ্টায় নিজেকে মুক্ত করতে পারে। সে আশ্চর্য হয়ে যায় তার একটুও ভয় করছে না। সোহম মুখ নিচু করে আছে। অপালার গালে রক্ত ছোটাছুটি করছে। হঠাৎ সোহম মুখ তুলে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক গলায় বলল— 'অপু, তুই মিতুল নোস। মিতুল যদি তুই হতো! তুই একটু মিতুলকে বোঝাবি আমার হয়ে?'

অপালার ভেতরটা এখনও শীত লাগার মতো কাঁপছে। সে বলল— 'আমাকে বোঝাতে হবে কেন সোহম, যদি বোঝবার হয় মিতুল আপনি বুঝবে।'

—'কিন্তু ও যে দিলীপ সিনহার মোহে পড়ে যাচ্ছে!'

—'বাজে কথা। একেবারে বাজে কথা। ওসব গুজবে কান দিস না। তবে একটা কথা বলি সোহম— যে ভালোবাসা তোকে এমনি যন্ত্রণার মধ্যে, নিষ্ঠুরতার মধ্যে, অসংযমের মধ্যে ঠেলে দেয় তুই সেটাকে ধ্রুব করে রাখিসনি জীবনে। ভালোবাসার চেয়েও বড় কিছু তুই পেয়েছিস। ভালোবাসা হয়ত একদিন ফুরিয়ে যাবে সোহম, গান ফুরোবে না। মিতুলকে যদি না-ও পাস, আর কাউকে নিশ্চয় পাবি, যে সাড়া দেবে তোর ডাকে। তাকে দিয়ে তুই তোর ভালোবাসার সাধ মিটিয়ে নিস। কিন্তু গানকে ছাড়িস না কখনও। ভালোবাসার জন্যই গানকে ছাড়িস না।'

—'গান যদি বিট্রে করে?' সোহম এখন আবার মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে ফেলেছে। অপালার দিকে সোজাসুজি চাইতে পারছে না।

—'গান বিট্রে করবে না। যদি না তুই আজে-বাজে চিন্তা করে, অশুচি আবর্তে পড়ে তাকে বিট্রে করিস।'

—'আমি অশুচি, অপবিত্র হয়ে গেছি, না রে অপু!'

—'না, আমি একেবারেই তা বলছি না। তুই খারাপ কিছু করে ফেলেছিস অসুস্থ হয়ে পড়েছিলি বলে। তুই সেটা কাটিয়ে উঠেছিস।'

সোহম ধরা-ধরা গলায় বলল—থ্রু ইয়োর মিউজিক, অপু অ্যান্ড থ্রু ইয়োর কিসেস।' অপালার মুখ চকচক করছে লালিমায়।

সোহম বলল— 'তুই রাগ করেছিস?'

অপালা বলল— 'না।' সে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে। সোহম হঠাৎ এগিয়ে এসে তাকে পরম আদরে জড়িয়ে ধরে বললে— অপু আমাকে গান গাইতে দে। অন্তত ছোট্ট একটা ফিরৎ। আমার সমস্ত রক্ত গান চাইছে। অপু আমরা ছোট্ট থেকে এক সঙ্গে গান করছি। আমরা বোধহয় তানপুরোর জুড়ির তার। বোধ হয় আমরা অর্ধনারীশ্বর। অপু প্লীজ। কিস মি বাট ওয়ান্‌স।'

অপালা কি করবে? সে দিশেহারার মতো সোহমের এলোমেলো চুলে ভর্তি

ফর্সা দেবতার মতো কপালে তার পাতলা ছোট্ট ঠোঁট ঠেকালো। তারপর একটু দ্রুতই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শুনতে পেল সোহম আকুল হয়ে বলছে— 'অপু আর আসবি না?' অপালা চলতে চলতে বলল—'আসব। আসব। খালি তুই যন্তরটা তুলে নে সোহম। তুই গা। পরদিন এসে যেন দেখি তুই গাইছিস।'

ঘটনাটা কাউকে বলতে পারছে না অপালা। দাদাকে না। দীপালিকে না। এ কথা কাউকে বলা কি সহজ? অথচ না বলতে পারলে তার বুকের ভেতরটা কেমন করছে। অনেক প্রশ্ন তার, অনেক জটিল প্রশ্ন ও সমস্যা মনের মধ্যে জাগছে যার উত্তর পাওয়া দরকার। উনিশ পেরিয়ে কুড়িতে পড়লেও বিবাহের অর্থ সে ভাসা-ভাসা বোঝে। পুরোপুরি এখনও বোঝে না। দীপালি তাকে একটু অবহিত করবার চেষ্টা করছে অবশ্য। কিন্তু সে মাঝে মাঝেই এমন এক একটা প্রশ্ন করে ফেলছে যে দীপুদি বলছে— 'উঃ অপু, তোকে নিয়ে আর পারি না। বাকিটা তোর বর বোঝাবে। আমার দ্বারায় হবে না।' দীপালির অনেক কাজও। সে নিজের গানের ক্লাস সামলে অপালার সমস্ত শাড়ি, গয়না, ব্লাউজ, পেটিকোট, জুতো ইত্যাদি প্রত্যেকটি নিজে পছন্দ করে করে কিনেছে। বরের জামা-কাপড়-জুতো, তা-ও। এবং সেইসঙ্গে প্রসাধনদ্রব্য। এতে অনেক সময় যায়। অপালা দুরু দুরু বুকে ভাবছে সোহম তার সঙ্গে ওভাবে ব্যবহার করার পর এই শরীর নিয়ে সেই রাজপুত্রের মতো সুন্দর, পবিত্র, দরদী ভদ্রলোকটির কাছে সে কী করে যাবে? তিনি তো জানবেন না! অপালা তো তাহলে তাঁকে ঠকাচ্ছে। একেই তো সে বলেই দিয়েছে গানের চেয়ে বেশি সে কাউকে কিছুকে ভালোবাসতে পারবে না। তার ওপর এই। কিন্তু সোহম কি তার প্রেমিক? না না। সোহম তার শরীরের মিতুলকে প্রেমনিবেদন করছিল। সে মুখ ফুটে বলেওছে— মিতুলকে যেন সে বোঝায়। সোহম অদ্ভুত জটিল মানুষ। অপালার সব কিছু সোজা, সরল। সবচেয়ে ভয়ের কথা সোহম তাকে অশুচি করেছে বলে একবারও মনে হচ্ছে না, উপরন্তু সোহমের স্পর্শে তার শরীরে যে শিহরণ জেগেছিল তার স্বাদ সে এখনও তার ওষ্ঠাধরে, জিভে, স্তনবৃন্তে পাচ্ছে, পাচ্ছে তার চোখের পাতার কোমল নীল শিরা-উপশিরায়, মনে হচ্ছে এই অনাস্বাদিতপূর্ব স্বর্গীয় অনুভূতি সে আরও অনেক দিন ধরে পেয়ে যাবে। বিবাহের কেন্দ্রে যদি এই স্বাদ এই আনন্দ থাকে তাহলে তো বিবাহ খুব সুন্দর জিনিস। গানের সঙ্গে তার খুব সামান্যই তফাত। কিন্তু ওই কেন্দ্রে তো সোহম নেই! কেমন লাগবে? ওঁকে ওই ভদ্রলোক যদি এভাবে...কেমন লাগবে? অপালা এমন জটিলতার মধ্যে পড়েনি আগে। এখন ঘটনাস্রোত তার হাতের বাইরে চলে গেছে। তত্ত্বর জন্য জিনিস গোছগাছ হচ্ছে। এয়োডালা, নমস্কারী সাঁইত্রিশখানা, বরণডালার জিনিস, ছাঁদনাতলার জিনিস, নান্দীমুখের হাজারখানা টুকিটাকি। ফর্দ মিলিয়ে দেখছেন তার মা আর মাসিমা, বাড়ি আত্মীয়-কুটুম্বে গমগম করছে। সকালবেলায় ওঁরা সোনার মফচেন দিয়ে আশীর্বাদ করে গেলেন। ফুলের অর্ডার যাচ্ছে। ইলেকট্রিকের লোক, ডেকোরেটরের লোক, হালুইকর বামুন। বাড়িতে এখনই যজ্ঞি শুরু হয়ে গেছে। কাছাকাছি একটি বাড়ি বিয়ের দিনের জন্যে ভাড়া নেওয়া হয়েছে।

যদিও সামনেই, ফড়িয়াপুকুরের ওপর। তবু দুজায়গায় বলে—খুব ছরকট হচ্ছে। এই রাজসূয় আয়োজনের মধ্যে অপালা বসে আছে তার শিহরিত, বিভ্রান্ত শরীর মন নিয়ে। একেবারে স্থাণু।

কী কাজে প্রদ্যোৎ সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। সে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল— 'দাদা!' প্রথমটা প্রদ্যোৎ শুনতে পায়নি। দ্বিতীয়বার ডাকতে সাড়া দিয়ে বলল— 'কিরে? আরে তুই এরকম ফ্যাকাশে হয়ে গেছিস কেন? বিয়েটা এমন কিছু ভয়ের ব্যাপার নয়! টেক ইট ফ্রম মি।'

অপালা বলল— 'না, সোহমের খবর কি?'

—'অনেক ভালো। প্রায় নর্ম্যাল। ওষুধপত্রের জন্যেই যা কমজোরি হয়ে রয়েছে। বই পত্র টেনে পড়াশোনা আরম্ভ করে দিয়েছে দেখলুম। কদিন যাবো না বলেই এসেছি। তোর বউভাতের পরদিনই যাবো।'

—'দাদা, ও যদি জানতে পারে আমার বিয়ে?'

—'তো কি?'

—'যদি রি-অ্যাকশন হয় কোনও? এতো কষ্টে ভালো করে তোলা হল!'

—'ঘাবড়াসনি। ও জানে।'

চমকে উঠল অপালা। —'জানে? কখন? কিভাবে?'

—'কাল যখন বললুম দিন তিনেক আসছি না, অপুও হয়তো বেশ কিছুদিন আসতে পারবে না তখন আমাকে জিজ্ঞেস করল কেন। বলে দিলুম।'

—'অমনি বলে দিলি! ও অবাক হল না?'

—'অবাক হল বই কি! কেন নেমন্তন্ন করিনি জানতে চাইল। বললুম করা হয়েছে। ওর যদি আসার মতো শারীরিক শক্তি থাকে নিশ্চয় আসবে, হাজারবার আসবে।'

—'কেন বললি? ভয় হল না? যদি কিছু হয়?'

—'কিস্যু হবে না। সাময়িক একটা চাপে জিনিসটা হয়েছিল। সে শকের সঙ্গে তোর কোনও সম্পর্ক নেই। ওষুধে...মানে বিদ্যুৎদা আর তোর ওষুধে ও ঠিক হয়ে গেছে। সত্য জানতে দেওয়া ভালো। ও যদি তোর ওষুধের ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সেটা কি খুব ভালো হবে?'

অপালা নিশ্চল হয়ে রইল।

॥ ৯ ॥

ওরা তাকে সাদার ওপর ফিকে নীল, ফিকে গোলাপি আর সোনালির নকশা করা ঢাকাই বেনারসী পরাচ্ছে। অপু কালো, সে কিছুতেই লাল-টাল পরতে চায়নি। এই শাড়িটা তার জন্য বিশেষ করে পছন্দ করেছে দীপালিই। তার পছন্দের কোনও জবাব হয় না। সে চুপিচুপি বলল— 'অপু, কত কনফারেন্সে গাইতে যাবি এর পর, এইটে পরে সন্ধের বা রাত্তিরের একটা জমকালো রাগ ধরবি। ধর তিলক কামোদ। বাস কামাল হয়ে যাবে। 'দীপালিই তাকে অপরূপ কবরী সজ্জায়, অসাধারণ নকশার অলকাতিলকায় সাজিয়ে দিল। ফুলের মালা, গহনা, অপালা নিশ্চল-নিথর হয়ে বসে আছে। এতো সাজ-সজ্জা

সত্ত্বেও যেন সে বৈরাগিণী, তপস্বিনী। মুখে বিষাদমগ্ন, তন্ময় ভাব। কোন অপ্রাপ্যের ধ্যানে যেন সে নিজেকে সম্পূর্ণ নিলীন করে দিয়েছে। বর আসতে দেরি। রাতের দিকে লগ্ন। হঠাৎ দীপালি তার পাশ থেকে এক দৌড়ে ভেতরে চলে গেল। অপালা অবাক হয়ে দেখল জেঠু ঢুকছেন, সঙ্গে প্রতাপবাবু, এবং পেছনে সোহম। আরও পেছনে একটা ঢাউস বাক্স নিয়ে ঢুকছে বনমালী। সোহম সাদা ধবধবে পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরেছে। তাতে সাদা চিকনের কাজ। খুব হালকা বিস্কুট রঙের গরম জহরকোট তার গায়ে। কিন্তু জহরকোটের বোতাম সে আটকায়নি। অনেক রোগা হয়ে গেছে। চোখ দুটো স্তিমিত। সেই প্রাণবন্ত, পুরুষালি, গলা-ফাটিয়ে হোহো-করে-হাসা সোহম নয়। এ যেন তপস্যার আসন থেকে উঠে-আসা কোনও উদাসীন সন্ন্যাসী-যুবক। তার ঈষৎ দাড়ি হয়েছে। একটু সোনালি আভা তার দাড়ি গোঁফ চুল সবেতেই। ফ্যাকাশে ফর্সা রং এবং এই সোনালি আভার চুল-দাড়ি নিয়ে সোহমকে খানিকটা ইউরোপীয় দেখতে লাগছে। ফরাসি-ফরাসি।

সোহমের বাবা হাতের একটা প্যাকেট খুলে একটা বাক্স এগিয়ে দিলেন অপালার দিকে, খুলে দিলেন ডালাটা, পুরো মুক্তোর একটি সেট। বিশুদ্ধ মুক্তো। কানের টপ, গলার মালা, আংটি এবং সরু সরু চারগাছা চুড়ি। গলার স্বরে আদর মাখিয়ে বললেন— 'মা, এই মুক্তো তোমাকে খুব ভালো মানাবে। আমি নিজে পছন্দ করে কিনেছি। পরো কিন্তু। জানি তোমার গুণই তোমার আসল অলংকার। সে তো সব সময়ে বাইরে থেকে দেখা যায় না। এই মুক্তোই তোমায় যথাযথ মানাবে মা।'

বনমালী এসে বাকস্‌টা নামাল। প্রতাপবাবু বললেন— 'এই হার্মোনিয়ম সোহম তোমায় উপহার দিচ্ছে। নিজে চিৎপুরে গিয়ে দেখে শুনে কিনে এনেছে।'

অপালার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে।

জেঠু আর প্রতাপবাবু বাইরে বেরিয়ে গেলেন। যে সব নিকট আত্মীয় বন্ধু মেয়েরা দু-চার জন বসেছিল, তারাও এখন নিজেদের সাজগোজ সম্পূর্ণ করতে ও বাড়িতে চলে গেছে। দীপালি তো আগেই পগার পার। ঘরে এখন শুধু দুই বন্ধু। সোহম হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। অপালার কোলের খুব কাছে। বলল—'অপু তোকে মহাশ্বেতার মতো দেখাচ্ছে। মাইনাস এই গয়নাগুলো। তুই বাণভট্টর কাদম্বরী পড়েছিস। আসলে না, অনুবাদে। তুই যে কী, তুই যে কতটা, তা আমার চেয়ে বেশি কেউ কোনদিন জানবে না। বাট আই ডু মাইন্ড!'

অপালা বুঝতে পারছে না। সে সজলচোখে চেয়ে রয়েছে সোহমের দিকে। সোহম বলল— 'আমাকে বলিসনি কেন?'

অপালা আস্তে আস্তে বলল— 'তুই বলার অবস্থায় ছিলি না সোহম। বলতেই তো গিয়েছিলুম।'

সোহম বলল— 'ডু উই হ্যাভ টু পার্ট? তোর চেয়ে বড় বন্ধু আমার আর কেউ নেই।'

অপালা বলল— 'না। আমরা গান গাইব দুজনে, আমরণ গান গেয়ে

যাবো।' সোহম বলল— 'প্রমিস !'

অপালা চোখের জলের মধ্য দিয়ে হাসল একটু। যেন এ প্রতিজ্ঞা করা মানে হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক সঙ্কল্পকে ছোট করা।

॥ ১০ ॥

পরিবর্তনগুলো জীবনে আসে। আসবেই। কিন্তু আসে সবার অলক্ষ্যে। যার জীবনে এলো সে ধরতে পারে না, কবে সে বদলে গেল, তার জীবন বদলে গেল। দিনক্ষণ সব স্মৃতির অতলে চলে যায়। আগেকার সত্তাটার সঙ্গে একটু একটু করে পাল্টে যাওয়া নতুন সত্তাটাকে তুলনা করলে অনেক সময়ে মনে হয় এ কি সেই একই মানুষ। কখনই হতে পারে না। একি সেই একই মানুষের জীবন ? কি করে এমন হল ? সোহমের জীবনে পরিবর্তন এলো সচেতন ভাবে। কালবৈশাখীব মতো ঘনঘটায় চারদিক আচ্ছন্ন করে। তারপর দুমদাম শিলাবৃষ্টি, তাপমাত্রার হঠাৎ উঁচুতে উঠে যাওয়া আবার হঠাৎ অবিশ্বাস্য নীচে নেমে যাওয়া। তারপর নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনও ঝরিছে বৃষ্টি ধারা বিশ্রামবিহীন, মেঘের অন্তর পথে অন্ধকার হতে অন্ধকারে চলে গেল দিন। প্রথমটা এইরকমই মনে হয়েছিল। তমিস্রা থেকে ঘোরতর তমিস্রায়। অপালা বিয়ের দিন বলেছিল— 'খেয়ে যাবি তো ?'

সোহম বলেছিল—'নিশ্চয়ই। মেনু কি বল আগে ?'

—'আমি জানি না রে। এরা কিসব মিষ্টি-টিস্টি খাইয়ে যাচ্ছে, স্বাদ গন্ধ কিছুই পাচ্ছি না।'

বর এসেছে রব শুনে, মেয়েদের নিশ্ছিদ্র ভিড়ের মধ্যে থেকে সে একবার উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করেছিল। অপালার বর ? অপুর বর ? কি রকম অদ্ভুত অবিশ্বাস্য লাগছিল তার। ভদ্রলোক টোপরটা হাতে করে খুলে নিতে সোহম দেখল ভদ্রলোক যেন সিনেমার বর। বেশ ধবধবে ফর্সা। স্বাস্থ্যবান। কেশবান। বেশ ভদ্র চোখ মুখের যুবক। অপুর সঙ্গে বয়সের ডিফারেন্সটা বোধহয় একটু বেশি। ততক্ষণে তার খাওয়া হয়ে গেছে। ভালো ভালো জিনিসই হয়েছিল। প্রদ্যোৎ যত্ন করে দাঁড়িয়ে খাওয়ালো। কিন্তু অপুরই মতন সোহমও কোনও কিছুরই স্বাদ-গন্ধ কিছুই পেলো না। পাশেই একটি যুবক চোদ্দটা ফিশফ্রাই এবং উনিশটা লেডিকেনি খেলো। সোহমের গা গুলোচ্ছিল। শেষ পদে পৌঁছবার আগেই সে আশপাশের লোকের কাছে মাফ চেয়ে উঠে পড়ল। বাবা তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, বরযাত্রীদের আসরের এক পাশে। তিনি কোথাও খান না। এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে এসে বললেন— 'আপনি সোহম চক্রবর্তী না ?'

—'হ্যাঁ।' সোহম হাত জোড় করে নমস্কার জানাল।

—'আমি শিবনাথ, মানে বরের জামাইবাবু। আপনার গান আমি কয়েক জায়গাতেই শুনেছি। বাঙলার সঙ্গীত-জগতে এখন আপনারাই আশা। 'শিবনা—থ।' তিনি গলা উঁচু করে ডাকলেন।

সোহম বলল— 'এখন ওঁকে বিরক্ত করবার দরকার নেই। এই গোলমালে

আলাপও হবে না ভালো করে। আমি অপুর খুব বন্ধু। আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হওয়া শিবনাথদার ভবিতব্য। কেউ নিবারণ করতে পারবে না।' সে আর দাঁড়াল না। বাড়িতে ফিরে এসে বাবা বললেন—'খোকন, ওষুধগুলো খেয়ে নিও, আমি বনমালীকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আহা! অপু মেয়েটি বড় ভালো। তেমনি চমৎকার বর হয়েছে। এ· জি· বেঙ্গলে রয়েছে শুনলাম। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। খুব ভালো হয়েছে।'

বাবা কেন হঠাৎ অত খরচ করে অপালাকে গয়না দিতে গেলেন সোহম বোঝেনি। বউদিরা বলছিল—আসল বসরাই মুক্তো সব। তার কানে এসেছে কথাটা। বাবার পয়সা অনেক। তার ওপর দাদারাও প্রত্যেকে কৃতী, প্রত্যেকে প্রতিষ্ঠিত। বাবা ইচ্ছে করলে অনেকই দিতে পারেন। কিন্তু হার্মোনিয়ামটা শ্রেষ্ঠ জাতের। সোহম যখন হার্মোনিয়ম উপহার দিতে চায় জানিয়েছিল বাবা তাকে নিজে সঙ্গে করে চিৎপুরের ভালো দোকানে নিয়ে গেলেন, বিনা প্রতিবাদে, যেন খুশি হয়ে কিনে দিলেন যন্ত্রটা। ওটাই যথেষ্ট ছিল। ওটাতে অত খরচ করবার পর নিজে আবার গয়না দিয়ে আশীর্বাদ করলেন? একটা আংটি বা একজোড়া দুল-টুল নয়। একেবারে পুরো সেট। এটা তার কাছে আশ্চর্যজনক মনে হয়েছে। অপু প্রদ্যোৎ দিনের পর দিন তার কাছে এসে তার সঙ্গে গল্প করেছে, সেবা করেছে, অপুর সঙ্গ এতো ভালো তার আগে কখনও লাগেনি। প্রদ্যোতের সঙ্গেও তার ভারী সুন্দর একটা সখ্য জন্মে গেছে। ডক্টর বিদ্যুৎ সরকারও চমৎকার বন্ধু। কিন্তু এখনও সে জানে না, এগুলো কাকতালীয় নয়, অপালা তাকে সারাবার জন্যে প্ল্যানমাফিক গান গেয়েছে, সঙ্গ দিয়েছে ওষুধের সঙ্গে পথ্য হিসেবে। তার অসুখের সময়কার মানসিক বিকারের কথা সে এখন অনেকটাই ভুলে গেছে। খালি একবার বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে পড়েছিল কিছু দারুণ বিভ্রান্তিকর কথা। যখন সে খেয়ে বেরোচ্ছে, তখন উল্টো দিক থেকে মাস্টারমশাই ঢুকছিলেন, তাঁর পেছনে মিতুল। ডান ভুরুর ওপর আর বাঁ গালের নীচের দিকে চিবুক ঘেঁষে কাটা দাগ। কেন? কেন মিতুলের এরকম দাগ হল মুখে। সে হঠাৎ দেখল দারুণ জমকালো সাজগোজ করা দীপালি একরকম দৌড়ে একদিক থেকে আর এক দিকে চলে গেল। মিতুলকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। সে সোহমকে দেখতে পায়নি। কিন্তু মাস্টারমশাই পেয়েছিলেন। তিনি মিতুলকে একরকম আড়াল করে নিয়েই ভেতরে ঢুকে গেলেন। তার বাবাও যেন শশব্যস্ত হয়ে তাকে বরের ঘরের দিকে নিয়ে গেলেন। কারো সঙ্গেই প্রায় দেখা হল না, কথা হল না। তার বাবা তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাড়িতে ঠেলে তুললেন। দীপালি...রামেশ্বর ঠাকুরজী...মিতুল...কাটা দাগ...সে আবছা আবছা মনে করতে পারছে। একটা তীব্র ঘৃণা...রাগ... কার ওপর সে জানে না। সে মিতুলের ঘরে ঢুকে গিয়েছিল। কিছু জিজ্ঞেস করেছিল। তাতে মিতুল দারুণ ক্ষেপে যায়, তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলে মুখের ওপর ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিতে যায়। সোহম তার কাঁধের চাড় দিয়ে দরজা খুলে ফেলে, টেবিলের ওপর একটা কি যেন পড়েছিল সে সেইটা নিয়ে মিতুলকে আক্রমণ করে। ইস্‌স্‌ সোহম অন্ধকারে দুহাতে মুখ ঢাকল। তার স্পষ্ট মনে পড়ছে সে অপুকে কিছু

বলেছিল, তার হয়ে ওকালতি করতে বলেছিল মিতুলের কাছে। তার কি সত্যিই দরকার আছে। মিতুল অসম্ভব সুন্দর। কিন্তু একেবারে হৃদয়হীন, কোনও ডেপ্‌থ্‌ নেই। সে কী জিজ্ঞেস করেছিল ? দিলীপ সিন্‌হার সঙ্গে তার সত্যিই ঘনিষ্ঠতা আছে কি না জানতে চেয়েছিল খুব সম্ভব, হয়ত একটু উত্তেজিত হয়েই জিজ্ঞেস করেছিল। কিন্তু তাইতেই মিতুল একটা পনের ষোল বছরের মেয়ে তাকে কি ভাবে অপমান করল ইতর, জানোয়ার, বাস্টার্ড। অথচ কে যে সত্যি বাস্টার্ড তা তো সোহম ভালো করেই জানে।

হায় ঈশ্বর! সে কী করেছে! মিতুল কে! তার কেউ নয়। একটা লাভলি ডল, অসভ্য, বেয়াদব! কিন্তু মিতুলকে সে আঘাত করেছে। তার ক্ষতিপূরণস্বরূপ গুরুজি বা মিতুল যদি তাকে বিয়ে করতে বলে মিতুলকে ? তাহলে সে কী করবে ? মিতুল এমনিতে উচ্ছল স্বভাবের প্রাণবন্ত মেয়ে, ফাটা ফাটা ঘষা ঘষা খসখসে নানান রকম অদ্ভুত গলায় চমৎকার দাদরা, গজল, নজরুল গায়, পপ-সং-এ তো ফাটিয়ে দেয় কিন্তু তার ভেতরে প্রাণমন আছে কিনা সে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। সে এই ক বছরে মিতুলকে বহু ফুল, তাছাড়া ছোটখাটো শৌখিন উপহার দিয়েছে। সোজাসুজি না বললেও বুঝতে দিয়েছে সে তাকে ভালোবাসে। তার পরও মিতুল কি করে এরকম ব্যবহার করতে পারল ?

ঘরের মধ্যে আজকে অনেক ডবল রজনীগন্ধা। সুগন্ধে ঘর ভরে রয়েছে। রাস্তার দিকের জানলাগুলো খুলে দিল সোহম। সে শীতকালেও জানলা খুলে শোয়। জামাকাপড় বদলে, দাঁত ব্রাশ করে সে বিছানার ওপর বসে রইল। বনমালী ওষুধগুলো নিয়ে এসেছে। দুটো ছোট ছোট বড়ি। চটপট সেগুলো গিলে নিয়ে সে বনমালীকে বলল— 'তুই শুতে যা।' বিছানার ওপর টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল সোহম। তার হাত দুটো মাথার তলায়। ধবধবে বালিশের ঢাকা থেকে সুগন্ধ বেরোচ্ছে। পায়ের তলা থেকে হালকা লাল কম্বলটা সে গায়ের ওপর টেনে নিল। চোখ-জড়িয়ে আসতে লাগল আর অমনি আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে লাগল দরবারী কানাড়া। তার মস্তিষ্কের কোষ থেকে বাইরের পরিমণ্ডলে। কিম্বা এই ঘরের হাওয়া ধরে রেখেছিল সেই দরবারী। যা আজ রাতে তার মস্তিষ্ক সঠিক পিনটা সঠিক খুঁজে ঢুকিয়ে দেবার পর পরিস্ফুট হতে লাগল। প্রথমে সে শুনতে পাচ্ছিল বড়ে গোলাম আলি। যাঁর প্রতিটি কাজ, প্রতিটি খুঁটিনাটি সে শুনে শুনে রপ্ত করবার চেষ্টা করে। তারপর হঠাৎ সে শুনতে পায় মেয়েলি কণ্ঠের দরবারি—তার স্বাদ আলাদা। অপুর সুরবাহারের মতো গলা। ভরে যাচ্ছে ঘরের সমস্ত কোণ। সোহমের মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষ। শুনতে শুনতে সোহমের হঠাৎ মনে পড়ল অপালার মুখে কেমন শিশুর মতো দুধে-গন্ধ। অপু যখন গায় তখন সোহমের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুরের বাঁকের সঙ্গে সঙ্গে, তালের সঙ্গে সঙ্গে বাঁক নেয়। তীব্র এক নৃত্যের আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে সে। অপুকে আদরে আদরে ভরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। তার নিজের শরীর মন আত্মার মধ্যে যা সঙ্গীতময় সেই অংশটুকু দিয়ে সম্পূর্ণভাবে অপুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ব্যগ্রতা অনুভব করে সে। মিতুলের প্রতি তার যা মনোভাব তার থেকে কোথায় সূক্ষ্মভাবে একটা তফাত

আছে এই অনুভবের। অপুর প্রতি তার অনুভূতি কী সুন্দর! মধু নক্তমুতোষসো মধুবৎ পার্থিবং রজঃ। তার দিবস রাত্রি, তার পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণা যেন অপুর স্পর্শে মধুময়, মধুমাধবী হয়ে গেছে। এটাই কি আসল ভালোবাসা! অপুর বিয়ের খবর শোনবার পর সে একটা ধাক্কা খেয়েছিল ঠিকই। কিন্তু দিলীপ সিনহার সঙ্গে মিতুলের ঘনিষ্ঠতার কথা শুনে, দিলীপ মিতুলকে আদর করছে এরকম একটা দৃশ্য কল্পনা করে তার মধ্যে যে একটা উন্মাদ ক্রোধ, জিঘাংসা জেগেছিল, অপু-শিবনাথ দত্তগুপ্তর হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ঠিক সেইরকম মেজাজ তার হচ্ছে না। অপু তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল এ কথা তো মনে হচ্ছেই না। অপুর সঙ্গে তার সম্পর্ক যেখানে, সেখানে কোনও শিবনাথ দত্তগুপ্তর পৌঁছনোর প্রশ্ন নেই। সেতারী যখন ঝালা বাজায় তার বাঁ হাতের টিপে সমানে মিড় দিয়ে চলে। অথচ ডান হাতে চলে চিকারির কাজ। দ্রুত থেকে দ্রুততর। অপু তেমনি যুগপৎ বাজবে। অপুর শান্ত সমাহিত ধীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এই দুর্লক্ষ্য মাত্রাগুলো সে আবিষ্কার করেছে তার সূক্ষ্মতম অনুভূতি দিয়ে। কিন্তু অপুকে আদর করবার সময়ে, যা আসলে ছিল তার নিজেরই আত্মমোক্ষণ, সে মিতুলের নাম করেছে বারবার। কোনভাবে সে কলুষিত করেছে, অপমান করেছে অপুকে। কিভাবে সেই ক্ষতি সে পূরণ করতে পারে সোহম কিছুতেই ঠিক করতে পারল না। সে তো এক রকম করে ভাবছে। কিন্তু অপুর কিরকম লেগেছিল? অপু কী ভেবেছিল? তার মুখের সেই লালিমা যে গভীর অপমানের লালিমা নয় কে বলবে? অপু নিজে কোনদিন বলবে না। কোন দিন না। অপরের জন্যে সে প্রাণ দিয়ে করে। কিন্তু নিজের ব্যাপারে সে অন্যের জোর-জবরদস্তি শেষ পর্যন্ত মেনে নেয়। এগুলো কিসের লক্ষণ? এই মেনে নেওয়া, এই সরে যাওয়া, এই প্রতিবাদ না করা! অত স্পর্শাবিষ্ট কলাকার যে এই বয়সেই, নিজের বিয়ের মাত্র কদিন আগে রক্ষণশীল বাড়ির ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে যে অসুস্থ পুরুষ বন্ধুর কাছে এসে দিনের পর দিন নিজেকে উজাড় করে গান করতে পারে সে তো ব্যক্তিত্বহীন নয়! তাহলে? তাহলে কি অপু অভিমানী? এতো অভিমানী যে অভিমান হয়েছে সেটা বুঝতে দিতেও তার অভিমান? এখন তার চোখের সামনে আর কিছু নেই শুধু রয়েছে অপালার সেই মহাশ্বেতারূপ। কাদম্বরীর মহাশ্বেতা ধবধবে ফর্সা। অপালা কালো। কিন্তু গুণী রসিক শিল্পী মানুষ ভাবগ্রাহী হন। সে দেখতে পাচ্ছে অপালা তার অজস্র ঢেউ খেলানো চুল আলুলায়িত করে, শুভ্র বেশে, হাতে বীণা নিয়ে এক অতীন্দ্রিয়লোকগ্রাহ্য অপরূপ গান গাইছে, তার চোখ টলটল করছে। অথচ অপালার ছিল বিবাহবেশ, চুল তার চিত্রবিচিত্র কবরীতে বদ্ধ। মুখে আলপনা। কত অলঙ্কার। হাতে উপহারের বাক্স।

সোহম উঠে চালিয়ে দিল বড়ে গোলামের বাগেশ্রী। যা আবারও কোনও ঘরোয়া অনুষ্ঠান থেকে টেপ করা। গান শুনতে না পেলে তার ঘুম আসবে না এই শীতার্ত চাঁদনী রাতে। বনমালী টের পাবে। সে চুপিচুপি গিয়ে কর্তাবাবুকে অর্থাৎ বাবাকে তুলবে। এই বয়সে, একটা মানসিক ঝড় তাঁর ওপর দিয়ে চলে যাবার পর, তিনি আবারও ছোট ছেলের জন্য ঘুমোতে পারবেন না, এ হয় না। সোহম তাহলে অত্যন্ত লজ্জা পাবে, কষ্ট পাবে।

খুব নিচু স্বরে চালিয়েছে সে টেপ। শুনতে শুনতে চোখ ঢুলে আসে। চেতনার মধ্যে কোথাও মিশে যেতে থাকে বাগেশ্রীর প্রাণ-নিংড়োনো পকড়, অপালার মুখের স্বাদ, আর চুলের গন্ধ, অপুর বরের মুখ, এবং ঘুম, কিরকম ছেঁড়া-ছেঁড়া অথচ আবিষ্ট, মধুর ঘুম। যা সে কোনকালে ঘুমোয়নি।

ঘুমের মধ্যে অপালা এবং দরবারী কানাড়া তাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে রাখে। কোনও স্পষ্ট রূপ, সঙ্গ বা সুর নয়, শুধু একটা ভাব। সে অপালার আপূর্যমান দরবারী কানাড়ার মধ্যে নিজের আত্মার সূক্ষ্ম অচলপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীতাঙ্গকে প্রবিষ্ট করে দেয়। এক অদ্ভুত ছেদহীন, যতিহীন গান্ধর্বী রমণের অবর্ণনীয় উল্লাস তাকে রাতভর ঘুমভর আবিষ্ট করে রাখে।

পরদিন খুব ভোরবেলায় তার ঘুম ভাঙল। সে চটপট করে তার প্রাতঃকৃত্য ও সাজপোশাক করে নিল, বনমালী বেচারি অঘোরে ঘুমোচ্ছিল তাকে সে ডেকে তুলল। বলল— 'আমি একটু মর্নিংওয়াক-এ বেরোচ্ছি বনমালী বাবাকে বলে দিস।'

বনমালী সন্ত্রস্ত হয়ে বলল— 'সে কি খোকাবাবু, তোমার শরীর দুর্বল, একা একা, আমি সঙ্গে যাই।'

—'কি মুশকিল, আমি ইচ্ছে মতো ঘুরব, তুই ঘরটা গুছিয়েটুছিয়ে রাখিস। বেশ কিছু গোলাপ আর অ্যাসটার রাখিস তো ঘরে!' শেষ কথাগুলো সে বনমালীকে নিশ্চিন্ত করার জন্য বলল।

'তবে কিছু খাও। আমি নিয়ে আসি।'

—'কালকে প্রচুর নেমন্তন্ন খাওয়া হয়েছে। সকালটা কিছু খাবো না, ভাবিস না।' সোহম আর দেরি করল না। তার গায়ে একটা কাশ্মীরি শাল। সে পুরো রাস্তাটা হাঁটতে হাঁটতে প্রেমচাঁদ-বড়াল স্ট্রীটের দিকে চলল। ভোরবেলায় কলকাতার দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে হাঁটতে ভালো লাগে। বিশেষ করে ওপরের দিকে দৃষ্টি রাখলে। কিভাবে আকাশ প্রকাশিত হচ্ছে, কিভাবে সূর্য নিজেকে ছড়াচ্ছে। কিন্তু আশপাশের দিকে নজর করলেই মুশকিল। গড়গড় শব্দ করে দোকানপাটের ঝাঁপ ওপরে উঠছে, ময়লা সংগ্রহ করতে করতে ময়লার গাড়ি চলেছে। ছোট বড় অনেক বয়সই। রাস্তার ধারে প্রাতঃকৃত্য করতে বসে গেছে। সুতরাং পুরো রাস্তাটা হাঁটবার সংকল্প বেশিক্ষণ রইল না। সে একটা ট্র্যামে উঠে পড়ল। একদম খালি। শুধু সে কনডাক্টর আর চালক। এই নির্জনতা, একলা থাকা, একলা একলা এই গতি সমস্তটাই সোহম উপভোগ করতে লাগল এত তীব্র এবং গভীরভাবে যেন সে আগে কখনও ভোরবেলা ওঠেনি। ট্র্যামে চড়েনি। ট্র্যামের ডিং ডিং ঘণ্টি শোনেনি। দেখেনি কিভাবে কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে শীতকাতুরে অঘ্রানের সূর্য ইতস্তত করতে করতে মুখ বাড়ায়।

ভেতর থেকে এসরাজের আওয়াজ আসছে। কড়া নাড়ার শব্দে ভৈরবী বন্ধ হয়ে যায়। দরজা খুলেই একেবারে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন রামেশ্বর ঠাকুর। সোহম হঠাৎ তাঁকে সেই চৌকাঠের ওপরেই প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়, নম্র গলায় বলে— 'মাস্টারমশাই, ভালো আছেন? আপনাকে বড্ড ভাবিয়েছি, না!' রামেশ্বর হঠাৎ দুহাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করে ধরেন সোহমকে। দুজনে লম্বায়

সমান, খালি একজন বয়স্ক, অন্যজন সদ্য যুবক।

তিনি বললেন— 'ভেতর এসো সোহম্। আজ যেটা বাজাচ্ছিলুম এসরাজে সেটা আনন্দ ভৈরবী। ভৈরবী বাজাতে বাজাতে সুরটা এসে গেল। নোটেশন করে নিয়েছি। দিবারাত্র ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে তিনি হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এইরকম কিছু দেন।'

সোহম বলল— 'আপনার কাছে আমার অনেক অপরাধ। ক্ষমা করুন।'

মাস্টারমশাই ব্যস্ত হয়ে বললেন— 'এই দ্যাখো, অসুস্থ অবস্থায় কি করেছো না করেছো ওসব ছেড়ে দাও। দোষ করোনি যে মাফ করবো।'

সোহম অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাল, একটু ইতস্তত করে বলল— 'মিতুল, মিতুল কেমন আছে, মাস্টারমশাই ?'

—'ভালো আছে, সেলাই কেটে দিয়েছে। আস্তে আস্তে দাগটা মিলোতে থাকবে। তবে পুরোপুরি মিলোবে না।'

—'মাস্টারমশার... আমি...আমি কীভাবে...আপনি যদি বলেন আমি এক্ষুনি মিতুলকে বিয়ে করতে রাজি আছি।'

—'র‍্যাশলি কিছু করো না সোহম। মিতুল তো একটা বাচ্চা মেয়ে। একেবারেই তৈরি হয়নি। তোমাকেও এখনও অনেক ওপরে উঠতে হবে। ওসব চিন্তা এখন ছাড়ো। মিতুলের কাছ থেকে আমি সব শুনেছি। ও নিজেও খুব অন্যায় করেছে। আসলে ও-ও বোধ হয় তোমার সম্পর্কে কিছু উল্টো-পাল্টা কথা শুনেছিল, এবং সেগুলো সত্যি বলে ভেবে নিয়েছিল। এসব তোমাদের বয়সে হয়ে থাকে। যাকগে ওসব কথা, তুমি ওপরে চলো। মিতুল কিন্তু নেই। সে অপালার বাসর জাগছে। বিকেলবেলা বর-কন্যা বিদায় হলে তবে আসবে।'

মিতুল নেই শুনে সোহমের বুকের ভেতর থেকে যেন একটা ভার নেমে গেল। সে বলল— 'এখানেই তো বেশ আছি। ওপরে কেন ?' আসলে রামেশ্বর ওপরে যাবার কথাটা বলেছিলেন একটা আবেগের মাথায়, সম্ভবত সোহমকে বোঝাতে যে তার এখানে ঠিক আগেকার মতোই অবারিত দ্বার। নয় তো তারা সাধারণত নীচের ঘরেই শেখে। খালি নিচু ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রী একগাদা এসে গেলে, রামেশ্বর তাদের একটা দুটো পাল্টা সাধতে দিয়ে, সোহম অপালা দীপালি এদের ওপরে নিয়ে যান। এদের মতো ছাত্র-ছাত্রী তাঁর আর নেই।

একটু ইতস্তত করে সোহম বলল— 'মাস্টারমশাই, মিতুলের চিকিৎসার খরচটা আমি...তা ছাড়া...'

রামেশ্বর তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন— 'তোমার বাবা দিতে চেয়েছিলেন। এমন কিছু হয়নি। আমি সামলে নিতে পেরেছি বাবা। তুমি ভেবো না... তোমাকে সোজাসুজি একটা প্রশ্ন করছি জবাব দেবে ?'

—'বলুন।' সোহম মুখ নিচু করেই বলল।

—'তুমি কি মিতুলকে ভালোবাসো ? বিয়ে করার কথা তুললে তাই বলছি।'

সোহম খুব আশ্চর্য হয়ে শুনল সে বলছে— 'না। আমার অবিমৃশ্যকারিতার

জন্যে মিতুলের যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্যে আমি মিতুলকে বিয়ে করতে রাজি, এক্ষুনি। তাকে সুখী করারও প্রাণপণ চেষ্টা আমি করব।'

মাস্টারমশাই স্নিগ্ধ গলায় বললেন— 'সোহম, তুমি যে এতটা ভেবেছ, এতেই ক্ষতি যা হয়েছে তার পূরণ হয়ে গেছে। তোমার যা ক্ষতি হয়েছে তারও তো পূরণ করতে পারিনি বাবা। কিন্তু আব কারো হাত দিয়ে ঈশ্বর তা করিয়েছেন। মিতুলকে বিয়ে করার সংকল্প এখন থেকে তোমাকে করতে হবে না। শোনো, নাজনীন বেগম একটা স্কলারশিপ দেন প্রতি বছর, সারা ভারতের কিছু-কিছু ছেলে-মেয়ে তাঁর লখ্‌নৌ-এর বাড়িতে গিয়ে তালিম নেয়। তিনি চেয়েছিলেন অপালাকে। সুরলোকের ফাংশনে তিনি সবার অলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন। সে সময়টা চন্দ্রকান্তজীর অতিথি হয়ে ছিলেন তো! যাই হোক। অপালা মার জীবনে সে সৌভাগ্য হল না। তুমি যদি চাও তো ওঁকে বলে আমি অপুর জায়গায় তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করি। তোমার গানও ওঁর খুব ভালো লেগেছে। বলো, রাজি আছো তো? তবে বুঝতেই পারছো উনি প্রধানত ঠুংরিরই তালিম দেবেন। বেনারসের চীজ।'

সোহম বলল— 'আমি যাবো মাস্টারমশাই। কলকাতা আমার একটুও ভালো লাগছে না। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়া কি রকম—এটা আমার জানা দবকার। বাবা বোধ হয় খুব আপত্তি করবেন।'

—'সে ক্ষেত্রে যেও না। কিন্তু নাজনীনের ওখানে শুধু গান বাজনা ছাড়া আর কিছু হয় না। তিনি নিজেও ষাটের ওপরে গেছেন আমি তো বলি তিনি এখন সাধিকা। প্রত্যেক স্টুডেন্টের আলাদা ঘর। আলাদা যন্ত্র। হিন্দু হলে হিন্দু বামুনের রান্না। উনি ছাত্র-ছাত্রীদের লেভ্‌ল বুঝে, তার আসল প্রতিভা কোনদিকে বুঝে তালিম দেন। এদিক থেকে অসম্ভব ক্ষমতা ধরেন। বিশাল বিশাল বাগান, চত্বর আছে ওঁর প্রাসাদে, ইচ্ছেমতো ঘুরবে, ফিরবে। আর সবচেয়ে বড় কথা ভারতের সব বড় বড় ওস্তাদদের গান-বাজনা-নাচ দেখতে শুনতে পাবে। নাজনীনের এমন ইনফ্লুয়েন্স যে ইচ্ছে করলে উনি তোমার ক্ষমতার ধরন বুঝে অন্য কারো কাছেও ট্রান্সফার করে দিতে পারেন। কিছুদিনের জন্য কিছু চীজ শিখিয়ে নিতে পারেন।'

সোহম বলল— 'আগে বাবাকে জিজ্ঞেস করি।'

আগে সে বাবার এতো বাধ্য ছেলে ছিল না। কিন্তু তার সাম্প্রতিক অসুস্থতার পর সে বাবার খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। বাবার ভেতরকার ব্যগ্র ভালোবাসার স্বাদ পেয়েছে। তার অসুখের আগে তাদের বাড়িটা ছিল খুব সুন্দরভাবে পরিচালিত একটি হোটেলের মতো। সবার ওপরে ম্যানেজার তার বাবা। কিন্তু কারুর সঙ্গে কারুর তেমন যোগাযোগ ছিল না। ভালোবাসার অভাব বা উদাসীনতা এর কারণ নয়। এর কারণ তথাকথিত আভিজাত্য কিছুটা, আর কিছুটা প্রাত্যাহিকতার নির্বেদ। কিন্তু তার অস্বাভাবিক অসুখে আভিজাত্যের সেই আপাত-উদাসীনতার নির্মোকটা খানখান হয়ে ভেঙে গেছে। বউদিরা, বিশেষত মেজবউদি দুপুরে তাকে কাছে বসিয়ে খাওয়ায়। রাত্তিরে সকলে একসঙ্গে টেবিলে বসে। সবচেয়ে পরিবর্তন হয়েছে বাবার। তাঁর অফিস-ঘর নীচেই। আজকাল যে কোনও ছুতোয় তিনি হঠাৎ হঠাৎ

ওপরে উঠে আসেন। 'খোকন! খোকন!'

—'কি বাবা?' সে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

—'না মানে। বনমালীকে একটু দরকার ছিল। তুমি কি করছিলে?'

—'পড়ছিলুম বাবা।'

—'পড়ছিলে? আরে ঠিক আছে বনমালীকে আমি খুঁজে নিচ্ছি। তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না...।'

সোহম বুঝতে পারে বনমালীকে বাবার মোটেই দরকার নেই। তিনি ছল করে সোহমের মুখটা দেখে গেলেন। ছোট ছেলের প্রকৃতিস্থ মুখ, যা তিনি হারাতে বসেছিলেন। তার হৃদয়ের ভেতরটা বাবার জন্য দ্রবীভূত হয়ে যায়।

দুদিন পর বাবার কাছে কথাটা পাড়ল সে। রামেশ্বরের নাম করল না। স্কলারশিপটার কথা যেন সে অন্য কোনও উৎস থেকে শুনেছে এমনি একটা ভাব করল। বাবার মুখটা ভারী হয়ে গেল। বললেন— 'তোমার এবার এম. এ. ফাইন্যাল ইয়ার!'

—'বাবা, আমি পরীক্ষাটা ঠিক সময় মতো দিয়ে যাবো। ওটা তো একটা হোস্টেলের মতো। প্রত্যেকের নিজস্ব ঘর-টর আছে।'

—'কিন্তু কে বেগম। স্ত্রীলোক গায়িকা, সে খোকন আমি...'

—'বাবা ওঁর ষাট বছর বয়স হয়ে গেছে। মাস্টার মশায়ের চেয়েও বড়। সাধিকা গোছের গায়িকা। মধ্যপ্রদেশের কোন এস্টেটের মহারানী। খুব ভালো লোক।'

—'চেঞ্জ তোমার পক্ষে ভালো। ডাক্তারও সে কথা বলছেন। কিন্তু একলা তোমাকে ওই গান-বাজনার ওয়ার্ল্ডে চলে যেতে দিতে আমার মন চাইছে না খোকন।'

—'বাবা, তোমার কথামতো আমি এম. এ করবো কথা দিচ্ছি। কিন্তু গান ছাড়া আমার সত্যি কিছু হবে না বিশ্বাস করো। আমি শুধু গান করবো, গান শিখব। একেবারে ডিভোটেড হয়ে। তোমার কোনও ভয় নেই।'

প্রতাপবাবু বললেন —'ঠিক আছে। আমাকে একটু ডাক্তারের পরামর্শ নিতে দাও।'

অপালা যে সন্ধেবেলায় শাঁখে দীর্ঘ, দীর্ঘতর, দীর্ঘতম ফুঁ পেড়ে, পাড়া প্রতিবেশীর বিস্ময় উদ্রেক করে মাথায় আধ ঘোমটা দিয়ে শাশুড়ি আর পিসশাশুড়ির সঙ্গে সেদিনের বিকেলবেলার জলখাবার চল্লিশটা মটরশুঁটির কচুরি তৈরি করছিল, সেইদিন দুন এক্সপ্রেসে সোহম লখনৌ রওনা হয়ে গেল।

পিসিমা বললেন—'বউমা দুরকমের পুর হবে। একটা ঝুরো ঝুরো। আরেকটা মাখো মাখো, থসথসে। ঝুরো পুরটায় জিরে ভাজার গুঁড়ো দিও। তোমার শ্বশুর ওইরকম ভালোবাসেন।'

সোহম তার তানপুরার বাক্‌সটাকে সিটের তলায় রেখে স্বস্তি পাচ্ছিল না। সামনের ভদ্রলোক আলাপ করবার চেষ্টায় বললেন—'কী আছে ওতে? সেতার?'

ফার্স্টক্লাস কুপে। শুধু দুর্জন যাত্রী। সোহম বলল—না, তানপুরা।'

—'আপনি গাইয়ে নাকি? কী নাম বলুন তো? কনফারেন্সে যাচ্ছেন, না

রেডিও প্রোগ্রাম ?'

—'একটু আধটু গাই। নাম বললে চিনবেন না। লখনৌ যাচ্ছি। কাজে।'

পিসিমা বললেন—'বাকি পুরটা শুধু আদামৌরির হবে। ওটা বাকি সবার। ময়দাতে একটু লেবুর রস দাও মা। মচমচে হবে। শিখে নাও। শিখতে তো হবে সবই। গেরস্থ ঘরের বউ যখন। ময়ান ছাড়াও একটু পাতি লেবুর রস দিতে হয়।'

ভদ্রলোক সুটকেসের গায়ে লেখা নামটা পড়ে বললেন— 'সোহম চক্রবর্তী। সোহম চক্রবর্তী। কেমন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। কিছু মনে করবেন না, আপনি আমার চেয়ে অনেক ছোট। আমি যাচ্ছি দেরাদুন। কর্মস্থল। নিজের দেশের লোক, ভাষা, গান সব ছেড়েই থাকতে হয়। একটু বেশি কথা বলি।'

সোহম বলল—'তাতে কী হয়েছে ? আপনি কথা বলুন না।'

—'গান যখন করেন তখন যাত্রাপথে শুনতে পাবো নিশ্চয়ই !'

—'সোহম জানলার কাচটা টেনে নামিয়ে দিল। বড্ড হাওয়া আসছে। তাব গলায় একটা সুদৃশ্য কাশ্মীরি কমফর্টার। সে হঠাৎ বিনা ভূমিকায় গেয়ে উঠল—'যে যাতনা যতনে/আমার মনে মনে মন জানে/পাছে লোকে হাসে শুনে/আমি লাজে প্রকাশ করি নে।'

শাশুড়ি বললেন—'এইবার ঘিয়ে ধোঁয়া উঠেছে, ছাড়ো কচুরিগুলো এক এক করে ছাড়ো। অভ্যেস আছে তো। পাশ থেকে। হ্যাঁ এই তো বেশ ফুলছে !'

ভদ্রলোক বললেন— 'আমার নাম বিশ্বরূপ দে। মিলিটারি অ্যাকাউন্টস-এ আছি। আপাতত দেরাদুন। গান শুনতে চেয়ে এমন গান শুনতে পাবো, আমি স্বপ্নেও আশা করিনি। ক্ল্যাসিক্যাল—বেস আছে গলার। আমারও এককালে শখ-টখ ছিল।'

'সোহমের এখন মুড এসে গেছে। সে হাতে তাল দিয়েই গাইতে লাগল 'কানহা রে, নন্দ নন্দন/পরম নিরঞ্জন হে দুখভঞ্জন।' রাগ কেদাবা, তিনতাল। ভদ্রলোক মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন।

খেতে খেতে শ্বশুরমশাই বললেন—'কচুরিগুলো ফুলেছে বটে, কিন্তু তেমন কামড় হয় নি।'

শাশুড়ি বললেন—'ছেলেমানুষ, নতুন শিখছে। ওই যে পাতে দিতে পেরেছে, ওই ঢের। তোমাদের বাড়ি-বগ্নে অভ্যেস কি হল জানো ? বসতে পেলে শুতে চাও।'

॥ ১১ ॥

বিদ্যুৎদা শিগগিরই লন্ডন চলে যাচ্ছেন। সমস্ত ডাক্তারের সেই এক লক্ষ্য এম. আর. সি. পি. এফ. আর. সি. এস। নানারকম কার্যকারণে ছাত্র প্রদ্যোতের সঙ্গে বিদ্যুৎদার সম্পর্কটা এখন প্রায় ইয়ারের। এক গেলাসের নয় অবশ্য। কারণ মিত্র পরিবারের পরিমিতি বোধ প্রদ্যোতের মধ্যেও বিলক্ষণ বর্তমান।

বিদ্যুৎদার লেজটাও সে প্রাণপণে ধরে আছে। বিদেশ সে যাবেই। এই সব হাসপাতাল, এই সব চাকরি, এই কণ্ঠাগত পরিশ্রম, পরিবর্তে কিচ্ছু নেই। প্রদ্যোৎ স্বপ্ন-টপ্ন দেখার মানুষ না। সে যাবেই। বিদ্যুৎদা তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন সে জানে। তারও হাউস-স্টাফ-শিপ শেষ হয়ে এলো। বিদ্যুৎদা তাকে পার্ক স্ট্রীটের এক চমৎকার রেস্তোরাঁয় খাওয়াচ্ছেন। মৃদু আলো। মৃদু স্বরে ঝমঝমে বাজনার সঙ্গে গান। কথা বলার কোনও অসুবিধেই হয় না।

তাদের উচ্চকাঙক্ষা, ব্যবহারিক সুবিধে-অসুবিধের সম্পর্কে নানা কথা বলতে বলতে হঠাৎ বিদ্যুৎ সরকার বললেন— 'আচ্ছা প্রদ্যোৎ, অপুর বিয়েতে একটি মেয়েকে দেখছিলাম, সামান্য প্লাম্প, অপুর থেকে শর্ট হাইট, খুব ফর্সা, অরেঞ্জ রঙের শাড়ি পরেছিলো। মেয়েটি কে ?'

প্রদ্যোৎ মিটিমিটি হেসে বলল—'কোন মেয়েটি বলুন তো, ধরতে পারছি না।'

—'ওই যে একটু নেপালি ধাঁচের চোখ মুখ !'

—'ও বুঝেছি বোধহয়। গুড়িয়া জাপান কী ? তা হঠাৎ ? এতো খোঁজ খবর ?'

—'ভেরি ইন্টারেস্টিং—' সংক্ষেপে বললেন বিদ্যুৎদা।

—'প্রিটি, চার্মিং এসব বললে বুঝতে পারতুম। কিন্তু ইনট্‌রেস্টিং ?

'আরে আমিও তো তোমার বোনের বিয়েতে খেটেছি কম না। সারাদিনই ছিলাম। নিমেষের মধ্যে অখণ্ড মনোযোগে বড় বড় সব অপূর্ব আলপনা দিয়ে ফেলল। কোথায় বর এসে ফার্স্ট দাঁড়াবে, ছাঁদনাতলা, বাসর ঘর। হাতের এক এক টানে সোজা সোজা রেখা, বৃত্ত, কলকা, ফুলের পাপড়ি। কী সুইফ্‌ট্‌ ! তারপরেই দেখলুম অপুকে সাজাচ্ছে। অপুকে তো যখন বার করল তোমাদের ওই বিয়ের বাড়িটাতে নিয়ে যাবার জন্য আমি সেই অপু বলে চিনতেই পারিনি !'

—'আমার বোনটাকে দেখতে খারাপ বলছেন বিদ্যুৎদা ? বাঃ বেশ লোক তো আপনি ?'

—'আহা হা হা, তা বলব কেন, অপু সার্টনলি হ্যাজ হার ওন স্পেশ্যাল চার্ম। আমি বলতে চাইছি, শী ওয়াজ টোট্যালি ট্রান্সফার্মড্‌। শী ওয়াজ লুকিং লাইক এ প্রিনসেস, অর টু পুট ইট মোর প্রপারলি, লাইক এ গডেস। এটা মানবে তো ?'

প্রদ্যোৎ তাঁর বলার ধরন দেখে হেসে ফেলল।

বিদ্যুৎদা বললেন—'তারপর খাওয়া-দাওয়া শুরু হতেই দেখলাম মেয়েটি নিজেও দারুণ সাজগোজ করে মানে ওইরকম রাজ কন্যা-টন্যারই মতো সেজে গুজে তদারকি করে বেড়াচ্ছে। অ্যামে—জিং।'

প্রদ্যোৎ বলল—'তবু তো আপনি বাসর জাগলেন না। থাকলে দেখতে পেতেন ও একাই গান গেয়ে বাসর মাত্‌ করে রেখেছিল। অন্য অনেকেই গেয়েছে। অপুর বেশির ভাগ বন্ধুই গান-টান গায়। কিন্তু মূল গায়েন ওই দীপালিই।'

—'এর পরেও আবার গান জানে নাকি ?'

—'গান জানে মানে ? রেডিওয় রেগুলার গায়। প্রতি বছর প্রয়াগের পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রী পাশ করাচ্ছে।'

—'ওরে বা বা !'

—'প্রথমেই বলে রাখি বিদ্যুৎদা ওরা পাঁচ বোন। বাবা নেই। ভাই নেই। পাঁচজনেই অসাধারণ গুণী। প্রত্যেকে কিছু না কিছু করে সংসারটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। গৃহকর্ম, রান্না এসবেতেও ওরা ওস্তাদ। অপুর আইবুড়ো ভাতে নিজে রান্না করল, মাকে সরিয়ে দিয়ে। যা রেঁধেছিল না !'

—'একি দ্রৌপদী-টদি নাকি ?'

—'পঞ্চস্বামীর ব্যাপারটা বাদে। বিয়ে করলে আপনি পঞ্চ শ্যালিকা, না ও-ও তো পাঁচ জনের মধ্যে, বিয়ে করলে আপনি পঞ্চরসিকা পাবেন। আর দীপালি নিজে যে একাই একশ এতো আপনি নিজের চোখেই দেখেছেন।'

বিদ্যুৎ সরকার বললেন—'বলছো !'

—'বলছি। তবে ওরা কিন্তু ব্রাহ্মণ। মিশ্র।'

—'ওরে বাব্বা, ছোবল দেবে নাকি ?'

—'সে আপনার ভাগ্য। দেখুন কারা ছোবল দেয়। আপনাদের দিক থেকেও তো ছোবল আসতে পারে, বিদ্যুৎদা ! আলাপ করিয়ে দেবো ?'

—'দাও।'

—'এক কাজ করুন, অপু কদিন পর অষ্টমঙ্গলা না কিসে আসবে। ওর বন্ধুরাও বোধহয় সে সময়ে ওর বরের সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে এসে পড়বে। আপনিও আসুন। খুব সহজে আমাদের কাজ হয়ে যাবে।'

বিদ্যুৎকান্তি ভারী লজ্জা পেয়ে গেলেন, বললেন, —'ধুর, বড্ড মেয়েলি হয়ে যাবে ব্যাপারটা।'

—'কি ভাবে তাহলে ছেলেলি করবেন ব্যাপারটা ? আপনিই সাজেস্ট করুন।'

—'ইজ শী গুড ?'

—'এই তো মুশকিল করলেন বিদ্যুৎদা ! আমি কি করে জানবো ?'

—'তু তুমি বুঝি মেয়ে-টেয়েতে ইন্টারেস্টেড নও ?'

—'আমি এখনও খুব ছেলেমানুষ, বুঝতে পারছেন না ! গাল টিপলে দুধ বেরোয়। কিন্তু আপনাকে তো বেশ ভালোমত আহত মনে হচ্ছে। একটা ব্যবস্থা করতেই হয় !'

বিদ্যুৎ চিন্তিত স্বরে বললেন—'তুমি তো জানোই প্রদ্যোৎ আই অ্যাম ভেরি মাচ ইন নীড অফ এ কমপ্যানিয়ন। বাবা মা দেশে থাকেন, কোনও দিন জমি-জমা আর ভিটের মায়া ছেড়ে এ দেশে আসবেন না। আর আমি কোথায় যাবো, কী করব, কোথায় প্র্যাকটিস আরম্ভ করব—কিচ্ছুরই ঠিক নেই। আই নীড সামবডি। স্বীকার করছি মেয়েটিকে আমার ভালো লেগেছে।'

অষ্টমঙ্গলায় বিদ্যুৎকান্তি কিন্তু এলেন না। অপুকে সব কথা খুলে বলতে অপালাই বলল—'দাঁড়া, আমি দীপুদির মন বুঝি।' সে জানে দীপালির মধ্যে অনেক জটিলতা যা তার সুন্দর, নিভাঁজ, নেপালি মুখে ছায়ামাত্র ফেলে না।

কিন্তু অপালা জানে দীপালি এক সময়ে সোহমকে পাগলের মতো ভালো বেসেছিল। তাকে পাবার জন্যে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর সম্পর্কে অনেক উল্টোপাল্টা কথা সোহমকে বলেছিল। অপালার কাছে অবশ্য সে ভাব দেখায় যে মিতুলের সম্পর্কে সোহমের মনোভাবের কথা না জেনেই সে তথ্যগুলো এমনি এমনি কথায় কথায় বলে ফেলেছে। কিন্তু অপালা এ ক'দিনে অনেক পরিণত হয়ে উঠেছে। এখন তার সন্দেহ যে দীপালি খানিকটা জেনে শুনেই ইচ্ছাকৃতভাবে সোহমের মন বিষিয়ে দিতে চেয়েছিল। দীপুদির সম্পর্কে এ কথা ভাবতে তার খুব খারাপ লাগে, কিন্তু সত্য যা তাকে তো স্বীকার করতেই হবে। সেই দীপালিই যখন দেখল তার কৃতকর্মের ফলে সোহম বিকারগ্রস্ত উন্মাদ হয়ে গেল, তখন সে ভয়ে আধমরা হয়ে গেল। এখন সোহম আবার ভালো হয়ে গেছে, খুব সম্ভব বিকারের সময়কার কথা তার মনে নেই। কিন্তু দীপালির কথাগুলোই যে তাকে ওরকম উত্তেজিত করেছিল, এ কথা হয়ত সোহম ভুলবে না।

দীপালি অপালাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—'কিরে অপু ? খুব তো বিয়ে করব না, করব না, বলছিলি। এখন কেমন লাগছে ?'

অপালা নিজের ভেতরের কথা পুরোপুরি খুলে সবাইকে বলতে পাবে না, চায়ও না। সে একটু হেসে বলল—'ভালো মন্দ মিশিয়ে।'

—'ইস্‌স্‌ মুখের চেহারাই পাল্টে গেছে, তোর বর তো খালি এদিক-ওদিক খুঁজছে তোকে ! খুব স্ত্রৈণ হবে দেখিস ! একেবারে আঁচলে বাঁধা।'

অপালা বলল—'দীপুদি, তুই বিয়ে করবি ?'

—'আমাকে কে বিয়ে করবে বল ?' দীপালি হতাশ গলায় বলল—'আমি ছাত্রী শেখাবো, দুই বোনে মিলে নৃত্যনাট্যের কোরিওগ্রাফি তৈরি করব, তারপর একদিন পট করে হার্ট অ্যাটাক হয়ে মরে যাবো বাবার মতো।'

—'তোর আত্মবিশ্বাস এতো কম কেন রে দীপুদি ! নিজেকে অত ছোটই বা মনে করিস কেন ? তোর মতো সুন্দর, সর্বগুণসম্পন্ন মেয়ে আর কটা আছে ? আমি তো দেখি না। আমার মতো কালিন্দীর এক কথায় বিয়ে হয়ে যেতে পারে, আর তোর হবে না ?'

দীপালি বলল—'বিয়ে হয়ে তুই খুব উদার হয়ে গেছিস অপু। এসব কথা তো আগে কখনও তোর মুখে শুনিনি !'

অপালা বলল—'কি জানি, বলি নি হয়তো, কিন্তু মনের অতলে ছিলই। সব কথা সব সময়ে আমি বলতে পারি না। আচ্ছা দীপুদি, এখনও তুই সোহমকে ভালোবাসিস ? সোহম তো একদম ভালো হয়ে গেছে।'

—'ওরে বাবা, সোহম চক্রবর্তীকে নমস্কার। সোহম যদি বাঁদিকের ফুটপাথ দিয়ে যায়, আমি তাহলে ডান দিকে যাবো ভাই। ভালোবাসা ? ভালোবাসা ডকে উঠেছে। সোহমের সে মূর্তি তো তুই দেখিসনি !'

অপালা বলল—'তুই-ই কি দেখেছিস ? শুনেছিস শুধু।'

দীপালি বলল—'দ্যাটস এনাফ। গড ফরবিড। সোহম যেন কখনও আমার দিকে না আসে।'

অপালা বলল—'একজন তোর সঙ্গে আলাপ করতে চাইছে, তোকে খুব

পছন্দ, আলাপ করবি ?'

দীপালি চকিত হয়ে বলল—'কে ?'

—'ডাঃ বিদ্যুৎকান্তি সরকার এম. ডি. দাদার একজন সিনিয়র বন্ধু। আমার বিয়েতে কদিনই ওঁকে দেখেছিস।'

—'কালোমতো ? বেঁটে ?'

—'কালো, হ্যাঁ। কিন্তু বেঁটে কেন হবে ? বাঙালির অ্যাভারেজ হাইট। স্বাস্থ্য খুব ভালো। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলেন। শিগগিরই বাইরে চলে যাবেন।'

দীপালি একটু ভাবল, বলল—'ঠিক আছে, আলাপ করিয়ে দে।'

কাউকে একথা বলেনি, কিন্তু দীপালির ইদানীং পছন্দ ছিল প্রদ্যোৎকে। প্রদ্যোতের সহানুভূতিশীল ব্যবহার। তার খানিকটা উদাসীন চরিত্র। স্পষ্টবাক, প্র্যাকটিক্যাল ব্যক্তিত্ব, তার পুরুষালি চেহারা—এসবই দীপালির মন কেড়েছিল। সোহমের পর। সোহমের ক্ষেত্রে আবার সোহমের চেয়েও ভালো লেগেছিল তার বাড়ি, তার সম্পদ, সচ্ছল জীবনযাত্রা। সোহমের দুঘরের স্যুইটটা দীপালির ভীষণ পছন্দ ছিল। আর পছন্দ ছিল দক্ষিণের ওই ঝুলবারান্দাটা। ওইখানে তারা দুজনে বসে গল্প করবে, চা বা কফি খাবে, রাস্তা দেখবে, মানুষ জনের চলাচল দেখবে। কিন্তু অপালাদের সংসারের চেহারা তার একদম পছন্দ হয় না। অপুর মা অবশ্য খুব ভালো। কিন্তু এই বাড়ির সঙ্গে তাদের বাড়ির তো কোনও তফাত নেই। প্রায় একই রকম। তফাত এই, তাদের ভাঙা রঙ চটা বাড়িটা ভাড়া, অপুদেরটা নিজেদের। জ্যাঠামশাইয়ের অংশটা বেশ সাজানো-গোছানো। কিন্তু বুড়ো মহা ধড়িবাজ তার ওপর সেকেলে। কিভাবে অপুর মাকে খাটায়! প্রদ্যোৎ আর অপুর ওপরও একচ্ছত্র অধিকার স্থাপন করে রেখেছে। এই পরিবেশকে দীপালি পাল্টে দিতে পারত যদি ওই জ্যাঠামশাইটি না থাকতেন। বাবা মারা যাবার পর পুরুষ কর্তৃত্বহীন সংসারে তারা পাঁচ বোন আর মা অনেক লড়াই করে হলেও স্বাধীনভাবে বাস করেন। জেঠু-টেঠু আর এখন সহ্য হবে না। বিদ্যুৎকান্তির প্লাস পয়েন্ট তার বাবা মা সুদূর বাংলাদেশে থাকেন। কোনদিন আসতে চান না। একদম একার সংসার। এবং এটাও স্পষ্ট যে বিদ্যুৎ ডাক্তার উন্নতি করবেই। এখনই স্কুটার কিনেছে, ভবিষ্যতে আরও কত হবে!

অপালার বিয়ের তিনমাসের মধ্যে দীপালির বিয়ে হয়ে গেল বিদ্যুৎকান্তি সরকারের সঙ্গে। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। ন্যূনতম খরচ। বিদ্যুৎ দুপক্ষের সবাইকেই একদিন আপ্যায়ন করলেন। বিদ্যুৎকান্তির বাবা মা যাঁরা এখনও খুলনা ফুলতলা গ্রামের ভিটে আঁকড়ে পড়ে আছেন তাঁরা আসতে পারলেন না। তবে চিঠিতে জানালেন বিদ্যুৎ ছোটজাতের মেয়ে বিবাহ না করিয়া উঁচু জাতের মেয়ে বিবাহ করিয়াছে অতএব তাঁহাদের আপত্তি নাই। তবে প্রতিলোম বিবাহ সম্পর্কে একটু সাবধান। নবদম্পতিকে তাঁহারা সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করিতেছেন। যুগলের রঙিন ফটো দেখিয়া তাঁহারা যারপরনাই আনন্দিত। বংশে একটি প্রকৃত গৌরবর্ণ বধূ আসিল।

কয়েকমাসের মধ্যেই দম্পতি লন্ডনে চলে গেল। এবং সেখান থেকে অনতি বিলম্বে অপালা দীপালির একটি উচ্ছ্বসিত চিঠি পেল।

প্রিয় অপু,

আমার তোকে প্রিয়তমা অপু বলে সম্বোধন করতে ইচ্ছে করছে। তুই আমার জন্যে যা করেছিস তার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারবো না। আমার বর যে আমাকে কী চোখে দেখে তোকে বলে বোঝাতে পারব না। আমি যাই করি তাই ওর কাছে আশ্চর্য। এতো প্রশংসা আমি কখনও কারো কাছ থেকে পাইনি। আর এ দেশে এসে যে কী ভালো লাগছে তা-ও ভাষায় বোঝাতে পারব না। ও সারাদিন ব্যস্ত থাকে। কিন্তু আমার অনেক কাজ থাকে। চমৎকার সময় কেটে যায়। ভাবছি একটা গান শেখাবার স্কুল খুলব। সাহেবগুলোও দেখি আমাকে দেখে বেশ চনমনিয়ে ওঠে। আলাপ করবার জন্যে উশখুশ করে। ব্যাপারটা সত্যি বলতে ভাই, আমার দা-রুণ লাগে। মনে হয় আমীর খাঁর সেই' ঝনন ঝনন পা-এল বা-আ-আ-জে'টা শুনিয়ে দিই। ব্যাটারা ভড়কে যাবে। পায়ের তলায় সটান পড়ে যাবে। এ ব্যাপারগুলোয় বিদ্যুৎ খুব গর্বিত। কিন্তু বোধহয় মাঝে মাঝে একটু ভাবিত হয়ে পড়ে। কালকে একটা পার্টি ছিল। বাঙালিও ছিল, ইংরেজ, ইটালিয়ান, মার্কিনও ছিল। রাতে শুয়ে শুয়ে চুপি চুপি বললে—'দীপু, আমার দীপ আমাকে কখনও ফেলে যাবে না তো!' বোঝ একবার, বাবুর ভয় হয়েছে যদি ওই মার্কিন, ইটালিয়ান, ইংরেজদের ফর্সারিঙ আর হাইট দেখে আমি ওদের সঙ্গে কোনও কারবার করে ফেলি। হায় কপাল অপু! ও তো জানে না দীপালি বা ওর দীপ কি ধরনের পোড়-খাওয়া মেয়ে! মেঘ না চাইতেই জলের মতো এলো বটে আমার জীবনে! কিন্তু এতো বর্ষণ তো আমি স্বপ্নেও আশা করিনি। কলকাতায় খাইনি, এখানে এসে খাস বাংলাদেশের অসাধারণ ইলিশ খাচ্ছি, ভাজা, ডিম, কালো জিরে কাঁচা লঙ্কার পাতলা ঝোল, পাতুড়ি, আর কত বলবো? আমরা কেন্ট বলে একটা জায়গায় থাকি। গাড়ি ছাড়া গতি নেই। আমিও শিখছি। শিখে গেলে, লাইসেন্স পেয়ে গেলে আমার নিজস্ব একটা গাড়ি হবে অপু। একদম নিজস্ব। ভাবতে পারিস! গান গেয়ে গেয়ে এক সময় ঘেন্না ধরে গেছিল। বিশেষ করে শিখিয়ে শিখিয়ে। কিন্তু এখন বাড়িতে, কোন ভারত-বাংলাদেশী মজলিশে, বা মিশ্রিত পার্টিতে যখন 'সই ভালো করে বিনোদবেণী বাঁধিয়া দে' কিম্বা 'মৈষাল মৈষাল কর বন্ধু রে/ওরে শুকনা নদীর কূলে/মুখখানি শুকাইয়া গ্যাছে, চৈত মাইস্যা ঝামেলে গানগুলো ধরি পার্টি শুধু আমার জন্যেই জমে যায়। ভাটিয়ালিটা গাওয়ার সময় এতগুলো দেশের লোক যখন একসঙ্গে নির্ভুল তালি দেয় তখন তার উন্মাদনাই আলাদা। তুই ঠিকই বুঝেছিস। সঙ্গীত ইজ দি থিং।'

ইতি
তোরই দীপুদি

অপালার চিঠিটা এতো ভালো লাগল। আর দীপুদির সুখ-সৌভাগ্যের আতিশয্যে তার সামান্য অবদান আছে মনে করে এতো আনন্দ হল যে সে অবিলম্বে উত্তর দিল চিঠিটার। দীপালির চিঠিও পরের ডাকেই। এ মাসে যদি একটা চিঠি-বিনিময় হয়, তোঁ দ্বিতীয় মাসেই আবার একটা। শিবনাথের পোর্ট-ফোলিওয় খুঁজলেই দু একটা এয়ার লেটার পাওয়া যাবে। দীপালির চিঠি

পেয়ে অপালা যখন হন্তদন্ত হয়ে বলে—'শুনছো, আমাকে একটা এয়ার-লেটার এনে দাও না।' শিবনাথ চোখ বুজিয়ে চা খেতে খেতে বলে—'এখন তো পোস্ট অফিস বন্ধ হয়ে গেছে।' অপালা বলে—'আহা, আজকে আনতে বলছি নাকি ? কাল এনে দিও।'

শিবনাথ জানলার দিকে তাকিয়ে বলে 'কালকে তো আমার পোস্ট অফিস যাবার সুবিধে হবে না।' 'তোমাকে নিজেকে যেতে হবে কেন ? তোমাদের পিওন, বেয়ারা এসব নেই ?' তখন শিবনাথ নির্লিপ্ত হয়ে বলবে—'বাড়িতেই ক্লাস ফোর স্টাফের আচরণ দেখছ আর সরকারি অফিসের পিওনকে ব্যক্তিগত কাজে পাঠাতে বলছো ? কিছুই জানো না অপু!' তখন অপালা হতাশ হয়ে বলবে—'ঠিক আছে, কাল আমিই বেরিয়ে আনব, এখন।' শিবনাথের ততক্ষণে চা শেষ হয়েছে, সে বলবে—'পোর্টফোলিওটা একটু এগিয়ে দাও তো। টিফিন-বাক্সটা বার করে দিই।' অপালা পোর্টফোলিওটা এগিয়ে দেবে খুলে টিফিন বাক্সটা বার করে দেবে শিবনাথ। তারপরে হঠাৎ বলবে—'আরে এই তো একটা চিঠির কাগজ রয়েছে। দেখি তো ইনল্যান্ড, না এয়ার! আরে এয়ার-লেটারই তো দেখছি। কোথা থেকে এলো বলো তো! আমার তো কোনও সাহেব বা মেমসাহেব বন্ধু নেই! অপু তুমি তো দেখছি ম্যাজিক জানো!' তখন দুজনেই হাসতে থাকবে।

মনীষার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। তার বাবা বদলি হয়ে গেছেন, একটা চিঠি দিয়েছিল, তাতে ঠিকানা দিতে ভুলেছে। সুতরাং মনীষার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। সোহম একদম বেপাত্তা। রামেশ্বরজীর বাড়ি গিয়েও সব সময়েও মিতুলের সঙ্গে দেখা হয় না অপুর। আর মিতুল তো ঠিক তার বন্ধু নয়। ছোট অনেক। বয়সের হিসেব ধরতে গেলে হয়ত তফাতটা খুব বেশি নয়। কিন্তু সে এক বিবাহিত রমণী যাকে মাথায় আধঘোমটা দিয়ে নিত্য শ্বশুরবাড়ির কিছু-না কিছু কৃত্য করতে হয়। একটু তটস্থ হয়েই। একটি পুরুষমানুষের মনোরঞ্জন করতে হয়, সে বেশ পরিণত গায়িকাও। এদিকে মিতুল স্কুল থেকে এখন সবে কলেজে। তার বন্ধুর শেষ নেই। যদি বা কোনদিন অপালার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, সে হুড়হুড় করে এক গঙ্গা কথা বলে যাবে। বা কোনদিন একটু স্থির হয়ে বসে কোনও বিশেষ গানের শক্ত অংশগুলো অপুর সাহায্যে গলায় তুলবে। হয়ে গেলে বলবে—'ওহ, ইউ আর গ্রেট অপুদি, রিয়্যাল গ্রেট।'

দীপালির চিঠি, সুখে-আনন্দে-ভরা চিঠি অপালার কাছে খুব প্রত্যাশা ও আগ্রহের জিনিস। সে নিজেকে এভাবে প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু দীপালি যখন প্রকাশ করে তখন পূর্ণভাবে উপভোগ করে।

অপু রে, দীপালি লেখে,

এখন নিজেই গাড়ি চালাচ্ছি। এখানকার বাংলাদেশি পাকিস্তানী আর ইন্ডিয়ান মাগুলো তাদের খুদেগুলোকে পাঠাতে শুরু করেছে। বেশ হাই ফিজ করেছি, বুঝলি। ডাক্তারটা বাগড়া দিচ্ছিল। তার নাকি মানে লাগে। এক দাবড়ানি দিয়েছি। গলার কসরত করব, সময় দেবো, জিভে পাথরের নুড়ি রেখে উচ্চারণ শেখাবো আর ফিজ নেবো না! ইল্লি নাকি ? আই অ্যাম

অ্যাবসল্যুটলি প্রোফেশন্যাল। এদেশের লোকগুলোও ঠিক তাই। সব কিছুতেই ফেলো কড়ি, মাখো তেল' খালি আমার বিদ্যুৎকান্তিই লজ্জায় বেগনি হয়ে যাচ্ছেন। যাই হোক আমার পেশাদারির সাবান ঘষে ঘষে বেগুনি বর্ণকে স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণে নিয়ে এসেছি। সাহেবগুলোও ইন্ডিয়ান ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক শিখতে আসছে। এক এক জন মেম সাহেবের গলা কি মাইরি, আ বলতে বললে, বলে 'হ্যাঁ', এমনি বাজখাঁই যে ফৈয়জ খাঁকে হার মানায়। অদূর ভবিষ্যতে রবিশংকর হয়ে যাবো আশা করছি। তখন প্রধান মন্ত্রী-টন্ত্রী মারা গেলে আমাকে এখান থেকে ভজন গাইতে নিয়ে যাবে। তোরা থাকতে। দেখিস ভবিষ্যদ্বাণী করে দিচ্ছি। এক লম্বা চুল, বড় বড় ঘোড়ার মতো হলদে-দাঁত ছোকরার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আইরিশ। একদম নীল চোখ। সোনালি গোঁফ দাড়ি চুল। প্রত্যেকবার গান শিখে উঠে যাবার সময়ে আমার হাতে চুমো খেয়ে যায়। ডাক্তারসাহেব একদিন দেখে ফেলেছিল, সেই থেকে রঙটা ফর্সা হতে শুরু করেছে। এতো ফ্যাকাশে হয়েছে যে কী বলবো! তোদের সবাইকে খুব মিস করি। আনন্দ ভাগ করে নিলে বাড়ে। হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। কি যে একটা 'রুহ্ গৌরাঙ্গ ভজ গৌরাঙ্গ' সরকারি অফিসারকে বিয়ে করলি! বিদেশে আসার চান্স্ রইল না। বিয়ে করতে হয় ডাক্তার, নয় এঞ্জিনিয়ার, নয় মার্চেন্ট অফিসের অফিসার। চিঠিটা যেন আবার শিবসদাগরকে দেখাসনি। হয়ত তোর লাইফ হেল করে দেবে। আজ আসি—দীপুদি।

॥ ১২ ॥

রেডিওর জন্য যেদিন অপালার প্রথম রেকর্ডিং হল, সঙ্গে রামেশ্বর গিয়েছিলেন। তাছাড়াও ছিল বেণু, রামেশ্বর অপালা উভয়েরই বশংবদ, উঠতি তবলিয়া। রেকর্ডিং-এর সময়ে অপালা অন্তঃসত্ত্বা। যদিও ভালো করে মেয়েলি চোখে লক্ষ না করলে বোঝা যায় না। তার মাস্টারমশাইয়ের জানার কথা নয়। সে ইমন-কল্যাণে খেয়াল গাইল। রামেশ্বরের মুখ বিষণ্ন হয়ে যাচ্ছে, তিনি সেই ক্রমাগত ঊর্ধ্বারোহী, সতেজ তরুটিকে পাচ্ছেন না। এ যেন এক নতশাখ বৃক্ষ। জলের অভাবে, সূর্যালোকের অভাবে বিবর্ণ, ক্লান্ত, হতশ্বাস। ফেরবার সময়ে অপালা বলল—'মাস্টারমশাই গান ভালো হয়নি, না?'

—'তুমি গেয়ে আনন্দ পেয়েছো তো?' রামেশ্বর প্রশ্নের সোজা জবাব এড়াতে চাইলেন। সত্যি কথা বলতে কি রামেশ্বরের বাড়ি সপ্তাহে দুদিন আসে অপালা, সেই দুদিনই তার যথার্থ রেওয়াজ হয়। বাকি পাঁচটা দিন বোধহয় তার গানের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না।

মাস্টারমশাইয়ের প্রশ্নের জবাবে অপালা বলল—'আমার বড্ড দমের অসুবিধে হচ্ছিল।'

—'সে কি?' অপালার মুখ আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠছে। রামেশ্বর এইবার তার দিকে ভালো করে তাকালেন। মনে মনে বললেন—'তাই বলো!'

মুখে বললেন—'তোমার শ্রেষ্ঠ গানগুলির মধ্যে নয়। কিন্তু যথাযথ।

পরিপূর্ণ। তোমার গানে একটা উপচে পড়া ভাব থাকে মা, যেন যা দেবার তার চেয়ে অনেক বেশি দিচ্ছো। সেই ভাবটা পেলাম না আজ। কিছুদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। শরীরটা তো ঠিক থাকা দরকার!'

শিবনাথ বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছিল ফেরবার সময়ে। সে হাত ধরে অপালাকে নামাল। বেণু, তানপুরো পৌঁছে দিল।

এর তিনদিন পর অতি-অকালে অপালা তার প্রথম সন্তানের জন্ম দিল। মাত্র দেড় কেজি ওজন। অনেকটা লম্বা। কিন্তু একদম হাড়ের ওপর চামড়া জড়ানো। তারপর ব্রহ্মতালুর কাছটা একটু বেশিই তলতল করছে।

ডাক্তার বললেন—'ওকে তুলোর মধ্যে শুইয়ে রাখা দরকার। একদম নাড়াচাড়া করা বারণ। মাতৃদুগ্ধ ছাড়া কিছু খাবে না। অন্তত মাস দেড়েক। ওর ঘরে কোনও বাইরের লোক ঢুকবে না। অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে শুধু ওর জামাকাপড় নয়, ওর ধাত্রীদের জামাকাপড়ও ধুতে হবে। অপালা নার্সিং হোম থেকে বাড়ি আসবার পর বাড়ির মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল।

পিসিমা বললেন—'আমি তখনই বলেছিলুম ভরা পোয়াতি। ওভাবে কালোয়াতি গাইতে না গেলেই কি হত না? কালোয়াতি গানের কসরত কতো! এ তো এক রকমের কুস্তি! আমাদের ছেলেবেলায় শুনতুম গোবরবাবু কুস্তিগীর, গামা পালোয়ান। এও তো গলার কুস্তি একরকম। অনেকে দেখেছি সামনে শতরঞ্জি গালচে যা পায় প্রাণপণে খিমচে ধরে গাইবার সময়ে। অনেকে আবার এ হাত দিয়ে ঘুড়ির সুতো ছাড়ছে, ও হাত দিয়ে সুতো টানছে। বউমা অবশ্য আমাদের শান্ত-দান্ত হয়েই গায়। মানুষটিও তো জলের মতন। কিন্তু যতই ঠাণ্ডা হোক, ভেতরে তো প্যাঁচ পোঁচ কষতেই হয়, শুধু শুধু কি আর গলা দিয়ে অমন ধমক ধামক বেরোয়!'

শাশুড়ি বললেন—'বংশের প্রথম ছেলে। কুলপ্রদীপ। এখন বাঁচলে হয়!'

তিনি এখন নাতির ভালো মন্দ ছাড়া আর কিচ্ছু ভাবতে পারছেন না। কোনদিকে তাকাতে পারছেন না। বাচ্চাটাকে তুলোর চুষি করে করে মায়ের পাম্প করে বার করে নেওয়া দুধ খাওয়াতে হয়, তার নিজের টানবার ক্ষমতা নেই। গায়ে যতটা সম্ভব হাত কম লাগিয়ে তার পোশাক বদলানো, স্পঞ্জ করা, এসব তিনি ছাড়া আর কেউ পারে না। অপালার ডিউটি শুধু বাচ্চার জামা-কাপড়, শাশুড়ির এবং নিজের জামাকাপড় সাবান ও অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে ধোয়া। শাশুড়ি তার ছেলেকে সামলান। সে অসহায় চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

অফিসে যাবার আগে শিবনাথ ডাকে—'অপু, একবার শুনে তাও।' ক্লান্ত শরীর টেনে টেনে ঘরে যায় অপালা। শিবনাথ পোর্টফোলিওর ভেতর থেকে একটা কৌটো খুলে দুটি পরিষ্কার ঝকঝকে ডিম বার করে। টুক করে ফাটিয়ে বলে—'হাঁ করো দেখি', 'কাঁচা ডিম খাবো?' অপালা মুখ বিকৃত করে। 'একদম কাঁচা খাবে। আমার এক কলিগের নিজস্ব পোলট্রির লেগহর্নের ডিম। একদম বিশুদ্ধ।' দুটো ডিম তাকে এইভাবে খাওয়ায় শিবনাথ। অপালা বলে—'পিসিমা জানলে মূর্ছা যাবেন কিন্তু।'

—'আপাতত তুমি মূর্ছা না গেলেই হল আমার। এগুলো ভীষণ পুষ্টিকর।

পিসিমার জানবার কোনও দরকার নেই। খোলাগুলো এখান থেকে অনেক দূরে কোনও ম্লেচ্ছ রাস্তায় ফেলে দেওয়া হবে।' সন্ধেবেলাতেও তার ব্যাগ থেকে আঙুর বেদানা খেজুর বাদাম পেস্তা ইত্যাদি বেরোয়। শিবনাথ অপালার সমস্ত আপত্তি উড়িয়ে দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে এগুলো তাকে খাওয়ায়।

প্রচণ্ড খিদে এখন অপালার। কিন্তু শাশুড়ি এখন নাতিকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। ছেলে এরকম অস্বাভাবিক হওয়ার দরুন সে মায়ের কাছেও যেতে পারেনি। পিসশাশুড়ি বালবিধবা। কোনদিন সন্তান ধারণ করেন নি। অতশত জানেন না। তিনি শুধু জানেন নতুন মাকে খুব কষে ঘি আর দুধ সাগু খাওয়াতে হয়। জেঠুর শরীর খুব খারাপ। মাকে একমিনিটের জন্যেও চোখের আড়াল করতে চান না। এদিকে প্রদ্যোৎ ইউসিস-এ কি পরীক্ষা দিয়ে আমেরিকা চলে গেছে। ব্রংক্‌স্-এর কোন হসপিট্যালে এখন সে ইনটার্নি। দাদা না থাকায় সে খুব অসহায় বোধ করে। ছোট্ট এই মাংসপিণ্ডটা বাঁচবে তো? ঠিক মতন হাত-পা-মস্তিষ্ক নিয়ে? মানুষের মতো হয়ে উঠবে তো? তারই জন্যে এরকম হল সত্যি সত্যি? প্রদ্যোৎ থাকলে বলতে পারত। বিদ্যুৎদা থাকলেও বলতে পারতেন। মমতামাখা চোখে সে ছোট্ট জীবটার দিকে তাকিয়ে থাকে। কী লোমশ! বাঁদরের বাচ্চার সঙ্গে কোনও তফাতই নেই। তবু তার চোখ পিট পিট করে তাকানো, চিঁচিঁ করে কাঁদা আর যখন তখন বুড়ো পুতুলের মতো হাত পা সব খিঁচে তুলে আড়মোড়া ভাঙা দেখলে তার বুকের ভেতরটা কেমন আনচান করতে থাকে। সে সন্তর্পণে ছেলের নাম রাখে হিন্দোল। অবশ্যই সে নাম টেঁকে না। ঠাকুর্দাদা নাতির ঘোরঘটার অন্নপ্রাশনে ঘোষণা করেন জীবনের প্রথম যুদ্ধে ও জয়ী হয়েছে খুব শক্ত খেলায়। পরবর্তীকালেও হবে। ও রণজয়।

রণজয় যখন দুরন্ত দুবছরের শিশু, পরিবারের এবং ডাক্তারবর্গের সমস্ত ভয়-ভাবনা মিথ্যে প্রমাণিত করে সমস্ত জানলা, ঠাস ঠাস করে খুলছে আর বন্ধ করছে, সমস্ত রেলিং বেয়ে উঠছে, আর নামছে, আলমারি হাঁটকাচ্ছে, কাচের এবং মাটির জিনিস ভাঙছে এবং রান্নাঘরের বাসন-কোসন তছনছ করছে তখন দু বছর পর পর অপালার দুটি কন্যা জন্মাল। সকলেই বলাবলি করতে লাগল তিন ভাই বোনের একটিও মায়ের মতো কালো হয়নি। এবার আর অপালা নিজে নামকরণের ঝামেলায় গেল না। বড় মেয়েকে সবাই ডাকে টিটু, ছোটকে বনি। ছোটটি একদম বাবা বসানো। ওইরকম গোলগাল, ধবধবে ফর্সা, কুচকুচে কালো মাথা ভর্তি চুল, কুটি কুটি দাঁত। আর বড়টি তার নিজের মতো। নতুন শিশু জন্মাবার পর এবং ক্রমাগত বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ এবং পরিবারের নিয়মই হল মাঝে মাঝে শিশুর চেহারা এবং প্রকৃতির বিশ্লেষণ করা বেশ করে গালে হাত দিয়ে। টিটু হাসল, পিসিমা বা পিসিদিদা বলে উঠলেন—'দেখলি অবিকল মনু হাসল', মনু অর্থে টিটুর দাদু। টিটুর দিদা বলেন—'কি যে বলেন দিদি তার ঠিক নেই, ও হাসি শিবুর আর কারো নয়। টিটু কাঁদল, পাশের বাড়ির গিন্নি এ বাড়ির গিন্নির সঙ্গে যাঁর খুব ভাব গলা বাড়িয়ে বললেন—'অ পারুল পারুল কে কাঁদছে গো? তোমার বড় নাতনি? আমি বলি তোমার খুকি আমার মলিরাণী যাকে কবেই বিয়ে করে পার করে

দিয়েছো সে-ই আজ কত বছর পরে তোমার ঘরে এসে কাঁদছে। অবিকল সেই আওয়াজ!' টিটুর পায়ের গড়ন নাকি অবিকল তার দিদিমার মতো। অমনি চ্যাটালো। লম্বা লম্বা আঙুল। আর চুল? চুলগুলো হচ্ছে মায়ের মতো একটু লালচে, লালচে, হাজার তেল দাও কুচকুচে কালো হবে না। বনির মতো কোঁকড়াও হয়নি। ঝাঁটার কাঠির মতো না হলেও সোজা-সোজা। আর চোখ মুখ? সবাই দিশেহারা হয়ে যান। এরকম গোল গোল চোখ, লম্বা পাতলা নাক, এত সংক্ষিপ্ত ভুরু, ছোট্ট ঠোঁটজোড়া এসব ও কোথা থেকে পাচ্ছে? সকলেই বলেন—'আরে ওকে বড় হতে দাও। বাচ্চা কতবার বদলায়। এই দেখবে বাপের মতো, ওই দেখবে মায়ের আদল—এমনি করতে করতে ঠিক বংশের ধারা পেয়ে যাবে।' বনি যেমন হাসি খুশী, যাকে বলে 'জলি' বাচ্চা, রণজয় যেমন দুরন্ত, টিটু তেমন নয়। সে একটু গম্ভীর-গাম্ভার। পাতলা-চেহারা। কেউ যদি তাকে নানা কসরত করে হাসাতে গিয়ে ব্যর্থ হয় এবং বলে 'রামগরুড়ের ছানা', হঠাৎ তখন সবাইকে অবাক করে দিয়ে বাচ্চা টিটু বলবে 'হাছব না না না না'। তার মুখে তখন একটু হাসি একটু বিরক্তি। আসলে সে কোনও ছবিবহুল বই দেখছিল, কিম্বা জিগস' পাজ্‌ল্ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। কিম্বা পাতার ওপর পেন্সিল দিয়ে প্রাণপণে 'গউ' অর্থাৎ গরু আঁকবার চেষ্টা করছিল। এই সমস্ত সময়ে বড়দের এই সব ইয়ার্কি, নানারকম মুখভঙ্গি করে হাসাবার চেষ্টা, হঠাৎ কোলে তুলে হামি এবং অব্যর্থভাবে কিছু লালা মাখিয়ে দেওয়া তার ঘোরতর অপছন্দ। সুতরাং বনিকে সবাই ভালোবাসে, রণোকে সবাই প্রশ্রয় দেয়, কিন্তু টিটুর সম্পর্কে সবাই বলে ওটা সৃষ্টি ছাড়া। একটু বড় হতে মা ছড়ার গান শোনায়, গান করাবার চেষ্টা করে দুই মেয়েকেই, বনি আধো আধো গলায় গেয়ে ওঠে লয় তাল ছাড়া 'যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনা লীলাবতী।' টিটু খুব সুরেলা গলায় হাতে তাল দিয়ে গায় 'যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে' বলেই তালি থামিয়ে, গান থামিয়ে টিটু জিজ্ঞেস করবে—'মা কাজিতলা কী!' মা বলতে পারবে না। টিটু তখন গোঁ ধরবে। কাজিতলা কী না জানলে সে গাইবে না। কেনই বা একটা নাম-না-জানা তলা দিয়ে যমুনাকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে! যমুনা নিমতলা দিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাক না। হায় হায় 'নিমতলা'। শেষ পর্যন্ত 'নিমতলা!' আসলে তাদের বাড়িতে একটা বিশাল নিমগাছ আছে উঠোনের একপাশে। রণো ছুতো পেলেই দু বোনকে পেটে। পিটে ধামসে দেয় একেবারে। হয়ত একটা সামান্য খেলনা কি কাগজ কি অন্য কিছু নিয়ে এই ঝামেলা। ঠাকুমা এসে কোন কিছু শোনার আগেই দুমদাম করে দুই নাতনির পিঠে দু ঘা বসিয়ে দেন। বনি আরও কাঁদতে থাকে, —'আমার কাজক (কাগজ) নিয়ে গেল, আমায় ঠাম্মা মারল, আমায় দাদা মারলো-ও-ও। ও বাবা, ও দাদু আমায় দাদা মারল, আমায় ঠাম্মা মারলো-ও-' পাড়া মাথায় করে সে কচি গলায়। টিটুর চোখে এক ফোঁটা জল নেই। সে *জিভ বার করে ঠাকুমাকে প্রাণপণে ভেংচি কাটে, দাদার দিকে পা তুলে লাথি* দেখায়। সবাই বলে 'ও মা, কী অসভ্য মেয়ে রে বাবা। বাবা অমন শান্ত, মা অমন নম্র, এ মেয়ে কার ধারা পেল?' টিটু তখন তার কচি গলায় ভেংচি কেটে কেটে বলবে 'দাদা এতো অছভ্য, ঠাম্মা এতো অছভ্য, ওলে বাবা এ মেয়ে কাল

ধালা পেল ?' টিটুর সবচেয়ে প্রিয় খেলা বাবা যখন অফিসের ফাইল নিয়ে বসবে, সে-ও তখন টেবিলের ওপর তার ছোট্ট ফাইল নিয়ে উঠে বসবে, তাতে তাড়া তাড়া আজে-বাজে কাগজ। তাতে সে সংখ্যা বসায়, নানারকম শব্দ এবং বাক্য ভুলভাল লেখে। আর ক্রমশই তার শব্দ, বাক্য, সংখ্যা গণনা নির্ভুল হয়ে উঠতে থাকে। তাকে এই কাজটি করতে দাও, টিটুর সাড়া-শব্দ পাবে না। সে বিনা ধস্তাধস্তিতে নাওয়া-খাওয়া সেরে নেবে। বনি তার নাইলনের ডল বুকে করে ঘুরে বেড়ালে, এবং টিটুরটা টিটুকে দিলে অসীম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে টিটু বলবে—'আমি কি মেয়ে যে পুতুল নিয়ে খেলব! আমার অনেক দরকারী কাজ আছে। আমি এখন বাবার অপিসের আর্দালি।' শুনে সবাই হেসে বাঁচে না। তাই বলে টিটু যে ছেলে সাজবার বায়না ধরে তা-ও কিন্তু নয়। সে ফ্রক পরেই থাকে। শীতকালে স্ল্যাকস টিশার্ট পরে, তবুও তাকে ছেলে ছেলে দেখায় না। তার চুল খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়। পিঠের মাঝখান অব্দি সোজা, ঈষৎ লালচে চুল নিয়ে, কানে সোনার মাকড়ি, স্ল্যাকস এবং নীল ডোরা কাটা ফুলহাতা সোয়েটার পরে সে তার ছোট্ট গোলাপি ফাইল বুকে করে ঘুরে বেড়ায়। রণজয় বা বনি, অপালা বা শিবনাথ, মনোহরবাবু ও পারুল দেবী, তাঁদের ছোট ছেলে বিশ্বনাথ তাঁদের বিধবা ননদ করুণা, কিম্বা তাঁদের সঙ্গীতপ্রিয় জ্যেষ্ঠা কন্যা মল্লিকা বা মলির সঙ্গে টিটুর কোথাও কোনও মিল নেই। টিটু এরই মধ্যে কাকা এবং বাবার একটু ন্যাওটা, কাকার হাত ধরে বেড়াতে যেতে তার কোনও আপত্তি নেই। কাকা তাকে কাঁধে তোলে, দু হাত ধরে বাঁই বাঁই করে ঘোরায়, এসবে টিটুর মজা, খিলখিল হাসি। কিম্বা বাবা অপিস থেকে ফিরলেও সে বাবার হাঁটু ধরে ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে সরল কৌতূহলে জিজ্ঞেস করে—'বাবা আজকে কটা অঙ্ক করলে?' তার ধারণা বাবা শুধু অঙ্ক করে। তার বাবার ক্যালকুলেটরটা নিয়ে সে সুযোগ পেলেই টিপে-টুপে দেখে, তবে খুব সাবধানে এবং গোপনে। ঠিক কোন সময়টিতে ড্রয়ারের চাবি খোলা এবং বাবা অনুপস্থিত সে শ্যেন দৃষ্টিতে নজর রাখে। কিন্তু মা হার্মোনিয়াম নিয়ে গানে বসলে এবং বাবা এবং অনেক সময় কাকা সেখানে বসে আহা! আহা!' করতে থাকলেই সে অব্যর্থভাবে সে তল্লাট ছাড়া হয়ে যাবে। রেডিওতে যখন মায়ের গান হয়, তখন সে রেডিওর পাশের ঘরে। অপালা অনেক সময়ে বিষণ্ণ গলায় বলে —'টিটু, তোর মার গান ভালো লাগে না না ?

টিটু প্রথমে জবাব দেয় না, তারপর বলে—'জানি না, যাও!' আরও জোরাজুরি করলে বোঝা যায়—গানটা অত্যন্ত মেয়েলি ব্যাপার বলে সে ধরে নিয়েছে। তাই পুতুল খেলারই মতো গান বাজনার ব্যাপারেও তার প্রচণ্ড অনীহা। সে এখন বাবার অপিসের কাজ করছে।

রণজয় যখন পাঁচ বছরের, টিটু তিন এবং বনি দুই তখন একটা বিশ্রী অঘটন ঘটল। অপালার চতুর্থ সন্তান ছ মাসে নষ্ট হয়ে গেল। অপালা নিজেও প্রায় অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এলো। এবার ডাক্তার বরাবরের মতো জন্মনিরোধের ব্যবস্থা রোগিণীর দেহে করে দিলেন। শিবনাথ ডাক্তারের কাছ থেকে পেশাদারী তিরস্কার শুনল। বাড়িতে তার ছোট ভাই বিশ্বনাথ কিছুদিন ঘৃণায় দাদার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিল। শিবনাথের বাবা একদিন অনেক গলা

খাঁকরে, চটির শব্দ করে, উল্টোপাল্টা কথা বলে বড় ছেলেকে যা বলতে চাইলেন সোজা কথায় তার অর্থ হয়—'সে কি মানুষ ? তাঁদের সময়ে বিজ্ঞান এতো উন্নতি করেনি, তবুও তিনি তিনটিতে তাঁর সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখতে পেরেছেন, আর এতো উচ্চশিক্ষিত হয়ে শিবনাথ...ছি...ছি ভগবান রেখেছেন তাই। কিন্তু বউমা যদি চলে যেত ? তিনটি সন্তান নিয়ে কী করত শিবনাথ !

এবার সেরে ওঠবার জন্য দুই মেয়েকে নিয়ে অপালা তার মায়ের কাছে কীর্তি মিত্র লেনে গেল। জেঠু মারা গেছেন। তাঁর সঞ্চিত অর্থে, এবং পুরো একতলাটা সরকারি অফিসারকে ভাড়া দিয়ে মা এখন যথেষ্ট সচ্ছল এবং স্বাধীন। প্রদ্যোৎ নিউ ইয়র্কেরই হাসপাতালে আছে, মাকে নিয়মিত ডলার পাঠায়। তাঁর একমাত্র অভাব সঙ্গীর। বড় একা। চিরকালই একা, ভেতরে ভেতরে, কিন্তু এখন বাইরেও। কেউ নেই। ছেলে নেই, মেয়ে খুব মাঝে মধ্যে আসে। তেমন আত্মীয় স্বজন বলবার মতো কেউ নেই। নীচের ভাড়াটে ভদ্রলোকের পরিবার অতি সজ্জন। তিনি নিজেও নির্বিরোধ। কাজেই নীচের দেখাশোনার ভরসাতেই তিনি আছেন।

মেয়ে আসাতে তিনি হাতে চাঁদ পেলেন। নাতি আসেনি। নাতিকে তার ঠাম্মা ও দাদু কখনও কাছছাড়া করেন না। কিন্তু নাতনি দুটি তাঁর হাতে স্বর্গ এনে দিল। আর কতদিন পর মেয়েকে এতদিন ধরে, এমন করে কাছে পাওয়া ! সেবা তাঁর স্বভাব। তিনি প্রাণপণে মেয়েকে সেবা করে খাড়া করে তুলেছেন। জামাই প্রায় রোজই অফিস-ফেরত আসে। তাঁর ফরমাশমতো দোকান-বাজার করে দিয়ে যায়। অপালা রাত্রে মার কাছে শুয়ে শুয়ে গল্প করে, বলে 'মা এবার থেকে তোমার কাছে অনেক দিন ধরে আমাকে এমনি করে রেখো। রাখবে তো ?'

—'থাকলে তো হাতে চাঁদ পাই অপু। কিন্তু জামাই কি তোকে ছেড়ে বেশিদিন থাকতে পারবে ?'

—'আমি তো তোমারও, মা।'

—'ওঁরা যদি ছাড়তে রাজি না হন ! এর পর নাতি নাতনিরা স্কুলে যাবে।'

—'ওরা আমার চেয়ে দাদু-ঠাকুমাকে বেশি চেনে, মা, অসুবিধে হবে না।'

—'তোর কি ওখানে... ভালো লাগে না।' ওঁরা কি তোকে মানে তোর সঙ্গে কিছু...' মা কথা শেষ করতে পারেন না।

অপালা বলল 'ওঁরা বেশ ভালো লোক। কিন্তু তুমি নিজেই বলো, নিজের মা আর অন্যের মা কি কখনও একরকম হতে পারে ?'

সুজাতা খুব ভালো করে এ কথা জানেন। তাঁর বিয়ে হয়েছে ষোল পূর্ণ সতেরয়। বাপের বাড়ি কেমন ছিল সে এখন এক সুখস্বপ্ন, কিন্তু স্বপ্নই, যেন সম্পূর্ণ অবাস্তব। বাস্তব হচ্ছে 'খামখেয়ালী, বেহিসেবী, ভালোমানুষ স্বামীর অকস্মাৎ মৃত্যু, ভাসুরের অধীনে সারাটা জীবন ছেলে-মেয়ে-নিজের সমস্ত সুখ-দুঃখ-আহ্লাদের স্বাভাবিক চেহারাকে দমন করে ভয়ে আধমরা হয়ে জীবন-কাটানো। এখন ভাসুর নেই, ছেলে-মেয়েও কাছে নেই। তবু যেন সুজাতা দেবী জীবনে এই প্রথম সুখী। স্বীকার করতে লজ্জা হয় কিন্তু এখন, এতদিনে আর কারো কাছে তাঁর কোনও কৈফিয়ত দেবার নেই, কারো ইচ্ছা বা

সাধ মেটাবার দায় নেই, তাঁর যা-ইচ্ছে করার স্বাধীনতা আছে, তিনি বছরে একবার করে এক একটা দলের সঙ্গে ভারতের একাংশ ঘুরে আসেন। ছেলের চিঠি আসে, মেয়ে মাঝে মাঝে এসে পড়ে, ছোট ছোট শিশুগুলির কলকাকলি। তিনি বেশ আছেন।

ইতিমধ্যে এক দিন স্নান সেরে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে বাথরুম থেকে বেরিয়ে অপালা দেখল বিদ্যুৎদা বসে আছেন। ছ সাতবছর বিদেশে কাটিয়ে, বিদ্যুৎদা এখন খুব চকচকে, সাহেবি ধরনের হয়ে গেছেন। যদিও পরে আছেন টেরিকটনের পায়জামা এবং খাদির কলার তোলা যাকে বলে গুরু পাঞ্জাবি। বিদেশে যাঁরা থাকেন, এদেশের শীত তাঁদের গায়ে লাগে না। সুজাতার গায়ে গরম চাদর। অপালা উলের ব্লাউজ পরে রয়েছে। একে সে রোগা, তার ওপর রক্তাল্পতায় ভুগছে। এখন চান করে উঠে এই বারোটা বেলাতেও তার শীত-শীত করছে, সে তাড়াতাড়ি একটা শাল গায়ে জড়িয়ে বিদ্যুৎদার সামনে এসে বসে পড়ল। ভীষণ খুশি, ভীষণ অবাক। বলল—'কবে এলেন? বেশ তো! জানালেন না কিছু না। আমার বন্ধু কই, তাকে নিয়ে আসেননি কেন? খুব সাহেব হয়েছেন, না?'

বিদ্যুৎদা অপলার দিকে চাইলেন—'আসতে চাইল না তোমার বন্ধু।'

—'ইসস্, আপনি খেপালেই আমি খেপছি আর কি?'

—'সত্যিই, আনবার কোনও উপায় ছিল না অপালা।'

—'তবে কি ইংল্যান্ড থেকে এতদিন পরে একলাই এলেন?'

—'উপায় কী?' বিদ্যুৎদা খুব গম্ভীর।

এবার অপালার শঙ্কিত হবার পালা। দীপালি বিদ্যুৎদাকে খুব একটা পছন্দ করে বিয়ে করেনি। যদিও উচ্ছ্বসিত হয়ে চিঠি লিখেছে বরাবর। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে সে সব বিদ্যুৎদার উচ্ছ্বাস নিয়ে উচ্ছ্বাস। সে যে বিদ্যুৎদাকে ভালোবাসছে এমন কথা দীপুদি কোনদিন লেখেনি। বরং বিদ্যুৎদার কালো রঙ, কম দৈর্ঘ্য এবং মাঝে মাঝে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে গেছে। ও নিজেই লিখেছে ওখানে ওর কি রকম জনপ্রিয়তা। ও যে কোনও পার্টির মধ্যমণি। দীপুদি কিছু ঘটিয়ে বসল না তো! অপালার মুখ এখন এমনিতেই ফ্যাকাশে, সে আরও ফ্যাকাশে হয়ে বলল—'কী হয়েছে বিদ্যুৎদা?'

বিদ্যুৎকান্তি বললেন—'লন্ডনের মতো জায়গা, যেখানে সারা ইয়োরোপ এবং আমেরিকা থেকে লোকে বাচ্চা হতে আসে, সেইখানে আমার এবং অন্যান্য ডাক্তারদের চোখের সামনে তোমার বন্ধু চাইল্ড বেডে মারা গেল, বিশ্বাস করতে পারো?'

অপালা মোড়ায় বসেছিল। সে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। বিদ্যুৎকান্তিই তাকে ধরে ফেললেন। অপালার হাত পা কাঁপছে, বুকের ভেতরটা কেমন করছে, ইদানীং তার এরকম প্রায়ই হয়। ডাক্তার বলছেন রক্তাল্পতার জন্য। তার চেতনার মধ্যে খুব দূরে কিন্তু চড়াসুরে প্রাণপণে ঝালা বাজাচ্ছে কেউ সেতারে, মিড় টানছে লম্বা লম্বা আঙুলে, অপালা রাগ-পহ্চানে হেরে যাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে না এমন অবিমিশ্র-বীভৎস-কারুণ্য কোন রাগে আছে। মা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, তিনি বিদ্যুৎদার সংবাদ শোনেননি। অপালার

অবস্থাটাই দেখছেন। তিনি বললেন—'বিদ্যুৎ অপুর পর পর দুবছর দুটি মেয়ে হয়ে গেল। দু বছর বাদ দিয়ে এবার একটি...'

—'আবারও একটি হয়েছে ? অ্যানাদার ?' —বিদ্যুৎদা ভুরু কুঁচকোলেন।

—'হল আর কই ?' মা জবাব দিলেন।

—'কি অ্যাবর্শন না স্টিল-বর্ন।'

—'নষ্ট হয়ে গেছে বিদ্যুৎ, তারপর থেকে মেয়েটা কিছুতেই সারতে পারছে না।'

বিদ্যুৎ বললেন—'অপালা দেখি একবার নাড়িটা,' একটু পরে বিদ্যুৎ বললেন—'একি ? মাঝে মাঝে বীট মিস হচ্ছে কেন ?'

—'ওটা আমার বরাবরই আছে, বাড়ির ডাক্তারবাবু বলতেন অ্যাথলিটস হার্ট নাকি !'

—'অ্যাথলিটই বটে'— বিদ্যুৎদা একটু হাসবার চেষ্টা করলেন। বললেন আজ তো আমার কাছে কিছু নেই। আরেক দিন যন্ত্রপাতি নিয়ে আসব, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করব তখনই।' অপালা কোনমতে কয়েকটা কথা মুখ দিয়ে বার করেছিল, আব কিছু বলতে পারছে না, অস্বাভাবিক ভারী হয়ে উঠেছে বুক। তারপর ভরা বাদল শুরু হল চোখ দিয়ে। অবিরল ধারে। চোখের ভেতরেও যে এমনি পুরো একটা বর্ষা লুকিয়ে থাকতে পারে, এবং সঠিক ঋতু অনুসারী সুরটা স্পর্শ করলেই এমনি ত্রি-সপ্তকের ছত্রিশটা স্বর ব্যবহার করে বিগলিত হতে পারে ক্রন্দনবিমুখ-স্বভাব অপালা এতদিন জানত না। সে এভাবে কোনদিন কাঁদেনি। তার মুখ-চোখ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে, আওয়াজ বেরিয়ে যাচ্ছে গলা দিয়ে, বেসুরো আওয়াজ। সে প্রাণপণে শালের আঁচল দিয়ে মুখ আড়াল করবার চেষ্টা করে।

বিদ্যুৎদা বললেন—'কাঁদো অপালা কাঁদো। আমি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। বাড়ি করলাম। সে তার পছন্দমতো সাজাল। বাগান করল। প্রত্যেকটি জিনিস তার নিজের উপার্জনের টাকা দিয়ে করা। কালচার্যাল ব্যাপারে লন্ডনেব এশিয়ানদের মধ্যমণি। পাঞ্জাবিগুলোকে শুদ্ধু টপ্পা গেয়ে মাতাল করে দিত। শিখতে আরম্ভ করেছিল ওয়েস্টার্ন পপ-সঙ। তোমাকে ছবির অ্যালবাম দেখাবো অপু। কত অনুষ্ঠান, কত ট্রিবিউট, উই ওয়্যাব সো হ্যাপি, সো সাকসেসফুল। সইল না।'

বিদ্যুৎ উঠে দাঁড়ালেন, পেছনে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে পায়চারি করতে করতে বললেন—'এখন সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে বাচ্চাটা। সে এখনও হসপিট্যালে, ডাক্তার-নার্সদেব কেয়ারে আছে। কিন্তু এভাবে তো আর বেশিদিন চলতে পারে না !'

সুজাতা দেবী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে আছেন। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে বললেন—'ওদের বাড়ি থেকে কী বলছে ? দিদি ? মেয়েরা ?'

—'মা, মানে আমার শাশুড়ি বলছেন গীতালিকে নিয়ে যেতে।'

গীতালি, দীপালির মেজদি। স্কুলের সেলাইয়ের টিচার। বড় আর মেজটি ছাড়া আর সবাইকার বিয়ে হয়ে গেছে। বড়টিই সবচেয়ে শক্ত, ব্যক্তিত্বশালিনী। সে এখন নিজেই একটি প্রাইভেট নার্সিং প্রতিষ্ঠান চালায়।

—'তাই যান না বিদ্যুৎদা, গীতালিদি যদি রাজি থাকে !'

—'গীতালি রাজি আছে অপু। ওরা বোনেরা পরস্পরকে কিভাবে ভালোবাসে জানো তো ! কেউ কারোকে সাহায্য করতে বা স্যাক্রিফাইস করতে পিছপা নয়। কিন্তু আমি কি করে নিয়ে যাই ! সর্বত্র একটা সমাজ আছে। ইংলন্ডেও ভারতীয় সমাজ আছে। এঁরা এখানে লিবার‍্যাল হলে হবে কি ? তা ছাড়াও অপু, গীতালির একটা কেরিয়ার আছে, সে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে আমার ছেলে মানুষ করতে যাবে ? এতোটা স্যাক্রিফাইস আমি কেমন করে মেনে নেবো ? ওর পক্ষেও ব্যাপারটা খুবই হিউমিলিয়েটিং মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

সুজাতা বললেন—'একটা কথা বলব বিদ্যুৎ, কিছু যদি মনে না করো !'

—'কী কথা মাসিমা বলুন, আমি এখন মনে করা-না করার বাইরে। আমার মা-বাবা যদি তাঁদের জেদ ছেড়ে খুলনা থেকে আসতেন ! অনায়াসে আমি তাঁদের নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু সেই স্কুল পার হবার পর তাঁদের কাছ ছাড়া হয়েছি। তাঁদের বোধহয় ছেলে বলে আমার জন্যে আর একটুও সেন্টিমেন্ট অবশিষ্ট নেই। আমার দাদার ফ্যামিলি এবং দেশের জমি-জমা বাস্তু নিয়ে তাঁরা আপাদমস্তক জড়িয়ে আছেন। আমি আমার সমস্যা এসব কিছু না। কিচ্ছু না।'

সুজাতা মৃদু গলায় কিন্তু বেশ জোর দিয়ে বললেন—'তুমি গীতালিকে বিয়ে করে নিয়ে যাও না বিদ্যুৎ ! দীপুর স্বর্গত আত্মা এতেই তৃপ্তি পাবে, আমি বলছি। তার ছেলেটিকে মায়ের মতো দরদ দিয়ে মাসী ছাড়া আর কেউ দেখতেও পারবে না। দীপালিরা পাঁচ বোনই অত্যন্ত গুণী। মানিয়ে দিতে ওস্তাদ। বড় ভালো মেয়ে ওরা। কত কষ্ট করে যে সব বড় হল, বাপ নেই, একটা পরামর্শ দেবার কেউ নেই ! ঈশ্বর যে কেন এতো নিষ্ঠুর, কেন যে কারও সুখ দেখতে পারেন না, কেন এমন হিংসুটে-কুচুটে আমি আজও জানি না বাবা।'

সুজাতা চোখে আঁচল দিলেন। তাঁর নিজের জীবনও তো এই। সমৃদ্ধি ছিল না, কিন্তু শান্তি ছিল, অসীম প্রেম ছিল, পূজাও ছিল। কিন্তু তিনি কেড়ে নিলেন, তখন তাঁর কতই বা বয়স, দুটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে যুঝেই গেলেন। যুঝেই গেলেন সারা জীবন !

বিদ্যুৎ স্থাণু হয়ে বসে রইলেন। এরকম অদ্ভুত সমাধানের কথা তাঁর মনে একবারও উদয় হয়নি। দীপালির সঙ্গে তাঁর বিবাহ-পরবর্তী মধুযামিনী পর্বও এখনও পার হয়নি। স্বামী-স্ত্রীর দীর্ঘদিন একত্র বসবাসের ফলে যেসব অবশ্যম্ভাবী ব্যক্তিত্ব-সংঘাত হয়, রুচির ঝগড়া হয়, ছোটখাটো তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিস নিয়ে তুলকালাম হয়ে যায়, বিদ্যুৎকান্তির ছ' সাত বছরের দাম্পত্য-জীবনে তা এখনও আসেনি। একে তিনি নিজের কর্মজীবন নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত, তার ওপর দীপালির রূপে, গুণপনায় তিনি একেবারে সম্পূর্ণ বশীভূত। পুরুরবা-উর্বশীর পুরুরবার মতো দশা। তার ওপরে দীপালির অসাধারণ মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, প্রত্যেকটি পরিস্থিতিকে অত্যন্ত সুকৌশলে নিজের আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলার সামর্থ্য, রসবোধ, গৃহিণীপনা, এ-সব, না, না, তিনি দীপালির জায়গায় অন্য কাউকে কখনও বসাতে পারবেন না।

গীতালিও খুব ভালো মেয়ে। ওইরকমই নেপালি ধাঁচের মুখ। ওইরকমই প্রায় ফর্সা। একটু শান্তশিষ্ট, একটু কম চালাক। সে যেন দীপালিব একটা অক্ষম ছায়া। কিন্তু ভালো। নিঃসন্দেহে ভালো। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠলেন—একি ? তিনি কি করছেন ? তাঁব প্রাণ-প্রিয়া দীপালিব সঙ্গে অন্য কাবো রূপগুণের তুলনা করছেন ! যেন রূপগুণে দীপালিব সমকক্ষ হলেই তাঁব বিয়ে করতে আটকাবে না ?

তিনি কি রকম উদ্ভ্রান্তের মতো উঠে দাঁড়ালেন। অপালাব মা বললেন—'একি বিদ্যুৎ তুমি কফিটুকু খেলে না ! ওইটুকুই তো চাইলে বাবা !'

বিদ্যুৎ অন্যমনস্ক গলায় বললেন—'তা হয় না মাসিমা ' তিনি যে কোন প্রশ্নটাব জবাব দিচ্ছেন বোঝা গেল না। পূর্ণ কফির পাত্র ফেলে, কাউকে একটা বিদায় সম্ভাষণ পর্যন্ত না করে তিনি চলে গেলেন।

বিকেলবেলাতেই সুজাতা অপালাকে নিয়ে দীপালিদের বাড়ি গেলেন। তিনি প্রাণপণে দীপালির মাকে বোঝালেন, শুধু শুধু গীতালিকে বিদ্যুতের সঙ্গে পাঠানো খুব খারাপ দেখাবে। তাছাড়া গীতালি তার চাকরি-টাকরি ছেড়ে ওভাবে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পথে পা বাড়াবে, কী হবে তার ? সে কি বিদ্যুতের ছেলেকে নিয়ে এখানে ফিরে আসবে ? বিদ্যুতের রকম-সকম দেখে মনে হয় ছেলেকে সে ছাড়বে না। তাহলে ? তাহলে ? তার চেয়ে তিনি নিজে প্রস্তাব করুন। বিদ্যুৎকে বোঝান। সে নিশ্চয় বুঝবে।

দীপালির মা অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

সুজাতা বললেন 'দিদি, আপনার এক মেয়ের সুখেব মধ্যে দিয়ে আরেক মেয়ের সুখ বেঁচে থাকবে। বিদ্যুৎ অমন উদারস্বভাব দয়ালু চরিত্রের ছেলে, আপনার প্রত্যেক মেয়ের বিয়েতে অমন মুক্তমনে সাহায্য করেছে, খরচ কবেছে। দীপুর সইল না। দীপুর ভাগ্য দিদি। কিন্তু তার স্থান তাব বোন না নিলে আপনি অমন একটি ছেলে হাবাবেন। বাচ্চাটাব কী দুর্গতি হবে ঈশ্বর জানেন !'

দীপালির মা অবশেষে সুজাতার কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করলেন। প্রস্তাবটা যখন তাঁর দিক থেকে এলো বিদ্যুৎকে আর অতটা উদ্ভ্রান্ত দেখাল না। সন্দেহ নেই এর চেয়ে ভালো সমাধান আর হয় না। সে গীতালির সঙ্গে একান্তে একটু কথা বলতে চাইল। কী কথা হল কেউ জানে না। কিন্তু দেখা গেল দুজনেই ছলছলে চোখে বেরিয়ে এসেছে, দুজনেই মত দিল। কোনও অনুষ্ঠান, কোনও আড়ম্বর, লোক জানাজানি না করে শুধু অপালা শিবনাথ সুজাতার উপস্থিতিতে বিদ্যুৎ-গীতালির বিয়ে হয়ে গেল। রেজিস্ট্রেশনের সময়ে গীতালি কাঁদছিল, বিদ্যুৎ কাঁদো-কাঁদো। ফেরবার সময়ে সুজাতা বললেন,—'আহা, ওরা সুখী হোক। কার ভাগ্য যে কে ভোগ করে ! বড়টি তো কোনদিনই বিয়ে করবে না বলে দিয়ে দিয়েছে। এই মেয়েটিরই দিদির বিয়ে হচ্ছিল না কিছুতেই। এক ধাক্কায় স্বামী-পুত্র-বাড়ি-গাড়ি-বিলেত সবই পেয়ে গেল। ওপরে যিনি আছেন তাঁর মতলবখানা যে কী আজও বুঝে উঠতে পারলুম না।'

॥ ১৩ ॥

অপালার অষ্টম বিবাহবার্ষিকীতে শিবনাথ ঘরে ঢুকে বলল—'কী এনেছি বলো তো ?'

—'কী আবার আনবে ?' অপালা বলল 'শাড়ি !'

শিবনাথের বউকে শাড়ি দেবার শখ খুব। কিন্তু সে একেবারেই পছন্দ করতে পারে না। অন্তত অপালার একদম পছন্দ হয় না। টিয়া-সবুজ তাতে জরির চেক, গাঢ় মেরুন রঙের ওপর সবুজ-হলুদ পাড়, ভেতরে ওই রঙেরই বুটি। সে গাঢ় রঙের শাড়ি পছন্দ করে না। তার ধারণা সে কালো, কালোকে এসব পরতে নেই। মেরুন শাড়িটা সে দু একবার পরেছে। শিবনাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল—'বাঃ, কী সুন্দর দেখাচ্ছে !' কিন্তু অপালার যে অভ্যাস নেই ! টিয়া রঙ শাড়িটা সে চুপিচুপি এক পারিবারিক নেমন্তন্নে পাচার করে দিয়েছে। ভাগ্যিস, শিবনাথ অত খেয়াল করেনি। এক এক ধরনের পশুপাখি থাকে তারা পরিবেশের সঙ্গে রঙে রূপে একদম মিশিয়ে থাকে, যাতে শিকারী তাদের কোনমতেই খোঁজ না পায়। সবুজ পাতার সঙ্গে মিশিয়ে সবুজ রঙ ! বহুরূপী তো ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলায়। অপালাও তার ধূসর-জীবন-পটভূমির সঙ্গে মিশে থাকতে স্বস্তি বোধ করে।

শিবনাথ একটা প্যাকেট বার করল। ক্যাসেট। প্রদ্যোৎ অপালাকে খুব ভালো টেপ-রেকর্ডার পাঠিয়েছে। যাকে বলে টু-ইন-ওয়ান। প্রত্যেক বছর ব্ল্যাঙ্ক ক্যাসেটও পাঠায় যথেষ্ট। সেগুলো অপালার খুব কাজে লাগে। কিন্তু এদেশে ক্যাসেট এখনও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সেভাবে আরম্ভ হয়নি। এ নিশ্চয়ই শিবনাথ তার নিজস্ব কোনও যোগাযোগ ব্যবহার করে আনিয়েছে। ক্যাসেটের প্যাকেটটা খুলল অপালা—ঠুমরি ও গজল। সোহম চক্রবর্তী।

সোহম লখনৌ থেকে বম্বে, তারপর বম্বে থেকে দিল্লি বহু প্রোগ্রাম করে বেড়াল সারা ভারতবর্ষ। ইদানীং সে ইয়োরোপ টুর করছে। আমেরিকা টুর করতে গিয়েই সবচেয়ে নাম হয়েছে তার। সে নাকি আজকাল সুপার স্টার হয়ে গেছে। সংস্কৃতির জগতে ভারতের নিয়মই হল যতদিন না বাইরের দেশের লোকে হই-হই করছে ততদিন দেশে খাতির মিলবে না। সে তুমি রবীন্দ্রনাথই হও আর রবিশঙ্করই হও। এমনকি সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের ওপরেও পি এইচ ডি, ডি লিট স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ কি জার্মানি টার্মানি থেকে করে আসলে পাত্তা পাওয়া যায়। সোহমের বেলায় সেটা আবার প্রমাণিত হল। অথচ ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের কিচ্ছু বোঝে না পশ্চিমের লোকেরা। ওদের কানই অন্যভাবে তৈরি, প্রধানত হার্মনি দিয়ে, সমারসেট মমের মতো লোক যিনি প্লট আর চরিত্রের খোঁজে এতবার প্রাচ্য ঘুরে গেছেন তিনিও প্রাচ্য সঙ্গীতকে ব্রেন-ফিভার-বার্ডের ডাকের একঘেয়েমির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

অপালা ভেতরে ভেতরে ভীষণ উত্তেজিত। কতদিন পর সে আবার সোহমের গান শুনতে পাবে। নাজনীনের তালিমের গান। সে বলল—'এখন চাপিও না। আমার হাতে কটা কাজ আছে, সেগুলো সেরে আসছি।'

সে কাজগুলো সেরে এসে ঘরে বসল—তখন ক্যাসেট চলল। সোহম

গেয়েছে এককালের বিখ্যাত গায়ক শচীনদাস মতিলালের কণ্ঠের বিখ্যাত ঠুমরি 'ন মানুঙ্গি ন মানুঙ্গি', 'জিয়া নহি মানে... রয়না বীত গই' একটা মিশ্র ঠুমরি। পিলুতে—'মোরে আলি পিয়াকে দরশকৈসে পাঁউ' প্রাণভরে গেয়েছে সোহম। তারপর গজল। অনেক। মীরের, গালিবের, তাছাড়াও আরও কারো কারো রচনা। নামগুলোও সোহম গানের আগে বলে দিচ্ছে ভরাট গলায়। সবচেয়ে ভালো লাগল অপালার 'ম্যঁয় আফতাব তু শবনম/ ম্যঁয় আন্ধেরা তু চাঁদনী।' রোম্যান্টিক আর্তির চরম গজলটির পরতে পরতে। কিন্তু এটাও লক্ষ্যের বিষয় সোহম ঠুমরির অঙ্গ মিশিয়ে অনেক সময়ে বেশ বড় বড় বোল তান মিশিয়ে এক নতুন ধরনের গজল তৈরি করেছে। কিন্তু সোহমের গলা কী অদ্ভুতভাবে পাল্টে গেছে! এত মসৃণ, ভাবালু, তার গানের পৌরুষ এখনও বজায় আছে ঠিকই, কিন্তু কৃষ্ণ-কানহাইয়ার বাঁশির সুরের মধ্যে যে পৌরুষ কল্পনা করা যায় এ সেই ধরনের ললিত পেলব পৌরুষ। রাজরাজেশ্বরের দাপট নয়, বিরহীর আর্তি।

শিবনাথ বলল—অনেকটা পালুস্কর টাইপের ছিল না ওর গলাটা? অপালা বলল—'যাঃ, পালুস্কর আমরা যতটুকু রেকর্ডে শুনেছি, একটু চাপা, কোমল, রিচ ভয়েস, কিন্তু কেমন একটা চাপাভাব ছিল। আর সোহমের গলাটা ছিল দরাজ, অতটা কোমলতা ছিল না! আর এখন এতো মড্যুলেশন! এতো ভ্যারাইটি! নাজনীনের হাতের তৈরি!' বলতে বলতে অপালা জোড় হাত কপালে ঠেকালো। বিদ্যুচ্চমকের মতো একবার মনে পড়ল সেই অসম্ভব আশা। কোথায় সোহম, কৃতী সম্পন্ন পরিবারের অতি আদরের দুলাল, মুখ থেকে কথা খসার আগেই যার আকাঙক্ষা পূর্ণ হয়ে যায়, আর কোথায় সে! বিধবা মায়ের মেয়ে, স্যাঁতসেঁতে নোনাধরা দেয়াল। পড়ুয়া দাদা, যুদ্ধেরত, রাজ্যের পুরনো শতাব্দীর ভাবনা-চিন্তা-ফেলে-দেওয়া আদর্শ ভর্তি মগজঅলা জেঠামশাই। আহা তিনি মারা গেছেন। কিন্তু তিনি অপালার ক্ষতি করতে চাননি। তাঁর সাধ্য এবং ধারণা অনুযায়ী যা তার পক্ষে সবচেয়ে ভালো মনে করেছিলেন তা-ই করেছিলেন। স্বপ্ন, স্বপ্ন, ওসব সাধ-ইচ্ছা তার মতো মেয়ের পক্ষে একেবারেই ছেঁড়া-কাঁথায় শুয়ে রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখার শামিল। তবু, তবু যে কিছুই ভালো লাগে না। এই ঘর-দুয়ার, এই সামাজিকতা, এই ভালোবাসা, কিছু না, কিছু না। গানের ভেতর দিয়ে সে যখন ভুবনটা দেখে তখন তাকে চিনতে পারে, নইলে সব কেন এমন বেসুরো, বেতালা, কর্কশ! নাই রস নাই! দারুণ দাহন বেলা!

হঠাৎ অপালা বলল—'একটা জিনিস চাইব, দেবে?'

শিবনাথ বলল—'সাধ্যের মধ্যে থাকলে, নিশ্চয়ই!'

অপালা বলল—তোমাদের নীচের ঘরটা তো পড়েই থাকে। বসবার ঘর করে রেখেছো কিন্তু যে-ই আসে তাকে তো ওপরে নিয়ে আসো। একেবারে বাইরের লোক তেমন আসেও না।'

শিবনাথ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। অপালা বলল 'ওই ঘরটা আমার গানের ঘর করে দেবে? কিছু কিছু ছাত্র-ছাত্রীও শেখাবো। ভোরের রেওয়াজ কি জিনিস আমি যেন ভুলেই গেছি।'

শিবনাথ বলল—'মুশকিল করলে। তোমার আইডিয়াটা ভালো। কিন্তু

বাড়িটা তো আমার নয়। বাবার। তাঁকে না বলে কিছু করা যাবে না।'

অপালার মুখ নিভে যাচ্ছে দেখল শিবনাথ। সে যেন এই শেষ কুটোটিকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছিল। কুটোটা হাত থেকে ফস্কে গেছে। এখন সে ডুবছে। সে হঠাৎ বলল 'এক কাজ করো না অপু, তুমি নিজেই বলো না।'

—'বলব?'

—'বলো, বলেই দ্যাখো না।'

সেদিন রাত্রে শ্বশুরের খাওয়া-দাওয়ার পরে অপালা বলল কথাটা। সে আজ নিজের হাতে বিশেষ এক রকম ছানার তরকারি করেছে। মাঝে মাঝেই করে, করতে হয়। কিন্তু তার মধ্যে তার তেমন মনোযোগ থাকে না। কিন্তু আজকেরটা করেছে যেন প্রাণপণে কোনও নতুন বন্দেশের স্বরলিপি শুনে শুনে লেখবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। অপালার কথা শুনে শ্বশুর বললেন—'তা অবশ্য তুমি চাইতে পারো মা। সত্যিই রেগুলার রেডিওতে গাইছো, তোমার একটা প্র্যাকটিসের দরকার আছে বইকি। ঠিক আছে ঘরটা তুমি ব্যবহার করো। তবে ওটা গোটা পরিবারের বৈঠকখানাও থাকবে। তেমন কেউ এলে...'

—'নিশ্চয়ই। সে তো নিশ্চয়ই।' আনন্দের আতিশয্যে অপালার মুখ দিয়ে এর চেয়ে বেশি আর কিছু বেরোল না।

মহানন্দে খবরটা শিবনাথকে দিল অপালা। মাস দুয়েকের মধ্যে ঘর রঙ হয়ে, তাতে নতুন কার্পেট বিছিয়ে, চারদিকে ছোট ছোট নিচু নিচু আসন, হারমোনিয়ামের বাক্স, তানপুরার ঝুলি সব নামিয়ে আনা হল। বিয়ের আট বছর পরে এই প্রথম অপালা একখানা নিজস্ব ঘর পেল, যেখানে সে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ইচ্ছেমতো রেওয়াজ করতে পারে। সঙ্গত করতে বেণু নিয়মিত আসে। এবং আসে ছাত্র-ছাত্রীর দল। ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক এখন ঘরে ঘরে পাঠ-ক্রমের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রী এতো আসে যে অপালা নিতে পারে না। দুটো ব্যাচের বেশি সে কিছুতেই করবে না। তার নিজের গান হবে কি করে? শম্পা মিত্র বলে যে নামকরা সেতারী এবং বীণাবাদিনী তাদের পাড়ায় থাকেন, তাঁর কাছেও অপালা মাঝেমাঝেই যায়। দবীর খাঁ। পরে রবিশঙ্কর, বিলায়েত এঁদের কাছে শিক্ষা ওঁর। যদি কিছু পায়। শম্পা বলেন 'এতো চমৎকার গলা, এতো অপূর্ব গাস, এর মধ্যে বিয়ে করে মরেছিস কেন?' অপালা চুপ করে হাসে। শম্পা ডিবে থেকে কিমাম দেওয়া জোড়া পান মুখে দিয়ে বলেন— 'এই দ্যাখ না, বিয়ে-থা করিনি, রাজ্যের লোকে বিরক্ত করে, নিজের ইচ্ছেমতো ওস্তাদদের কাছে শিখেছি, তবু মনে হয় কিছু হল না, কিছু হল না। আর তুই? কোনও সুযোগ, তেমন কোনও উচ্চশিক্ষা না পেয়েও এখনই রেডিওর এক্লাস আর্টিস্ট। কিন্তু এর পর? কোথায় দাঁড়াবি? বদ্ধ জলা হয়ে যাবি যে রে! আবার ছাত্রী-ঠেঙাতে শুরু করেছিস শুনছি? অপালা তার নিয়মিত রোজগারের একটা অংশ প্রতিমাসে শাশুড়ির হাতে তুলে দেয়। তিনি হাত পেতে নিতে নিতে বলেন—'তুমি আমায় বাঁচালে বড় বউমা, আমরা না-ই বা ঘরের বাইরে বেরুলাম। আমাদেরও যে নিজেদের হাতে খরচ করার সাধ-আহ্লাদ থাকতে পারে কেউ বোঝে না। না কর্তা, না ছেলেরা।'

॥ ১৪ ॥

কে তুমি দাঁড়িয়ে আছো ; ওপরে, অনেক অনেক ওপরে যাকে এক ঝলক দেখবার জন্য চোখ তুলে তাকাতে তাকাতে আমরা উর্ধ্বমুণ্ড, হতশ্বাস, জিরাফ প্রমুখের গলা ক্রমাগত লম্বা, সরলবর্গীয় বৃক্ষগুলি দিবারাত্র দীর্ঘ দীর্ঘতর হয়ে যাচ্ছে ! কোন সে শক্তি যা একোহহম বহুস্যাং বলে কিম্বা প্রচণ্ড আভ্যন্তর চাপেব বিস্ফোরণে ফেটে গিয়ে এই বিশাল অন্ড প্রসব করল ? গান্ধারীপ্রসূত মাংসপিণ্ডের মতো এই অণ্ড থেকে অযুত নিযুত প্রাণী সৃষ্টি হয়েই চলেছে, হয়েই চলেছে। তুমি কি এইরকমই প্রজায়মান হতে চেয়েছিলে ? শুধু সংখ্যা, সংখ্যা আর সংখ্যা। তাদের ভেতরে কত সাধ্য, কত স্বপ্ন, কত আকাঙ্ক্ষা, কত ভুল, কত ঠিক, কত আদর্শ। কোনটারই কেন পূরণ হয় না ? তুমি গাছে তুলে দাও হে অমিতবিক্রম তার পরে মইটি কেড়ে নাও। ভাবি, ভাবতে থাকি, আজকাল বযস সত্তবের কাছে চলে গেছে। ক্রমাগত এইসব ভাবতে থাকি। যখন সাত আট বছরেব শিশু ছিলাম, বাবা এসরাজ বাজাতেন, সেই সুরগুলি অবিকল গলায় তুলে, নিজের শিশুবুলি দিয়ে সুরের নিঃসঙ্গতা ভরাট করে গাইতুম। বল খেলতে খেলতে বলের গান ! সাঁতার কাটতে কাটতে জলের গান, গাছে চড়তে চড়তে ফলের গান, রান্নাঘরের চাতালে ঘটিবাটি সার বেঁধে বাজাতুম। বাবা একদিন হুঁকো খেতে খেতে উঠে এসে বললেন—'ছোট বউ, ছেল্যাডা কি গায়, খেয়াল করছ ?' মা বললেন 'কী আবার গাইবে ? গাইছে আগডম আর বাগডম।'

'না গো না, গাইছে ভীমপলাশী। একটি পর্দাও মিস হচ্ছে না। কোমল গান্ধার, কোমল নিষাদ ঠিকঠাক লাগাচ্ছে। মনরঙ্গ সাহেবের যে গানটা আমি বাজাই 'মধুব মূরত মনকো মোহত/ মনরঙ্গ কে তনমন কো মোহে ? অন্তরার এই সুর ঠিক গাইছে। নিজে কি সব বুলি দিয়ে।' সে বুলি আমার এখনও মনে আছে। 'ইচ্ছে হলেই কালুর বাড়ি যাবো/ গিরগিটিটা ধরে নিয়ে ভীষণ ভয় দেখাবো। ভীষণ ভয় দেখাবো।' সাধে কি আর মা আগডম বাগড়ম বলতেন !

'কোথা থেকে এ সুর পেলি রে সোনা ?' বাবা জিজ্ঞেস করলেন। বলে ড্রপ দিতে দিতে ভারী অদ্ভুত কথা বলেছিলাম—'বিষ্টির সময়ে এই সুরই তো ঝমঝম করে পড়ছিল। তুমি তারপর সেটাই তো তোমার যন্তরে বাজালে ? আমিও তেমনি গাই। আমি রোদের গান জানি, ঝড়ের গান জানি...' ভীমপলশ্রীর সঙ্গে শাস্ত্রীয় মতে বৃষ্টির কোনও সংযোগ নাই। তবু রাগটি শিশুর অপরিণত কিন্তু স্পর্শকাতর, সরল, কর্ণ কুহরে যদি বৃষ্টির সুর বলে মনে হয় তো ধরতে হবে কিছু নূতন গবেষণার দরকার।' বাবা আত্মগত বললেন, সেই সঙ্গে আরও মনে করলেন এ ছেলে যুগন্ধর গায়ক না হয়েই যায় না। নিজে তো সঙ্গে করে নিয়ে বসতে লাগলেনই, উপরন্তু কলকাতায় নিয়ে এলেন, রামলাল ক্ষেত্রীজীর সাগরেদিতে জুড়ে দিলেন, তাঁর কাছে যেমন শাস্ত্রও পড়লাম, তেমন সঙ্গীত শিক্ষাও হতে লাগল, ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেব, ওস্তাদ হাফেজ খাঁ সরোদিয়া, গহরজান, কেসরবাই কেরকার, ওঙ্কারনাথ, কত বড় বড় ওস্তাদের গান-বাজনা

শুনলাম। মাত্র ১৪/১৫ বছর বয়স থেকে রামপুর। সেখানে কী গান গেয়েছি আর কী গান শুনেছি ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। বছরে একবার করে পাথুরেঘাটায় আসতাম, বাস, কলকাতার সঙ্গে ওইটুকু সম্পর্ক। চতুর্দিকে তখন গুজব ঘুরে বেড়াত, 'রামেশ্বর ঠাকুর এইটুকু ছেলে, প্রডিজি, গান শুনে আয়, আর কেউ এর পাশে দাঁড়াতে পারবে না।' সতের বছর বয়স থেকে একা। মা-বাবা এবং আমার ছোট ভাইটি এক মহামারীতে শেষ। তখন আমি গান গাইতে বরোদায়। তারপর থেকে একেবারে মরিয়া চরিত্র। আমি গান গাই, ওস্তাদ ওস্তাদ তবলিয়ারা আমার সঙ্গে সাথ-সঙ্গতে ঘেমে যান। কোথাও কোনও নোঙর নেই। যেখানেই যাচ্ছি, রাজ-রাজড়ার সঙ্গে কারবার, সেই মতোই ব্যবহার, আর সম্মান। তারপর একদিন কাশীতে তিলভাণ্ডেশ্বরের কাছে এক এঁদো গলিতে অজস্র হনুমানের উৎপাতের মধ্যে আবিষ্কার করলাম এক মহৎ প্রতিভা। গায়ক বটে। এই ভারতের অজানা-অচেনা কোণে যেমন সব মহা মহা যোগী ঘুরে বেড়ান, কারোর জানাজানির তোয়াক্কা করেন না, ঠিক তেমনি আছেন কত সুরসাগর। বয়স্ক মানুষ, গলায় অসাধারণ সুর, সেই সঙ্গে পাণ্ডিত্য, যদি জিজ্ঞেস করতুম কেন এমন দীনহীন হয়ে কোণে পড়ে আছেন, জবাব দিতেন না, মুরেঠা-শুদ্ধু মাথাটা খালি অল্প অল্প নাড়তেন। তার মানে কি আমি বুঝতাম না। একদিন দেখলাম ঘরে অসামান্য সুন্দরী তরুণী স্ত্রী। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। চলছেন না যেন নাচছেন, হাতের কাজ সারছেন মনে হত ভরতনাট্যমের মুদ্রাগুলি অভ্যাস করছেন। একজন যদি সুরে মজালেন তো অন্যজন মজালেন রূপে। কিভাবে এ সমস্যার কী সমাধান করি। নিজের সঙ্গে লড়াই করে করে যখন ক্ষতবিক্ষত তখন ঠিক করলুম আর নয়, অনেক শিখেছি, এবার চুপিচুপি পালাই। কাউকে কিছু জানাইনি। রাতের ট্রেন, সন্তর্পণে নিজের সুটকেসটি হাতে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। দেখি পাশে কয়েকমাসের শিশুসন্তান কোলে কেদারনাথজীর সেই সুন্দরী পত্নী। আকুল হয়ে বললেন— 'আমায় ফেলে রেখে কোথায় যাও। আমি এই গুদোমঘরে আর থাকতে পারছি না, যদি চলে যাও তো এই বাচ্চাটাকে নিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেবো।' একে হৃদয় পরিপূর্ণ, টলটল করছে, তার ওপর এমনি কথা। দেখলাম সে গায়ে চাদর জড়িয়ে রেখেছে। তার আড়াল থেকে উঁকি মারছে বহুমূল্য গহনা। বললাম—'গয়নাগুলো খুলে রেখে এসো।' সে দৃঢ়কণ্ঠে বলল—'এ সব আমার, একদম আমার নিজস্ব। কেদারজী কিচ্ছু দ্যাননি।' বললাম 'তা হোক, আমি তোমাকে যা চাও করিয়ে দেবো, যত গহনা, কিন্তু চোর বনতে পারব না।' এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সে বাড়ির ভেতর চলে গেল। মিনিট দশেক পরে অলংকারহীন সেই রমণী আর সেই শিশুকে নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলুম। রামপুরে আর ফিরে যাওয়া যায় না। সুতরাং সুদূর বরোদায় ভাগ্যান্বেষণে, কয়েক মাস পরেই কলকাতা। সে পাপিষ্ঠা না আমি পাপিষ্ঠ তা-ও তো জানি না। বৃদ্ধ স্বামীর দীনদরিদ্র ঘরদুয়ার যদি সেই অপূর্বকান্তি রমণীর গুদোমঘরের মতো মনে হয়, তাকে কি করে দোষ দেবো? যতগুলি সম্ভব গহনা তাকে গড়িয়ে দিয়েছিলাম। দিবারাত্র অবিশ্রাম পরিশ্রম করতাম সংসারযাত্রার জন্য। কিন্তু এতো চেষ্টা সত্ত্বেও হয়ত আমার ঘরও তার

কাছে একদিন গুদোমের মতো লেগেছিল, সে আমার শিষ্য এমদাদের সঙ্গে ঘর ছাড়ল। তবে এবার গহনাগুলি নিয়ে এবং শিশুকন্যাকে ফেলে, তার ওপর সত্যি আমার কোনও জোর নেই। আইনগত দিক থেকে, সামাজিক দিক থেকে। সে আমার স্ত্রী ছিল না, তবু তো স্ত্রী-ই। ভাগ্যিস সে মিতুলকে দিয়ে গিয়েছিল। পাঁচ সাড়ে পাঁচ বছরের মেয়ে, আহা সে যে কী যন্ত্রণায় মা মা করে কাঁদত। তাকে কোলে করে কত বিনিদ্র রাত শুধু ছাত আর দালান, দালান আর উঠোন, যখনই কোথাও যাই গাইতে কি শুনতে দেবশিশুর মতো নিষ্পাপ সুন্দব মিতুল আমার সঙ্গে থাকে। মানুষের আশার ঘরটি বারবার ভেঙে পড়ে। বারবার আবার সে ঘরটি প্রাণপণ করে গড়ে। ছোট্ট মিতুলকে নিয়ে আজ অবধি সেই ভাঙা ঘর গড়ে চলেছি। নিজের কণ্ঠে অকালবার্ধক্য আসছে বুঝে এসরাজের ছড়ি তুলে নিলুম। সারেঙ্গি, সেতার, ভাবলাম এ মেয়ে তো এক রাজ-গায়কের মেয়ে, একে গড়ে দিয়ে যাবো। দিয়ে যাবো সবার কাছে যা শিখেছি। সেই হবে আমার একরকমের ঋণশোধ। ক্ষতিপূরণ। কিন্তু মেয়েটা কাঁদে যেন কাক ডাকছে, আপনমনে কথা বলে যেন শালিখে কিচিরমিচির করছে, তবু লেগে আছি। এদিকে শিষ্য-শিষ্যা আসছে, তাদের মধ্যে কেউ-কেউ অপরূপ গলা নিয়ে আসছে। কী সাধনা! সঙ্গীতের জন্য কী ভালোবাসা! কী ত্যাগ! সঙ্গীত ছাড়া জীবনে যেন কিছুই নেই। দিলীপ ছেলেটি কৃতী এঞ্জিনিয়ার। সে তো সেদিকে গেলই না, সরোদ নিয়েই পড়ে রইল। আরেক জন ছিল অপালা। আমার বাবা যদি তাঁর সাত আট বছরের ছেলের গান শুনে আমাকে প্রডিজি ঠাউরে থাকেন, তাহলে আমিও একটা কচি মেয়ের গলায় কর্ণাটকী সঙ্গীতের সূক্ষ্ম কাজ, তার মধুরতা, গানের ওপর প্রয়াসহীন দখল শুনে তাকে প্রডিজিই ভেবেছিলাম। কথা কইছে, তা-ও যেন গান গাইছে, এমন সমৃদ্ধ তার কণ্ঠসম্পদ। তালিম দিলুম, আমার যতদূর সাধ্য, ভাই-বেরাদর ওস্তাদদের কাছে পাঠালুম, আমি যা জানি না, পারি না সে যেন তা অন্যের কাছ থেকে শিখে নিতে পারে! যার কাছে পাঠিয়েছি, সে-ই বলেছে— এ তো অসাধারণ গুণী, এখন এই বয়সেই এই গাইছে, আর একটু পরিণত হলে এ তো পূর্ণিমার আকাশে চাঁদের মতো জ্বলজ্বল করবে!

সেই অপালা দত্তগুপ্তর নাম আজ কে জানে? সেই সদাবিনয়ী নম্র, অহমিকাশূন্য, নিষ্পাপ মেয়েটি কোনদিন গন্ধর্বসভায় তাল ভঙ্গ করেনি, কোনদিন কোনও সাফল্যের গর্বে আত্মহারা হয়নি, আমি জানি সে নিষ্কলঙ্ক চাঁদের মতো। কিন্তু হায়, এ চাঁদ দ্বাদশীর চাঁদ, আজও পূর্ণতা পেলো না। তার এ শাস্তি কেন? কলকাতা রেডিও-স্টেশনের প্রথম শ্রেণীর উচ্চাঙ্গসঙ্গীত গায়িকা? দূরদর্শনে নিয়মিত গাইছে আজকাল? সে তো কতই আছে! কোথায় গেল সেই বিশেষ, যাকে আমি পূর্ণভাবে চিনেছিলাম। আমার সঙ্গীতজীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে! শেখায়ও নাকি প্রাণ দিয়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে তার গুণগান শুনি। কিন্তু সেই অপালা, যে যৌবনের হীরাবাঈয়ের সহস্র পাহাড়ি ঝরনার কলতানকণ্ঠ মনে করিয়ে দিত, সে কই। সে কই!

অথচ মিতুল! তার কাকিনীর মতো কণ্ঠস্বর ক্রমে গর্দভের মতো হল। তার

রেওয়াজে প্রচুর ফাঁকি ছিল। তবু রেওয়াজ বন্ধ করতে দিতাম না। কিন্তু সেই কণ্ঠ এখন রবাবের মতো হয়েছে। অদ্ভুত আওয়াজ। কেমন ভোঁতা, খসখসে, অথচ কী চার্ম! মিতুল যখন বড় বড় জলসায় গায়, আমার তার পিতা বিস্মৃত, অবহেলিত, প্রতারিত সেই কেদারনাথজীর কথা মনে পড়ে। মাথা নত হয়ে আসে। তাহলে সাধনা কিছু নয়। আন্তরিকতা, সংকল্প, ব্রত, ঈশ্বরদত্ত গুণ এসব কিছুই নয়। সবই সেই আজকাল যে বলে জীন। বংশগতি। সেই।

এমন নয় যে মিতুলের এই সাফল্যে আমি দুঃখিত। মিতুলেব রেকর্ড-বিক্রি, জলসায় জলসায় তার ডাক, লাইট ক্ল্যাসিক্যাল এবং আধুনিক গানে এমন কি ইংরেজি পপ-সঙ্গীতে তার সমান অধিকার, এবং সর্বোপরি তার সৌন্দর্য তাকে যে ঐশ্বর্য দিয়েছে, আমিও তো সেই ঐশ্বর্যই ভোগ করছি। মাতৃহারা শৈশবের সে স্মৃতি আজও তার কাছে অমলিন। তার বাবা তাকে কিভাবে বাবা এবং মা উভয়ের মতো লালন করেছে, সে ভোলে না। সে যেরকম মায়ের মেয়ে সত্যি বলতে কি তার মধ্যে এতো ভালোবাসা, এতো ভক্তি, এতো বিবেচনা সম্ভব বলেই আমি মনে করিনি। তার মায়ের চরিত্র দিয়ে তার বিচার করার এই চেষ্টা সম্ভবত ভুল। আমার যখন হাঁপের টান ওঠে মিতুল তখন তার কোমল হাত দিয়ে আমার বুক নিচ থেকে ওপর দিকে আস্তে আস্তে মালিশ করে দেয়। অতিরিক্ত অক্সিজেন পাবার রবারের যন্ত্রটি আমার নাকের সামনে ঠায় ধরে থাকে। পর পর তিনদিন কোথায় বারাসতে কার কাছে মাদুলি নিতে গেছে আমার জন্য। সম্পূর্ণ উপোস করে। আমার বড় অবাক লাগে। ভেবেছিলুম নিতান্ত অল্পবয়সে সে সোহম চক্রবর্তী কিংবা দিলীপ সিনহা কিংবা ওইরকম কাউকে কিংবা আরও অনেককে বারবার বিয়ে করবে। ছাড়বে। ত্রিশ পেরিয়ে গেছে, মিতুল এখনও বিয়েই করেনি। তবে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তার যা ইচ্ছে করে। অজস্র পুরুষ-ভক্ত, পুরুষ-বন্ধু, এদের সঙ্গে সে কোথায় যায়, কি করে আমার জানা নেই। কিন্তু তার পালক পিতার প্রতি ব্যবহারে কোনও উচ্ছৃঙ্খলতা নেই। মিতুল সুরকে পেয়েছে, ছন্দকে পেয়েছে, তার মনে কোনও অশান্তি আছে বলেও মনে হয় না। সুখী হোক, সুরাশ্রিত থাক, কিন্তু আমার অন্য সুরকন্যাটির জন্য আমার বড় মন কেমন করে। এই বয়সে তিনটি সন্তান। হয়েছে পরপর। স্বামী বাদে বড়ই বেসুর বাড়ি। স্বামীটিই কি সব দিক থেকে বিবেচক? কি জানি? অপুর মুখে কোনও অভিযোগ শুনিনি। তার মুখ বরাবরের মতো প্রশান্ত। আনন্দ হলে তার গণ্ডে একটা রক্তাভা দেখতাম। এখন গণ্ডদ্বয় সব সময়েই মলিন। ঈশ্বর তোমার এ কেমন বিচার? হে মহাশক্তি, সর্ব সুরের অধিকর্তা, হে সুরপতি, হে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু এমন নির্মম উপেক্ষার অর্থ কী? আমি না হয় অপরাধ করেছি। প্রথম জীবনে বহু পুরস্কার, বহু খ্যাতি প্রশংসা, মানযশ পেয়েছি। কিন্তু আমার এই নিষ্পাপ সুরকন্যাটির ওপর তোমার এ দণ্ড কেন? ক্ষমা কোরো যদি প্রশ্ন করে অপরাধ করে থাকি। আজ এই বৃদ্ধ বয়সে মনে হয় এ পিঠ সর্বদাই কোন না কোন অপরাধের ভারে ন্যুব্জ হয়ে আছে। সব কষ্ট, দুঃখ, শারীরিক, মানসিক, কোনও না কোনও অনিচ্ছাকৃত পাপের ফল। কুসংস্কারে পূর্ণ হয়ে রয়েছে মন। যদিও জানি এসব অবৈজ্ঞানিক, এ সব মিথ্যা, তবু সত্য বলে প্রতিভাত হয়। আজ

কোথায় গেলেন আমার সেই সত্যসন্ধপিতা, যাঁর একমাত্র ব্যসন ছিল যাবতীয় কর্তব্যশেষে এসরাজ, সেই ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেব যিনি গেলেই রাবড়ি খাওয়াতেন, আমার বন্ধু আমীর খাঁ সাহেব। তাঁরা কত ঋজু, কত নির্ভীক ছিলেন, সুরে অধিকার ছিল, কোনকিছুকেই পরোয়া করতেন না। আজ অকালন্যুব্জ, শ্বাসকষ্টদুষ্ট বৃদ্ধ সুরভ্রষ্ট এই হৃতশ্রী গন্ধর্বকে তোমরা ক্ষমা করো। তোমাদের অর্জিত পুণ্যের কিছু কিছু অন্তত দাও, আমি সে পুণ্যফল নিজের জন্য রাখবো না। দিয়ে যাবো। না, না, মিতুলকে নয়। আমার অপু মাকে।

সবুজ মলাট বাঁধানো ডায়েরিটা রামেশ্বর বন্ধ করে দিলেন। দুই মলাটের মধ্যে বন্দী হয়ে রইল তাঁর জীবন, তাঁর যন্ত্রণা, তাঁর প্রার্থনা। তিনি তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে ডায়েরিটা রেখে চাবি ঘুরিয়ে দিলেন।

॥ ১৫ ॥

মিতশ্রীর বসবার ঘর। ঘরটি খুব বড় নয়। আসলে একটা বেশ বড় হলঘরকে ত্রিপুরী বাঁশের কারুকার্য করা জাফরি দিয়ে দুটো অসমান ভাগ করা হয়েছে। বড় অংশটিতে মিতশ্রীর নিজস্ব ভাষায় 'সঙ্গীত-নাট্য-অ্যাকাডেমি' আর দ্বিতীয় অংশটাকে সে বলে 'ধান্দাবাজদের ওয়েটিংরুম।' এই অপেক্ষাকৃত ছোট অংশটা অদ্ভুত সুন্দরভাবে সাজানো। বাঁশের জাফরির ভেতর দিয়ে চিত্রবিচিত্র আলোর আলিম্পন এসে ঘরটাকে অলৌকিক করে যায় যখন ওপাশে আলো জ্বলে, অথচ এপাশে জ্বলে না। আর এই অপরূপ পার্টিশনটার সঙ্গেই সামঞ্জস্য রেখে এ অংশের যাবতীয় আসবাব। বেতের এ ধরনের কারুকার্য-করা আসবাব এখনও কলকাতায় পাওয়া যায় না। এ সব এসেছে বম্বে থেকে। বসবার গদি পেছনের বর্ণময় কুশন সবই অত্যন্ত বিশিষ্ট রুচিমাফিক বাছা হয়েছে। মোটা গাছের গুঁড়ির তলার চার ফুট মতো অংশ বার্নিশ করে নিয়ে তার ওপর বসানো আছে এক অসাধারণ নৃত্যশীল নটরাজ। এও কাঠের। শুধু কাঠের নয়, প্রাকৃতিক। একবার বম্বে রোড দিয়ে দীর্ঘ এক সফরের সময় সে গাছের ডালের বিন্যাসে এই নটরাজের আভাস আবিষ্কার করে। তক্ষুনি সেই অংশটিকে কাটিয়ে, এদিক-ওদিক একটু অদলবদল করে নিয়ে ভালো করে পালিশ করে হয়ে গেল তার নটরাজ। তিনি বসলেন তাঁর যোগ্য আসনে, কাঠের গুঁড়ির ওপর। দরজা দিয়ে ঢুকে প্রথম আসনটিতে, অর্থাৎ দরজার দিকে পেছন করে বসলে সামনে যে দেয়ালটি চোখে পড়ে, তাতে খুব হালকা বিস্কিটরঙের ক্যানভাসে শুদ্ধ বাদামী রেখার এক একটি বলিষ্ঠ আঁচড়ে আঁকা ঘোড়া ঘোড়া ঘোড়া। এদের চোখ নেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আলাদা করে ভালো বোঝা যায় না, আছে শুধু সেই তীব্রসুন্দর গতিবেগ যা একমাত্র ঘোড়াদেরই থাকে।. ঘোড়া মিতশ্রীর প্রিয় পশু। সে বলে 'আমি যদি দেবী হতাম তাহলে বাহন হিসেবে বেছে নিতুম ঘোড়াকে।'

মিতশ্রী বসেছিল দরজার মুখোমুখি। আসল সোনালি মুগার একটি মেখলা পরে। তার সামনে দুই ভদ্রলোক। একজন অত্যন্ত মোটা। ঘাড় পর্যন্ত নেই। চিবুক দু তিন থাক। রং এত লালচে ফর্সা যে সেই গ্রাম্য বাংলা ছড়ার

অংশ মনে পড়ে 'রক্ত ফেটে পড়ে।' অন্যজন স্বাভাবিক। বড় গম্ভীর, কিন্তু ক্ষিপ্র চোখ। মোটামুটি দীর্ঘকায়। বেশ পেশীবহুল, অতিরিক্ত মেদ বর্জিত চেহারা। দ্বিতীয় জন বললেন—'মিতশ্রী দেবী, আপনি একটু কনসিডার করুন। বুঝতেই তো পারছেন এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট।'

মিতশ্রী বাঁ পায়ের ওপরে ডান পা তুলে বসেছিল, হেলান দিয়ে। তার দীর্ঘ পা বরাবর মেখলার একটি ভাঁজ। চিবুকের তলায় তিনটি লম্বা লম্বা আঙুল। সে পা বদলে, সামান্য ঝুঁকে বলল—'কী বললেন ? এক্সপেরিমেন্ট ? জানেন কোন আসরে মিতশ্রী ঠাকুর আসছে শুনলেই সেখানে টিকিট ব্ল্যাক হয় ! রিভলভার পকেটে বডিগার্ড ভাড়া করতে হয় আমাকে ? শুধু মত্ত জনতার কাছ থেকে আমাকে নিরাপদ দূরত্বে রাখবার জন্যে ? জানেন আমার প্লে-ব্যাক করা ছবির গানের ক্যাসেট ছবি রিলিজ করার আগেই বিক্রি হয়ে যায় !'

—'সবই জানি। কিন্তু আমরা তো আপনাকে এই মিউজিক্যালটার হিরোইনের রোলে নামাতে চাইছি। হিন্দি ছবির দর্শক যা দেখতে অভ্যস্ত তার থেকে অন্য রকম কিছু করছি। সেই হিসেবে এটা এক্সপেরিমেন্ট বই কি !'

মিতশ্রী একটু হাসল। তার বাঁ কপালে সামান্য একটু চেরা দাগ। ডান গালের চিবুকের কাছে একটা গোল বিন্দুর মতো আছে। তা সত্ত্বেও লোকে তার নামকরণ করেছে অমিতশ্রী। এরা বলছে কী ?

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বললেন—'অ্যাকচুয়ালি, আপনি আর্টিস্ট, গায়িকা, অভিনেত্রী তো নন। আপনার গান, আপনার অ্যাপিয়ারেন্স এসবের অ্যাক্সেপটিবিলিটির কথা আমরা একেবারেই ভাবছি না।'

মিতশ্রী বলল—'কিন্তু আমি তো অ্যাট অল অভিনয় করতে চাই বলে আপনাদের পায়ে ধরিনি। আপনারা আমাকে প্লে-ব্যাক করতে বলছেন। ও.কে.। তাতে আমি রাজি। অভিনয় আমি কোনদিন করিনি। কিরকম করব, গ্যারান্টি দিতেও পারছি না। তা ছাড়া আমাকে বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে পারফর্ম করতে হয়। কতটা সময়ই বা আমি আপনাদের শুটিং-এ দিতে পারবো !'

এবার মোটা ভদ্রলোকটি বলে উঠলেন, 'বিলিভ মি মিস ঠক্কর উই হ্যাভ সীন মেনি অফ ইয়োর ফোটোগ্রাফস। বাট আফটার মিটিং ইউ দ্যাট ইজ, সীইং ইয়োর ফুল পার্সন্যালিটি, উই আর কনভিনস্‌ড দ্যাট ইউ আর দা হিরোইন উই আর লুকিং ফর। হমাদের ওরিজিন্যাল প্ল্যানটা হপনাকে দেখে চেঞ্জ করে গেলো।'

অন্যজন বললেন— 'অল দ্য সেম। ইট রিমেনস অ্যান এক্সপেরিমেন্ট।'

মিতশ্রী বলল—'দেখুন, মিঃ সিন্‌হা আমার শেষ কথা আমি বলেই দিয়েছি। আমার ফিলমে নামার কোনও বাসনা নেই। আয়্যাম নট অ্যাট অল আফটার এ ফিল্ম কেরিয়ার। আমার টার্মস-এ যদি রাজি থাকেন হয়ত করব। প্রোপোজ্যালটা ইনটারেস্টিং। আমি ফিল্ম ওয়ার্ল্ডেও কিছু কিছু ঘোরাঘুরি করি, দরদাম সম্পর্কে আমার ভালো ধারণা আছে। আচ্ছা এবার আপনারা আসুন।'

সিন্‌হা কিছু বলবার আগেই অপরজন অর্থাৎ কেজরিওয়াল বলে উঠলেন—'অলরাইট, অলরাইট মিস ঠক্কর, নেক্সট ডে উই আর কামিং ব্যাক

উইথ দা কন্ট্র্যাক্ট ফর্ম। কাইন্ডলি ডেটগুলো আমাদের তাড়াতাড়ি দেবেন। কুইক শেষ করতে চাই।'

মিতশ্রী বলল—'ঠক্কর নয়, ঠাকুর। শুনুন শীতকালে নভেম্বর টু মার্চ কোনও ডেট দিতে পারবো না। ওইটা হচ্ছে মাইফেল-সীজন। সামার, মনসুন-এর মধ্যে যা কিছু শেষ করতে হবে।'

—'ফর লোকেশন শুটিং উইন্টার-এ কুছু কুছু ডেট লাগতে পারে, প্লিজ ডোন্ট সে নো।'

লম্বা দুগ্লাস সফ্‌ট ড্রিঙ্ক খেয়েছেন ভদ্রলোকদ্বয়। হয়ত আশা করেছিলেন হার্ড কিছু মিলবে এতো নাম করা গায়িকার বাড়ি। মিতশ্রী সে ক্ষেত্রেও তাঁদের নিরাশ করেছে। শেষ কথাগুলো বলে সে তার পূর্ণ দৈর্ঘ্য মেলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

—'আচ্ছা, নমস্কার।' ভদ্রলোক দুজন, একজন নাম-করা প্রোডিউসার, এবং অন্য জন উঠতি ডিরেক্টর, এঁদের সে দরজা অবধি এগিয়ে দেবার চেষ্টাও করল না। পার্টিশনের অপর দিকে তার 'সঙ্গীত-নাটক-অ্যাকাডেমি'র দিকে চলে গেল।

দরজা পেরিয়ে বাইরে ড্রাইভ-ওয়ে। তাঁদের বিশাল বম্বে-ফিল্ম-মার্কা গাড়িটার দিকে যেতে যেতে কেজরিওয়াল তাঁর গলকম্বলের ভেতর থেকে যথাসম্ভব খাদে বললেন—'হোয়াট এ পার্সন্যালিটি? শী ওয়াকস লাইক এ লেপার্ড।'

সিনহা চিন্তিত স্বরে বললেন—'আই সি, ইউ হ্যাভ ফলন ফর হার। বাট শী ইজ গোয়িং টু বী টাফ, রিয়্যাল টাফ।'

'সে কথা যদি বোলেন—অল আর্টিস্টস আর ফুল অফ হুইমস্‌ অ্যান্ড ভ্যানিটি। তারা তো হমাদের ক্রিয়েটিভ কুছু দিচ্ছে, সো উই মাস্ট গিভ দেম অ্যালাউয়্যান্সেস।'

গাড়িটা কখন নিঃশব্দে ছেড়ে গেল মিতশ্রী লক্ষও করল না। ভদ্রলোকদের এক কথায় বিদায় করে সে তার গানের গালচের ওপর বসল। জমাট রক্তের মতো লাল, তাতে হরিণ রঙের নকশা, মাঝে মাঝে গাঢ় সবুজের ছোঁয়া আছে। মেখলা গুটিয়ে নিয়ে তানপুরা সামনে নিয়ে সে বসেছে বটে। কিন্তু এখন তার গাইবার মেজাজ নেই। যদিও এটাই তার সান্ধ্য রেওয়াজের সময়। আসলে মিতুল খুব উত্তেজিত হয়ে আছে। যদিও সে কেজরিওয়াল এবং গৌরাঙ্গ সিনহাকে মুখে দেখিয়েছে ওদের প্রস্তাবে তার এমন কিছু উৎসাহ নেই। কিন্তু আসলে এই প্রস্তাবটাই এখন তাকে গোধূলি লগ্নের চঞ্চলগামিনী মারোয়ার মতো পুরোপুরি অধিকার করে আছে। মিতুল এখন ঠুমরি, দাদরা, গজল হিন্দি-উর্দু হোক বাংলা হোক গায়, সে গানের টুকরা, পকড়, পুকার ইত্যাদির সঙ্গে নানারকম মনোহরণ মুদ্রা করে, শরীর মোচড়ায়, মুখের হাসিতে চোখের চাহনিতে গানের নিবেদন ফুটিয়ে তোলবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে তার। পায়ে অনেক সময়ে এক হারা নুপুর থাকে, পায়ের কাজও সে তবলার বোলের সঙ্গে করে থাকে। আসলে গানের চেয়েও বেশি প্রতিভা ছিল তার নাচে। অনিন্দ্য শরীর এবং মুখশ্রী তো ছিলই। কিন্তু বাবার সেই এক

বুলি—'উত্তম গানা, মধ্যম বাজনা, ঔর নিকৃষ্ট নাচনা।'

ছোট্টবেলা থেকে সে শুনে আসছে তার মা তার পাঁচ বছর বয়সের সময়ে হঠাৎ মারা গেছেন। কিন্তু সে অতি প্রখর বুদ্ধিমতী মেয়ে। মার অসুখ হল না, কিছু না। আগের দিন রাতে মা তাকে কত আদর করল। কী সুন্দর কত গয়না পরে, কালো ঢাকাই শাড়ি পরে সেজেছিল মা। বাবা সেদিন কোন সারা রাতের ফাংশানে গিয়েছিল। মিতুল বলল—'মা তুমি এতো সেজেছো ? কোথাও যাবে ? মা বলেছিল—'আজকে একটা বিশেষ দিন। সাজতে হয়।'

—'কি দিন মা ? জন্মদিন ? তোমার জন্মদিন ?'

—'মৃত্যুদিনও তো হতে পারে ?'

—'যাঃ !'

মা তাকে আদর করতে করতে বলল—'মিতুল তুই কাকে বেশি ভালোবাসিস রে ?'

মিতুল দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছিল—'বাবাইকে।'

—'কেন রে ?'

—'বাবাই যে আমাকে কতো-ভালোবাসে !' এর চেয়ে বেশি যুক্তি তার মনে আসেনি।

—'তাহলে ধর আমি যদি মরে যাই। বাবার কাছে থাকতে পারবি তো ?' তখনই মিতুল মাঁকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠেছিল—'মা, না, না তুমি মরে যাবে না।'

—'এই তো বললি বাবাকে বেশি ভালোবাসিস !'

পাঁচ বছরের মেয়ে কী করে বোঝায়, বাবাকে বেশি ভালোবাসা মানে মাকে কম ভালোবাসা না। মাতৃহীন জীবনের জন্য প্রস্তুতি থাকা না। মায়ের বুকের মধ্যে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল মিতুল। পরদিন উঠেছিল অনেক বেলায়। এখন বড় হয়ে বোঝে মা তাকে দুধের সঙ্গে কিছু একটা ঘুমের ওষুধ কি কিছু খাইয়েছিল। সকালে উঠে দেখল পিসিমা তার বিছানার পাশে বসে রয়েছেন। বিষণ্ণ মুখ। এই পিসিমাও তার বাবার নিজের বোন নয়; গুরুভগিনী গোছের। বাবা দালানে পায়চারি করছে। মুখ বিষণ্ণ, শোকাহত, গম্ভীর। মিতুল প্রথমে শুনল তার মা কোথাও বেড়াতে গেছে, তারপর শুনল তার মা হঠাৎ মারা গেছে এবং তাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দুটো গল্পতেই সে মিথ্যের গন্ধ পায়। সে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকে। বাবা, বাবাই তখন তাকে বুকে তুলে নেয়। বাবা গল্প বলতো—মা কত সুখের দেশে গেছে। তাদের জন্য সেখানে অপেক্ষা করছে। সেই সব গল্প এমন সুন্দর করে, বর্ণনা করে শোনাত, যে মিতুল আস্তে আস্তে মায়ের সেই মৃত্যুদিনের সাজ ভুলে গেল। তারপর একদিন যখন সে সুখে, চাপল্যে, বাবার আদরে, জীবনটাকে একটা চমৎকার চড়ুইভাতির মতো উপভোগ করছে, জীবনটা যখন তার কাছে একটা 'সব পেয়েছির দেশ', তখন সোহম চক্রবর্তী যে নাকি তাকে ভালবাসত, সে উন্মাদের মতো চোখ লাল করে এসে তাকে নানারকম কুৎসিত সন্দেহের কথা বলেছিল। সেগুলোর অন্যতম ছিল তার মায়ের এমদাদ খানের সঙ্গে পালিয়ে যাবার ইঙ্গিত। এক ঝলকে তার মনে

পড়ে যায় সেই রাত্তির, সেই কালো ঢাকাই শাড়ি, গা-ভর্তি গয়না। মায়ের সেই অদ্ভুত সংলাপ। এবং সর্বোপরি সেই ওষুধ-মেশানো দুধ।

এই মায়ের জন্য তার বিশেষ কোনও অনুভূতি নেই। কিন্তু কৌতূহল আছে। সে চুপিচুপি এদিক ওদিক থেকে যা খবর সংগ্রহ করেছে তার প্রথম অংশটা খুব আশাজনক, তার মায়ের পক্ষে, ইমদাদ গাইত, বাজাত। তার সঙ্গে নাকি তার মা ভদ্রমহিলা দুর্দান্ত নাচত। ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকায় তাদের জুটি প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয়। তারপরকার খবব আর কেউ বলতে পারে না। ইমদাদ খান তো তার পঞ্চমতম পত্নীকে নিয়ে এখন বম্বেতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। তার মা কোথায় গেল! বয়সও তো কম হল না। বাবার চেয়ে হয়তো সামান্যই ছোট হবে। হয়তো মাবাই গেছে। তার ধারণা মা নটী ছিল বলেই বাবা তাকে নাচের দিকে যেতে প্রাণপণে বাধা দিয়েছে।

যাইহোক তাতে তার কোনও ক্ষতি হয়নি। সে এখন নিজেকে নিয়ে, নিজেব বর্তমান নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত। জীবন মৃত্যু পাপ পুণ্য কোনটা সম্পর্কেই তাব চিন্তা করবার বিশেষ সময় নেই। সে খুব ভালো করে সার কথাটি বুঝেছে, সে একজন পাবফর্মার। মানুষ হিসেবে আলাদা কবে তাব মূল্য কাবো কাছে নেই। যতদিন সে সুন্দর, সে মোহন, যতদিন সে মানুষকে তাতাতে পারবে, ততদিনই তার দাম। তার চুম্বকী শক্তিটুকু দিয়েই তাব বিচার হবে আমবণ। এই দেহসৌষ্ঠব যখন ঝরে যাবে, কণ্ঠলাবণ্য অন্তর্হিত হবে, এই ব্যাখ্যাতীত আকর্ষিকা শক্তি ফুরিয়ে যাবে, তখন আর তাকে কেউ পুঁছবে না। ইতিমধ্যে সে এই 'শেষের সে ভয়ংকর দিন'-কে অবচেতনের একদম তলায় ডুবিয়ে রেখে জীবনকে দু' হাতে লুঠ করে যাচ্ছে। এই জন্যই কেজরিওয়াল আর গৌরাঙ্গ সিনহার ফিলম্‌টাতে তার আকর্ষণ জেগেছে। সে কেমন, তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে, তার নিজের সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে কেমন সেটা পূর্ণভাবে ধবে রাখবার সুযোগ রয়েছে ছবিটাতে।

বাবা ছাড়া আর একটা মানুষকেও সে ভালোবাসে না। শ্রদ্ধার যোগ্য বলে মনে করে না। আজ পর্যন্ত সে যতজন ওস্তাদের কাছে গেছে তাঁরা প্রত্যেকে ঠারে ঠোরে কেউ সোজাসুজি তার কাছে দেহকামনা জানিয়েছেন। কোনও জলসায় মাইক্রোফোন হাতে সে যখন প্রচণ্ড দাপটে গায়, বেশির ভাগ সময়েই প্রাচ্য পাশ্চাত্য পাঞ্চ করা সুর, তখন সামনের বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীকে তার মনে হয় প্রকাণ্ড একটা বিষাক্ত সাপ। এখন সুরে আচ্ছন্ন তাই তালে তালে দুলছে। সুর সরে গেলেই ছোবল মারবে। এই মুণ্ডহীন জনতাকে সে মনে মনে ঘৃণা করে। তার দেহ-সৌন্দর্যের ওপরেও আছে তার এক ঘৃণামিশ্রিত ভালোবাসা। সোহম তার কাছে চিরকাল অস্পৃশ্য কারণ সে তার এই অতুলনীয় মুখশ্রীকে আঘাত করে ক্ষুণ্ণ করেছে। মিতশ্রী জানে না তার এই ছোট ছোট দুটো কাটা দাগ তার মুখে এমন এক ব্যক্তিত্ব দিয়েছে, যা তার দুর্মর সম্মোহনের অঙ্গ। সে নিজেকে নানাভাবে যত্ন করে সাজায়, শুধু নিজেকে নয়, নিজের পরিবেশকে, যা তার চালচিত্রের কাজ করে। তার বসবার ঘরে আছে বহুরকম আলো। নানান পয়েন্ট থেকে সে সুইচগুলো জ্বালে, নেভায়। কখনও বাঁ দিক থেকে আলো পড়ে তার বাঁ গাল নাকের খানিকটা অংশ, উজ্জ্বল একটি চোখ আলোকিত

থাকে, ডানদিক থাকে অন্ধকারে। রহস্যময় সে অন্ধকার। শৈল্পিক আবেদনে পূর্ণ। কখনও একটা বিশেষ জায়গা থেকে তার মাথার একটি কৌণিক বিন্দুতে আলো পড়ে কাঁধে গলায় হাতের ওপর মুখের নানান জায়গায় ছিটকে যায়। এভাবেই তার কাছে আবেদক অতিথিরা তাকে দেখে, একটি অপূর্ব ছবি, কিংবা শিল্পসম্মত ফোটোগ্রাফ, কিংবা ভাস্কর্যের মতো।

বড় বড় কনফারেন্সে মিতুল তার অঙ্গভঙ্গির জন্য খানিকটা অমর্যাদা পায়। যদিও লঘু উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে তার অধিকার অবিসংবাদিত। তেমন খানদানী মার্গসঙ্গীতের আসরে তার ডাক পড়ে না। তার বাবা এ জন্য একটু ক্ষুণ্ণ। কিন্তু মিতুলের ভারী বয়েই গেল। বড় বড় জলসা মিতশ্রী ঠাকুর ছাড়া হয়ই না। নানান ক্লাবের শীতকালীন জলসাতেও সে যায়। তার মতো একাদিক্রমে দাদরা, গজল, চৈতী, পপ-সংগীত, নজরুল গাইবে কে ? ইদানীং মিতুলের প্লে ব্যাক করা কয়েকটি ছবি হিট করার পর বম্বে থেকে তার ডাক আসছে। ওইসব খিচুড়ি গান গাইতে তার খুব একটা আপত্তিও নেই। কিন্তু বম্বের নাম-ডাক-অলা প্লে-ব্যাক সিঙ্গারদের থেকে এক পয়সাও সে কম নেবে না। এই শর্তে তাকে কেউ গ্রহণ করতে রাজি হচ্ছে না। মিতুলেরও গরজ নেই। সে গাইতে ভালোবাসে। নাচও তার স্বভাবজ। নিজেকে নানাভাবে দেখতে সে ভালোবাসে। কিন্তু কোনক্রমেই নিজের অমর্যাদা করে নয়। নিজের যাবতীয় শখ মিটিয়ে সে তার বাড়ি বাগান গাড়ি করেছে। জীবনের একমাত্র প্রিয়জন বাবাকে বৃদ্ধ বয়সে সুখে রাখতে পেরেছে। ছোটবেলা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস না পেয়ে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সীমিত। অন্তত উচ্চাকাঙ্ক্ষার পেছনে তাকে দৌড়তে হয়নি। যা পেয়েছে এতটাও সে আশা কবেনি। এর থেকে বেশি নিয়ে সে কী করবে ? তাকে সেক্রেটারি রাখতে হবে, ম্যানেজাব রাখতে হবে। এত ব্যস্ত জীবন যাপন করতে হবে যে নিজের ইচ্ছেমতো কিছু করতে পারবে না। যা চায় তা-ই তো সে পায়, আর তার কিসের গরজ ? খালি নিজের একটা প্রবৃত্তিকে মিতুল কিছুতেই দমন করতে পারে না। কোনও কোনও পুরুষ মানুষ কোনও কোনও মুহূর্তে হঠাৎ হঠাৎ তার মধ্যে এক লেলিহান আগুনের শিখা জ্বালিয়ে দেয়। তখন তাকে তার চাই-ই। যখন পায় না, কিছুতেই পায় না, তখন নিজের শোবার ঘরে বিশাল বিশাল আয়নার সামনে মিতুল নিজেকে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে তছনছ করে ফেলে।

আজকের প্রস্তাবটা নতুন ধরনের বলেই তার কৌতূহল। একটা সঙ্গীত-ভিত্তিক ছবি যাতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ও করবে সে আবার গাইবেও সে। টাকার অঙ্কটাকে অনেক উঁচুতে তুলে রেখেছে মিতুল। সে সস্তায় লভ্য নয়। বেশির ভাগ মানুষই যত পায়, তত চায়। মিতুল সেরকম না। খুবই আশ্চর্য কিন্তু সে একেবারেই সে রকম নয়। তার মনে আছে সে একটা ভ্রষ্টা মায়ের ফেলে যাওয়া পালক পিতার কন্যা। তার মনে আছে তার গলা আসলে ছিল কাকের মতো কর্কশ, এমনকি একসময়ে বাজখাঁই গলার পুরুষের মতো মোটা। সেই গলা তার বাবা সাধিয়ে সাধিয়ে, তাঁর নিজস্ব নানারকম জড়িবুটি করে এখন এক জোয়ারিদার, সমৃদ্ধ, সাধারণের থেকে একেবারে অন্যরকম কণ্ঠস্বর বার করেছেন। সে এ-ও জানে তার এতো

মানসম্মান, অর্থ, সম্পদ কাজে-কাজেই তার বাবারই জন্য। সে সম্ভবত তার মায়ের মতো দেখতে। যিনি নর্তকী ছিলেন বলেই বাবা কিছুতেই তার স্বাভাবিক নাচের ক্ষমতাকে প্রশ্রয় দিলেন না। দেননি ভালোই করেছেন। তার শরীরে মায়ের চিহ্ন কোনগুলো সে যদি জানতে পারত, তা হলে সে সেগুলো মুছে ফেলত, মুছে ফেলবার জন্য প্লাস্টিক সার্জনের কাছে যেত। কিন্তু তার বাড়িতে তার মায়ের একটি ছবিও নেই। অনেক খুঁজেছে সে। ট্রাঙ্ক-বাক্স হাঁটকেছে। পুরনো বিদেশি পত্রিকা হাঁটকেছে কিন্তু পায়নি, কোনও বর্ণনাও শোনেনি। বাবার সঙ্গে মিল নেই দেখে লোকে স্বভাবতই বলে সে তার মায়ের মতো দেখতে। সে সেটাই সত্যি বলে ধরে নিয়েছে। মার কথাগুলো সব মনে আছে, তার শেষদিনের সাজ-সজ্জা মনে আছে, শুধু ঘন চুলের মাঝখানে মুখের জায়গাটা শূন্য, একেবারে শূন্য, অথচ পাঁচ বছরে স্মৃতি তো বেশ ভালোই গজিয়ে যায়। মায়ের অনেক চুল ছিল সেটা মিতুলের মনে আছে, তাই সে নিজের চুল ছোট করে কেটে ফেলেছে। হেয়ার স্টাইল পাল্টে পাল্টে সে তার মুখের আদল বারে বারে পাল্টাতে থাকে। যত রকমের আধুনিক সাজ-সজ্জা, গয়নাগাঁটি পরে নিজেকে সে সমস্ত ঐতিহ্যের থেকে আলাদা করে ফেলে তার ব্যক্তিগত ইতিহাসের প্রতি তীব্র ঘৃণায়।

তার এখন যা টাকাকড়ি হয়েছে, বাড়ি-গাড়ি-বৈভব হয়েছে তা দিয়ে তার সব শখ মিটে যায়। আর কী চাই। পুরুষ মানুষ হলে মদ-মেয়েমানুষে উড়িয়ে দিত। যত পয়সা তত ফুর্তি। কিন্তু মিতুল মদ স্পর্শ করে না। এমনিতেই তার অনেকরকম শারীরিক, মানসিক মত্ততা আছে। কৃত্রিম মাদকতার দরকার হয় না। আর তার পছন্দসই পুরুষকে পাবার জন্য তাকে পয়সা খরচ করতে হয় না। যে তার ভেতরে সেই অপ্রমেয় বিদ্যুৎ জাগিয়ে দিতে পারে একমাত্র তাকেই সে গ্রহণ করে। অন্য সব আসঙ্গ-পিপাসুদের তার সুন্দর মুখের একটা দুর্বোধ্য হাসি নিয়ে ফিরে যেতে হয়। তার মা অনেক পুরুষ বিয়ে করেছে। মিতুল বিয়েই করবে না। তাই বলে প্রকৃতি তার শরীরে যে অপরিমিত আনন্দের ভাণ্ডার ভরে দিয়েছে, তাকে সে অস্বীকার করবে ? এ হতে পারে না। টাকা পয়সা নামযশ—এসবের লোভ দেখিয়ে তাকে কেউ কাবু করতে পারবে না। কিন্তু তার বারবার মনে হচ্ছে আজকের প্রস্তাবটা গ্রহণ না করলে সে একটা বড় কিছু হারাবে। সে নিজে তার পূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে, তার চলন-বলন, নাচ, গান সমস্ত নিয়ে সেলুলয়েডে চিরদিন বেঁচে থাকবে। এটা এক নম্বর। দ্বিতীয় হচ্ছে যে প্রোডিউসার এবং ডিরেক্টরটি তার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন তার মধ্যে ডিরেক্টর অর্থাৎ গৌরাঙ্গ সিনহার সঙ্গে তার আগেই এক জলসায় দেখা হয়েছে, যেখানে তিনি প্রস্তাবটা প্রথম তাকে দ্যান। এই গৌরাঙ্গ সিন্হা হঠাৎ তার মধ্যে সেই অগ্নি সঞ্চার করেছেন যা সে কিছুতেই নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। কিন্তু মিতুল এসব কথা ভদ্রলোককে জানতে দেয়নি। একটি কটাক্ষ, একটি উত্তেজক হাসিও না। সে শুধু তার বসবার ঘরের আলোগুলোকে পছন্দমতো জ্বালিয়েছে। একটি মেখলা পরেছে, লম্বা একটি সোনার মফ-চেন ঝুলিয়ে দিয়েছে গলায়। কানে বীরবৌলি। লম্বা লম্বা আঙুলের নখগুলো লালচে গেরুয়া রঙে রঞ্জিত করেছে। হাতের সোনার চুড়ি

এতো সরু যে মাঝে মাঝে তা শুধু ঝলকায়। আঙুলে কোও মহার্ঘ রত্ন নয়। একটা মস্ত বড় গোল্ড স্টোনের আংটি।

জি সিনহা এবং কেজরিওয়াল তাঁদের বম্বে-ব্র্যান্ড গাড়িতে যেতে যেতে মিতশ্রীকে নিয়েই আলোচনা করছিলেন। কেজরিওয়াল সিটে হেলান দিয়ে বললেন, 'উই মাস্ট হ্যাভ হার অ্যাট এনি কস্ট। ইট উইল ব্রেক রেকর্ডস। উই ওন্ট হ্যাভ টু টীচ হার এনিথিং। শী ইজ লাইক এ প্রিজ্‌ম্‌, ফ্যাসিনেটিং ফ্রম এভরি অ্যাঙ্গল।' সিনহা বললেন—'ইয়া। শী নো'জ এ টু জেড অফ শোম্যানশিপ। ইউ আর রাইট। ওয়েল ইটস ইয়োর মানি, দা ডিসীশন টু ইজ ইয়োর্স।'

মিতুল অন্যমনস্কভাবে তানপুরার তারগুলিতে লঘুভাবে আঙুল চালাচ্ছিল। সুরের পরিমণ্ডল তৈরি হয়ে যাচ্ছিল ঘরময় কিন্তু তার সঙ্গে তার কণ্ঠ সংযোগ হচ্ছিল না। হঠাৎ সে শুনতে পেল রামেশ্বর ডাকছেন—'মিতুল! মিতুল!' সে তানপুরাটাকে কোলের কাছ থেকে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল, সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে দেখল বাবা সিঁড়ি দিয়ে কেমন উদ্বিগ্ন হয়ে নেমে আসছেন।

—'ওরা কে এসেছিল? মিতুল? ওরা কে? দেখলুম একটা হুড খোলা বিরাট গাড়ি!' রামেশ্বরের গলায় ভীষণ উৎকণ্ঠা। মিতুল তার আঙুলের আংটিটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলল—'ওরা বম্বের লোক। আমাকে ফিলমে নামতে বলছে।'

—'তুই রাজি হলি নাকি? নামবি ফিলমে?'

মিতুল বলল—'এর আগে যে ফিলমের অফার আমাব আসেনি, তা তো নয়! আমি কি নিয়েছি সেগুলো বাবা?'

—'না, তা নিসনি। এ লোকগুলো আরও পয়সাঅলা।'

—'তোমার ধারণা পয়সা বেশি দিলেই আমি সব করতে পারি! বাবাই, তোমার এ ধারণা কেন হল, আমায় বলবে?'

মিতুল এখন সিঁড়ি অবধি চলে এসেছে। সিঁড়ির রেলিং-এর পেতলের মুণ্ডিটার ওপর তার হাত। তার বাবা সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে আছেন। ধপধপে ধুতি আর হাফ পাঞ্জাবি পরা।

রামেশ্বর ইতস্তত করে বললেন—'না, তা নয়।'

—'তোমার ভয়টা কিসের? আমি তোমায় ছেড়ে চলে যাবো? কারো সঙ্গে? যাবার হলে অনেক আগেই যেতাম। কথাটা কি জানো বাবাই, তোমাকে ছাড়া আর সব পুরুষ মানুষকে আমি ঘেন্না করি। —ঘেন্না! ঘেন্না করি।'

রামেশ্বর কিরকম কাঁপছিলেন ভেতরের একটা আবেগে, কান্না চাপবার চেষ্টায়। এই বয়সে চট করেই আবেগ মানুষকে অধিকার করে নেয়।

মিতুল বলল—'বাবাই তবে একটা কথা। এরা আমাকে সাধারণ ফিলমের জন্য ডাকছে না। এরা একজন গায়িকার জীবন নিয়েই গল্পটা তৈরি করছে বাবাই। এই গায়িকার রোলটাই ওরা আমাকে দিতে চাইছে। ন্যাচার‍্যালি প্লে-ব্যাকও করব। যদি ওরা ঠিকঠাক মূল্য দেয় তো অফারটা আমি নেবো, টাকার জন্যে নয়। বাবাই সামহাউ আই ফীল স্টিম্যুলেটেড, ক্রিয়েটিভলি।'

রামেশ্বর বললেন—'মিতুল, লোকগুলো ভালো নয়। আমি বুঝতে পারি।'

—'ডোন্ট ওয়ারি বাবাই। ভালো নয়, খুব খারাপ এরকম অনেক লোকের সঙ্গেই আমি মোকাবিলা করেছি। করতে হয়। ইনক্লুডিং ইয়োর সোহম চক্রবর্তী।'

রামেশ্বর হঠাৎ একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। মিতুল প্রায় তাঁর হাত ধরে তাঁকে ওপরে নিয়ে গেল, যদিও তিনি ততটা বৃদ্ধ বা অক্ষম হননি। কিন্তু তিনি এখন ভেতরে ভেতরে কী ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছেন মিতুল স্পষ্ট বুঝতে পারছে। এই একটা জায়গায় সে তার বাবাকে ইচ্ছে করে আঘাত করে। সম্পূর্ণ ইচ্ছে করে। তার প্রতি ওই অমানুষিক ব্যবহারের পরও বাবা সোহমকে পছন্দ তো করেনই, তাকে তার সঙ্গীত জীবনে চূড়ান্ত সাহায্য করেছেন, সম্ভবত তাকে ভীষণ ভালোও বাসেন। এটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। সোহমের এখন প্রচণ্ড নাম-ডাক। খেয়াল থেকে সে এখন খানিকটা সরে গেছে। কিন্তু ঠুংরিতে তার মতো ওস্তাদ কমই আছে ভারতে। আর গজলে সে প্রায় একচ্ছত্র নায়ক এখন। বড় বড় খানদানী কনফারেন্সে সে বিশেষ করে ঠুমরীর জন্যেই ডাক পায়। কোনও কোনও গজলের মাইফেল বসে শুদ্ধু তাকে নিয়েই। আবার কিছু কিছু কনফারেন্স তাকে একেবারেই ডাকে না। যেহেতু সে আগে খেয়াল গেয়ে পরে ঠুম্‌রী-দাদরা ইত্যাদির দিকে যায় না। তবে সোহমের বেশির ভাগ প্রোগ্রামই এখনও পর্যন্ত কলকাতার বাইরে। দূরদর্শনের মাধ্যমে কিছু কিছু শোনা এবং দেখা গেছে। মুখোমুখি হওয়ার আজ পর্যন্ত সুযোগ হয়নি। সুযোগ না হলেই ভালো। সোহম এখন খুব সম্ভব লন্ডনে। খুব নাকি জমিয়েছে।

বাবাকে নিয়ে দোতলায় ওঠবার পর মিতুল হঠাৎ দৃঢ়সঙ্কল্প হল। বলল —'সোহম আমাকে সেদিন কী বলেছিল জানো?'

রামেশ্বর হাত নেড়ে উড়িয়ে দেবার একটা ভঙ্গি করলেন। ভাঙা ভাঙা স্বরে বললেন—'সে তখন উন্মাদ মিতুল, মাথার ঠিক ছিল না।'

—'তাই বলে সে তোমাকে লম্পট বলবে? মাকে যা খুশি বলুক। যদিও বলবার কোনও অধিকার তার ছিল না। কিন্তু তুমি তার গুরু। তুমি দেবচরিত্র মানুষ। বাবা আমি আমার জীবনে অনেক গুরু, অনেক ওস্তাদ দেখেছি। আই নো দেম ইনসাইড আউট। তোমাকে অফ অল পার্সন্‌স্ সে এ কথা কি করে বলে? আর আমার ঘরে যখন এসেছিল তখন একটু উত্তেজিত ছিল ঠিকই, কিন্তু তখনও ও যাকে বলে উন্মাদ তা নয়। ছুরিটা যখন-তুলে নিল, তখন না হয় অনেক ওকালতি করে শয়তানের বদলে ওকে উন্মাদ বলে চালাতে চেষ্টা করতে পারো।'

রামেশ্বর প্রথম দিকের 'লম্পট' শব্দটা শোনবার পর আর কিছু শুনতে পাননি। ভোঁ ভোঁ করছে সব ইন্দ্রিয়গুলো। লম্পট! লম্পট! লম্পট! সোহম তাহলে তাঁর পূর্বাপর সব ইতিহাসই জানে। কখনও তাঁর কাছে প্রকাশ করেনি তো! মিতুল জানে না। মিতুল যদি জানতে পারে! মিতুল ছাড়া কেউ নেই তাঁর। তিনি তার কাছে মিথ্যাচার করেননি কোনদিন। শুধু সত্য গোপন করে গেছেন। তাঁর তো আর কেউ নেই! মিতুলের শ্রদ্ধা তিনি কি করে হারাবেন?

তিনি সামান্য একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'মিতুল, মা, সোহম হয়ত ঠিকই বলেছিল। তবে মানুষ তো বদলায়!'

মিতুল দেখল বাবার চোখে জল চিকচিক করছে। সে বলল—'অ্যায়্যাম সরি বাবা। কিন্তু তোমার জানা দরকার কেন আমি সোহমের ওপর বীতশ্রদ্ধ। তা ছাড়া আমরা সবাই এখন গ্রোন-আপ, বাবাই। তিরিশ-পার হওয়া মেয়ের কাছ থেকে বাবা এসব শুনতেই পারে! লুকোচুরি করে কী লাভ!'

লুকোচুরি! সত্যিই তো তিনি আজীবন মিতুলের সঙ্গে লুকোচুরি করে এসেছেন। নিজেকে বুঝিয়েছেন মিতুলেরই ভালোর জন্যে। কিন্তু তাঁর নিজের ভালোর জন্যেও কি নয়! মিতুলের যে সাফল্য, ঐশ্বর্য তিনি ভোগ করছেন এ তো ভোগ করবার কথা ছিল কাশীর সেই অখ্যাত গলির অখ্যাত পণ্ডিত কেদারনাথজীর! তিনি তো অনধিকারী। সবচেয়ে দুঃখের কথা তার মায়ের ভ্রষ্টতার কথা সে জেনে গেছে। কিন্তু তিনি নিজেও যে একই পাপে পাপী তা জানে না।

হঠাৎ তিনি নিজেকে বলতে শুনলেন—'মিতুল, আমি সত্যিই অপরাধী। তোর আসল বাবার কাছ থেকে তোর মায়ের সঙ্গে আমি তোকেও কেড়ে এনেছিলাম। শিষ্যের কাছ থেকে এ অপমান আমার পাওনা বাবা,' বলতে বলতে তিনি বারান্দার ইজিচেয়ারটায় বসে পড়লেন। তাঁর চোখে জল নেই, কিন্তু বুক হু হু করে জ্বলছে। তাঁর মুখ ঝুলে পড়েছে।

মিতুল বাবাকে জড়িয়ে ধরে আস্তে বলল—'জানি। কেঁদো না।'

রামেশ্বর মিতুলের মুখের দিকে চাইতে পারছেন না, শুধু অবাক হয়ে বললেন—'জানিস?'

—'আমি তোমার যত্ন করে লেখা ডায়েরিটা অনেক অনেকবার পড়েছি বাবাই।' মিতুল বাবার কোলে মাথা রাখল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—'তুমিই আমার সত্যি বাবা। কে সেই পণ্ডিত যার ভীমরতি হয়েছিল বুড়ো বয়সে যুবতী বাইজি বিয়ে করবার আমি জানতে চাই না। তুমি জীবনে আর কখনও বলবে না তুমি আমার বাবা নও।'

রামেশ্বর ফিকে হেসে বললেন—'বাবার ডায়েরি পড়তে তোর একটুও বাধল না! মিতুল! তুই তো বড্ড দুষ্টু!'

—'এবং পাকা। ডায়েরিটা আমি বোধহয় আঠার-উনিশ বছর বয়সে প্রথম পড়ি।'

—'বলিস কি? এতদিন ধরে...মিতুল তখন...তখনও কি তোর কোনও...'

—'ইট ওয়জ এ জোল্ট। ডেফিনিটলি। বাবা যেদিন আমি জানলাম অন্য একটা লোক আমার বাবা সেদিন জানলার পাশে চুপ করে বসেছিলুম। দেখলুম তুমি দুটো ডাব নিয়ে বাড়ি ঢুকছো, তারপর কিছুক্ষণ পর তুমি ডাবে বরফের কুচি আর গোলাপ জল-টল দিয়ে কী একটা শরবত করতে, সেইটে এক গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকলে, বললে 'মিতুল, এটা খেয়ে নে তো। বড্ড গরম পড়েছে।' বাবাই আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তুমি কিরকম রাতের পর রাত আমায় পিঠে ফেলে পায়চারি করতে করতে গান করতে, একদিন দু ঘণ্টা পরপর গল্প বলবার পরও যখন আমার আরও গল্পের আবদার থামল না, তুমি

করুণ চোখে চেয়ে বললে—আর তো গল্প মনে পড়ছে না মিতুল, তখন আমি রেগে-মেগে তোমার প্রিয় এসরাজটা আছড়ে ভেঙে ফেলেছিলুম। তুমি ভাঙা এসরাজের টুকরোগুলো, ছেঁড়া তারগুলো সযত্নে কুড়িয়ে তুলছো এখনও আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাই। সেই ভাঙা এসরাজ জোড়া যায় না। কিন্তু তুমি জুড়ে ফেলেছো সারা জীবন ধরে। তোমার কণ্ঠ ক্লান্ত করা পয়সা দিয়ে আমার কনভেন্টের ফীজ হত, পোশাক হত, খেলনা হতো, যার অনেক কিছু হয়তো না হলেও চলে যেত। বাবাই, নাউ আয়্যাম আ উওম্যান, আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ, আই ক্যান অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড মাই মাদার। বেনারস ছেড়ে চলে আসবার জন্য মাকে আমি দোষ দিই না, দোষ দিই, তোমাকে ফেলে আমাকে ফেলে চলে যাবার জন্যে। বাবা তুমিও তো মানুষ, একটা অন্যায় হয়ত করে ফেলেছিলে কিন্তু সারা জীবন তার জন্য পৃথিবীর কাছে, আমার কাছে মাথা হেঁট করে আছো। বেনামে তুমি সেই কেদারনাথজীকে কত টাকা পাঠিয়েছো, তার হিসেবও আমি তোমার ডায়েরিতে দেখেছি। বাবাই আই ডোন্ট সি আ সিনার ইন ইউ।'

রামেশ্বব কথা বলতে পারছেন না। সুরসবস্বতী তাঁকে শাস্তি দিয়েছেন, আকণ্ঠ শাস্তি। কিন্তু তিনি ক্ষমাও করতে জানেন। তাঁর শাস্তি কোথা দিয়ে আসবে যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি অকল্পনীয় তাঁর ক্ষমার পথ।

মিতুল অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,—'বাবা, ডোন্ট মাইন্ড, তোমাকে আমি আর একটা কথা বলব। ঠিক বলব না। প্রশ্ন করব। উত্তর দেবে? সঠিক?' রামেশ্বর ভয়ে ভয়ে মিতুলের দিকে তাকালেন শুধু। মিতুল বলল—'তোমার মনে হয় না শিল্পীরা অন্য মানুষের থেকে একটু অন্যরকম!'

—'সে তাদের সৃজনী ক্ষমতায় তো বটেই' রামেশ্বর বললেন, 'নইলে তারাও ঠিক আর পাঁচটা মানুষের মতো। মা, বাবা, বধূ, ভগ্নী তফাত হবে কেন?'

—'না বাবা, যারা সব সময়ে শিল্পের মধ্যে ডুবে থাকে তোমার মতো, আমার মতো, তাদের চাহিদা, তাদের আবেগ একটু অন্যরকম। গানের চর্চা এইভাবে করতে করতে একটা শিল্পী একটা সূক্ষ্ম যন্ত্রের মতো হয়ে যায়। যদি কোনও কিছুর স্পর্শে,কোনও মানুষের সঙ্গে তার শরীর মনের সেই সূক্ষ্ম তারে ঝংকার ওঠে, সে গেয়ে উঠবে না? ঝংকৃত হবে না। বাবাই, অন্য নর্ম্যালি মানুষের ক্ষেত্রেও এটা হয়, তবে কম। কিন্তু শিল্পীর ক্ষেত্রে এটা অবশ্যম্ভাবী। তোমার ক্ষেত্রেও তা হয়েছিল। আমার ক্ষেত্রেও তা হবে। এটা তোমাকে এবার মেনে নিতে হবে বাবাই।'

রামেশ্বরের ভিতরে আবার কাঁপুনি শুরু হল। ভয়ের কাঁপুনি। মিতুলের ক্ষমার মধ্যে কি তাহলে শর্ত আছে?

মিতুল বলল—'কি.হল বাবাই, কথা বলছ না যে!'

রামেশ্বর বললেন—'তুই যে "নর্ম্যাল" কথাটা ব্যবহার করলি মিতুল। ওটার ওপর তোর যদি শ্রদ্ধা থাকে তাহলে শিল্পীদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে নর্ম্যাল হবার।'

মিতুল এখন উঠে আধো-অন্ধকার-বারান্দাটায় আস্তে আস্তে পায়চারি

করছে। সে বলল—'ফ্রয়েড কিন্তু বলেন শিল্পী মাত্রেই খানিকটা অ্যবনর্ম্যাল। নর্ম্যাল হতে হলে তাকে তার শিল্প হারাতে হয়। অ্যাবনর্ম্যাল মানে পাগল-ছাগল নয়। অ্যাবনর্ম্যাল, মানে গতানুগতিক, একেবারে সেন্ট-পার্সেন্ট—যুক্তি বুদ্ধি খতিয়ে-দেখা মানুষ সে নয়। সেন্ট পার্সেন্ট সেন মানে একটা টেরিফিক বোর, বাবা, আমার মনে হয়, সে রকম মানুষ আমি এ যাবৎ সত্যি দেখিনি। এনিওয়ে, তোমার কী বলবার আছে বলো।'

রামেশ্বর বললেন—'মিতুল, তুই যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাস, তো সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি যা পেয়েছি তা তো মিথ্যে হয়ে যাবে। তোকে যেমন সঙ্গীতের উত্তরাধিকার দিয়েছি, তেমনি জীবনের অভিজ্ঞতার সারবস্তুটুকুও যদি না দিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমি যেখান থেকে আরম্ভ করেছিলুম, সেইখান থেকে আরম্ভ করে, আমি যেখানে শেষ করছি, সেই ভয়ংকরে তুই শেষ করবি মা। তোকে যদি আমার কাঁধে চড়িয়ে দিতে না পারি, আমার তো তাহলে কিছুই করা হল না। জীবনে করার মতো কাজ তো আর কিছুই করতে পারিনি।'

মিতুল বলল—'বাবাই তুমি উচ্ছৃঙ্খলতা বলতে যা মীন করছো, সেভাবে উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার কথা আমি ভাবছি না। আসলে বাবাই তোমরা অন্য যুগের, আমরা তোমাদের মতো ইলোপ-টিলোপ করে চিরদিন পাপের ভয়ে জবুথবু হয়ে বসে থাকি না। যা ক্ষণিকের, যা পথের তাকে পথেই ফেলে আসতে পারি। আমরা জানি কাঞ্চনজঙ্ঘা খুব মহিমময়, তার সেই মহিমা এক দুর্লভ ক্ষণে উন্মোচিত হয়, আবার পরক্ষণেই মেঘে ঢেকে যায়। এই কাঞ্চনজঙ্ঘাকে আমরা তার দুর্লভতাসমেত উপভোগ করি। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে, সকালের সূর্যের জাদুমাখা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে যে বাড়িতে উঠিয়ে আনা যায় না, সব সময়ে তাকে দেখার আশাও যে দুরাশা এটা আমরা জানি। হোয়াট আই মীন ইজ বাবাই আমি যদি বাইশ শ্রুতিতে কিম্বা ধরো বাইশ ইনটু একশ ইকোয়ালস বাইশ শ' শ্রুতিতে বাজতে পারি, তুমি তোমার ওল্ড ভ্যালুজ দিয়ে আমার নৈতিক বিচার করবে না। কখনও মনে করবে না তোমার মেয়ে তোমার কৃতকর্মের জন্য তোমার ওপর শোধ তুলছে। তোমাদের জেনারেশনের পক্ষে সেটা ভাবাই স্বাভাবিক। আই ওয়ান্ট টু বি আ ফ্রী বার্ড, অ্যাবসল্যুটলি ফ্রী, অ্যাজ আ বার্ড, আ মেল বার্ড, অ্যান্ড আই ক্যান নেভার ডেজার্ট য়ু। এ সব কথা তোমাকে কখনও বলতাম না। কিন্তু আজকাল তোমার মুখে খুব উদ্বেগ দেখি, দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে থাকো। একেক সময়ে অনর্থক আমার ওপর রাগ করো। তাই বললাম। আমার মাথার ভেতরে, বুকের ভেতরে কোথাও একটা স্থির বিন্দু আছে বাবাই, আ স্টিল পয়েন্ট। গোলকধাঁধার মতো নানান পথ ঘুরে ঘুরে আমি সেই বিন্দুটাতে ঠিক পৌঁছে যাই।'

রামেশ্বর সাগ্রহে বললেন—'সেই বিন্দুটা। সেটাই আসল। মিতুল সেটা খুঁজে পেয়েছিস তাহলে। তুই তুলনা দিতে বাজনার সঙ্গে বাজার কথা বললি। বাজা অনেক লেভেলের হতে পারে মা। সে এক অদ্ভুত বাজা। ইন্দ্রিয়কে ভর করে ইন্দ্রিয়ের বাইরে চলে যাওয়া, আকাশের সঙ্গে, বিশ্বলোকের সঙ্গে মিশে যাওয়া, সেইরকম বাজা...

মিতুল হেসে বলল—'বাজি তো বাজব। বললাম তো বাবাই আই অ্যাম আ ফ্রী বার্ড। আমি জানি না শেষ পর্যন্ত কিসে পৌঁছবো, কোথায় পৌঁছবো, বাট আই কীপ মাইসেল্‌ফ ওপ্‌ন। লেট মি লিভ মাই লাইফ, প্লিজ।'

বারান্দার গোল আলোর তলায় মেখলা পরা মিতুল দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানে ওখানে চিকচিক করেছি সোনা। কানের বীরবৌলি দুলছে দুলছে। মিতুল তার অনেক দিনের বলতে চাওয়া কথাগুলো বাবাকে বলে ফেলতে পেরেছে, সে এখন তাই মগ্ন, মুক্ত, উর্বশী, কিন্তু অন্য উর্বশী। পুরুষ-বক্ষে রক্তধারা নাচাতে সে ব্যগ্র নয়। সে একদম মুক্ত, কারো নয়, অপ্সরা, জলকন্যা। সে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

রামেশ্বর বারান্দার ঠাণ্ডা অন্ধকারে বসে রইলেন। আজ প্রথম তিনি অনুভব করলেন মিতুল তার মায়ের মেয়ে নয়, পণ্ডিত কেদারনাথেরও মেয়ে নয়, তাঁর নিজের প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ—তা-ও নয়। সে বোধহয় সত্যি-সত্যিই তাঁদের তিনজনের কাঁধকে পর পর সিঁড়ির মতো ব্যবহার করে উঠে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে অনেক উঁচুতে, স্বর্ণ ঈগল যেমন দাঁড়িয়ে থাকে, অনেক উঁচুতে, একা, আপন ইচ্ছায়। যে কোনও সময়ে সে তার সোনালি পাখা বিস্তার করে উড়ে যাবে, যখন উড়বে মনে হবে না সে এই পৃথিবীর, কিন্তু আবার একদিন এসে বসবে এই কাঁধের ওপর, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় । আবার উড়ে যাবে । যাক। যা মিতুল, যারে আমার আগুনের পাখি, তোর পা থেকে খুলে নিলুম ঘর-ঘরানা আর খানদানের ভারী ভারী শেকল। ওড়। উড়তে থাক।

॥ ১৬ ॥

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। সরু রাস্তা। একটা নতুন ছাইরঙের মারুতি এসে থামল। নীচের ঘরে অপালা গান শেখায় এ সময়টা। বৃষ্টির জন্য বোধহয় আজ ছাত্র-ছাত্রী কম। সে নিজে রাস্তার দিকে মুখ করে বসে। দরজার একটা পাল্লা সামান্য বন্ধ। অপালার এই ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা একটু পরিণত। এদের তার শেখানোর ধরন একদম অন্যরকম। প্রত্যেকে তানপুরো হাতে বসে থাকে। অপালার নিজের হাতে স্বরমণ্ডল। সে বেশ খানিকটা সুরবিহার করে থামে, তারপর একটু একটু করে সেটা আবার করে, সে একটু করার সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্র-ছাত্রীদের গলায় সেটা করে দেখাতে হয়। এই ব্যাচে মাত্র পাঁচ জন। এসেছে আজ তিন জন। সে আজ বেহাগ নিয়ে পড়েছে। গান দিচ্ছে প্রথমে 'পানিয়া ভরনে ক্যায়সে জাউঁ সখী ম্যায়/বিচমে ঠাড়ো কুমার কনহাই। নি সা ম গ। প প নি নি। পা নি য়া ভ। র ণ কয়সে বেশ কিছুক্ষণ গাড়িটাকে একটু আগে দাঁড় করিয়ে অপালার সুরবিহার শুনল মিতুল। আজকাল অপালা মাস্টারমশাইয়ের কাছে নিয়মিত যেতে পারে না। মাস্টারমশাই, না মিতুল সল্ট লেকে অপূর্ব এক বাড়ি বানিয়েছে। কিন্তু বড্ড যে দূর। অপালা আজকাল বেশির ভাগ শম্পাদির কাছেই যায় । কিন্তু শম্পাদির কাছে বাজনা শিখতেই এতো ছাত্র-ছাত্রী আসে যে তার নিজের জন্য তাঁকে বেশি খাটাতে তার সঙ্কোচ হয়। মাস্টারমশাইয়ের কাছে গেলেও মিতুলের সঙ্গে

কখনও দেখা হয় না। সে বাড়ি নেই। অপালা কোথাও যায় না, রেডিও বা দূরদর্শনের রেকর্ডিং-এর জন্য যেতেই হয়। বাড়িতে একটা চাপা অসন্তোষ, একটা বিরুদ্ধতার আবহাওয়া সৃষ্টি হচ্ছে সে বুঝতে পারে। মাঝে মাঝে শুধু মায়ের কাছে, দীপুর মা বা মাসীমার কাছে। বাস।

গাড়িটা মিতুল এগিয়ে এনে এবার দরজার প্রায় মুখোমুখি দাঁড় করালো। কত দিন মুখোমুখি বসে অপুদির গান শোনা হয়নি। গলা, শুধু গলাই কী! গাড়িটা অপালা চেনে না। সে একটু অবাক হয়ে চেয়ে আছে, গান থামিয়ে। ভেতর থেকে জীনস্ পরা একটা পা নামল, তারপর পুরো চেহারাটা দেখতে পেল অপালা। মিতুল। মিতুল এসেছে। মিতুলের প্রচণ্ড নামডাক আজকাল। গানের সঙ্গে সঙ্গে তার নানা ধরনের মুদ্রা বা মুদ্রাদোষের বিরূপ এবং অনুকূল দুরকম সমালোচনাই সে শুনতে পায়। কচিৎ কখনও দূরদর্শনে তার প্রোগ্রামও দেখেছে। সেই বিরক্তিকর, মেঘ, ফুল, পাখি, বৃষ্টি ইত্যাদি দিয়ে গানকে দৃশ্যমান করবার চেষ্টা-ওলা প্রোগ্রাম। আরে বাবা, গান কান দিয়ে শোনার জিনিস, তাকে তার নিজের ক্ষমতায় মরমে পশতে দাও! আর গায়ক, তাকে চোখে দেখা সেও এক অভিজ্ঞতা। গান গাওয়ার সময়ে সম্পূর্ণ তার নিজের ব্যক্তিত্বে। অভিনয় করতে করতে নয়। শ্রোতার কাছে তাকে প্রকাশিত হতে দাও। দূরদর্শন মিতুলকে এইসব প্রোগ্রামে হাজির করে। লম্বা আঁচল দুলিয়ে মিতশ্রী গাছের ফাঁক দিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার পর আবার এক জাজিম পাতা হলঘরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বসে পড়ল। এই রকম প্রোগ্রাম দেখে তৃপ্তি হয় না অপালার। মিতুলের কয়েকটা ক্যাসেটও তার কাছে আছে। কিন্তু চোখের সামনে এই বৃষ্টিঝরা বিকেলে জীনস্ এবং আলগা সাদা শার্ট পরা মিতুল যে একটা কী সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা হতে পারে তা অপালা কল্পনা করতে পারেনি।

তার ছোট ঘরের ছোট্ট দুয়ার একেবারে ঝলসে দিয়ে এসে দাঁড়াল মিতুল। এ যেন ভেঙেছো দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময়! অন্তত অপালার মনে লাইনটা ঝলসে উঠল বিনা প্রয়াসে। সে বলল—'মিতুল! মিতুল তুই!'

তার ছাত্র-ছাত্রীদের সকলেই মিতশ্রীকে চেনে। বহু জলসায় টিকিট কিনে তার গান শুনেছে। এতো সামনে থেকে তাকে দেখবে কল্পনাও করতে পারেনি। —তাদের অপালাদির মিতশ্রী ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ আছে। এইরকম ডাকনাম ধরে, তুই করে ডাকার আলাপ!

মিতুল বলল—'অপুদি, আজ তোমার ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি দিয়ে দাও। আমার বড্ড দরকার তোমার সঙ্গে।'

অপালা বলল—'মিতুল দু মিনিট বোস। আমার হয়ে গেছে। ছোট্ট একটা নোটেশন লিখিয়ে দিচ্ছিলুম।'

মেঝেতে পাতা শতরঞ্জির ওপর দু হাঁটু একদিকে মুড়ে বসল মিতুল। তার আলগা শার্টের ওপরের বোতাম খোলা। সোনার হারের সঙ্গে চকচকে একটা মোহর সেখানে দুলতে দেখা যায়। আজকে চুলটাকে সে সম্পূর্ণ তুলে একটা হর্স-টেল করেছে। ঠোঁটে একটু লিপ-গ্লস। তাকে দেখাচ্ছে কলেজের মেয়েদের মতো। যদিও সেটা কোনও স্বপ্নলোকের কলেজ। নোটেশন

দেওয়া শেষ করে অপালা ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে হাসল। খুব অনিচ্ছুকভাবে বেরিয়ে গেল তিনটি ছেলে মেয়ে। মিতশ্রী ঠাকুরের সঙ্গে তাদের গানের দিদির কী জরুরি কথা ছিল তা শোনবার তাদের যথেষ্ট ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তারা প্রত্যেকে দৃষ্টির আড়ালে চলে না যাওয়া পর্যন্ত মিতুল শুধু একটু চিন্তান্বিত মুখে তার আঙুলের আংটিটা ঘোরাতে লাগল।

ওরা চলে গেলে মিতুল বলল—'অপুদি, তুমি একমাত্র তুমিই তাহলে আমার বাবার প্রকৃত ভাবশিষ্যা হলে। প্রধানদের মধ্যে। লক্ষ লক্ষ পঙ্গপালের কথা আমি বলছি না।'

অপালা হেসে বলল—'কি দেখে বলছিস ? বুঝতে পারছি না।'

—'এই নিজের গান ছেড়ে যত রাজ্যের অবচীনদের নিয়ে পড়েছো ! অন্যদের তৈরি করার মহাসাধনায় মহামগ্ন। বলি তোমার নিজের গান কি হল ?'

বাইরে নিমগাছটার ওপর বিকেলের শেষ কাকের দল ডেকে উঠল। মেঘ ভেঙে এইবার শ্রাবণের অপূর্ব গোধূলি আলোর জোয়ার ঢুকছে অপালার ঘরে।

অপালা বিমর্ষ স্বরে বলল—'আমার পরিস্থিতিতে যতদূর পারছি গাইছি মিতুল। শেখাই। কারণ শেখাতে আমার ভালো লাগে। এক ধরনের রেওয়াজও হয়ে যায় তাতে। কিন্তু তুই তো জানিস আমি না গেয়ে পারি না।'

—'টাকার জন্যে শেখাও ?'

—'না, তা ঠিক নয়। তোকে তো বললুমই ভালো লাগে। প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালাগুলো বারে বারে ঝালিয়ে নেওয়া হয়ে যায়। আর টাকার কথা যদি বলিস, সংসারে টাকার দরকার না থাকলেও মেয়েদের নিজেদের হাতে একদম নিজস্ব কিছু টাকারও দরকার হয়। হয় না ?'

মিতুল এক রকমের বাঁকা হেসে বলল—'অফ কোর্স। নিজের হাতে নিজের উপার্জনের টাকা ছাড়া কোনও মেয়েই পুরো মানুষ নয়,হয় ছেলেমানুষ, নয় মেয়েমানুষ। কেন জানবো না অপুদি ! না-ই বা বিয়ে করলুম। কিন্তু রামেশ্বর ঠাকুর শেখানোয় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন গলা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে, তোমার তো তা নয় ! বছর দশেক আগেও কোনও কনফারেন্স অপালা দত্তগুপ্তকে ছাড়া ভাবা যাচ্ছিল না। আসরের শেষ আর্টিস্ট হিসেবে নয় অবশ্য, তার জন্যে পণ্ডিতজী ওস্তাদজী এঁরা আছেন। কিন্তু সন্ধ্যায়,প্রথম রাতে শোনা যেত। কিন্তু আজকাল অপালা দত্তগুপ্তকে নিয়মিত বলতে গেলে রেডিও ছাড়া শোনাই যাচ্ছে না। রেডিও শোনে খুব কম লোকে। দূরদর্শনে খুব মাঝে মাঝে দেখি। ব্যাপারখানা কী বলো তো ?'

অপালা হেসে তার বিমর্ষতাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে বলল—'এত দিন পরে হঠাৎ এরকম নাটকীয়ভাবে উদয় হয়ে তুই শক্ত শক্ত প্রশ্ন করতে শুরু করলে আমি কী করে উত্তর দিই বল তো ? ভাবতে হবে কেন !'

মিতুল বলল—'অপুদি, আর যে শোনে না শোনে আমি রেডিও খুলে নিয়মিত তোমার গান শুনি। দূরদর্শন, তা-ও নেহাত অন্য কাজ না থাকলে মিস করি না। অপুদি, তুমিও একরকম আমার গুরু, অ্যান্ড ইউ আর স্টিল

ওয়ান্ডারফুল। আ সিঙ্গার অফ সিঙ্গার্স। বাট...'

অপালা চেয়ে আছে, মিতুল বলল—'বাট দি অডিয়েন্স হ্যাজ চেঞ্জড। তাই যখন মিতশ্রী ঠাকুরের পঁচিশটা ক্যাসেট এখন বাজারে চলছে, সেখানে অপালা দত্তগুপ্তর একখানাও নেই।'

অপালা বলল—'মিতুল তুই লাইট ক্ল্যাসিকাল গাস। নজরুল গাস। পপ গাস। তোর তো অত রেকর্ড হওয়া স্বাভাবিকই। তা ছাড়াও তুই প্লে-ব্যাক করিস। আমি বিশুদ্ধ মার্গসঙ্গীত গাই। হীরাবাই, কি মঘুবাই এঁদের স্তরে তো উঠতে পারিনি যে, যে আমার রেকর্ড করতে ছুটে আসবে লোকে! ও সব নিয়ে আমি ভাবি না।'

মিতুল বলল—'অপুদি, তোমায় আমার বড্ড দরকার। বলো যা চাইব দেবে! বলো আগে!'

এই সেই পুরনো মিতুল। আবদেরে। নাছোড়বান্দা। মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির জমজমাট সঙ্গীতসন্ধ্যা। মিতুল হঠাৎ মজলিশের মধ্যিখানে বসে পড়ত, বলত, 'আর গান নয়। কিছুতেই কাউকে গাইতে দেবো না, দেবো না।' মাথাটা ক্রমাগত নাড়ত মিতুল। কিছুক্ষণ তাকে শান্ত করার চেষ্টা করতেন মাস্টারমশাই। তারপরে হার মানতেন। করুণ গলায় বলতেন—'তবে আর কি হবে? আজ মিতুল ঠাকরুণ যখন একবার বেঁকে বসেছেন...তোরা তবে চলেই যা।'

—'না ওরা যাবে না।' মিতুল আবার মাথা ঝাঁকাত। ওদের সবাইকে আমার সঙ্গে গল্প করতে হবে, হবে, হবে!'

সেভাবে না বললেও মিতুলের গলায় সেই ছেলেবেলাকার জেদের সুর শুনতে পায় অপালা—'কি চাইবি? গান শেখানো ছেড়ে দেবো? না ক্ল্যাসিক্যাল ছেড়ে আধুনিক ধরব? কোনটা?'

মিতুল হেসে কুটি কুটি হয়ে বলল—'কোনটাই না। আমাকে তুমি একটা টাইর‍্যান্ট ঠাউরেছো না? আমি নিজেরই ওপর জোর জবরদস্তি করতে পারি না যখন অন্যের ওপর জোর করা আমাকে মানায় না। মানায়?'

—'তুইই সেটা ভালো বুঝবি।'

—'শোনো, একটা দারুণ অপূর্ব ফিল্ম হচ্ছে। বাইলিঙ্গুয়াল, হিন্দি আর বাংলায়। গান নিয়ে। শুধু গান। গল্পটা একজন গায়িকার জীবনের ওঠাপড়ার। রোলটা আমি নিচ্ছি। কিন্তু আরও আরও গান তো চাই! সেই রকম একজন ক্ল্যাসিক্যাল গাইয়ের জায়গায় আমি তোমাকে চাইছি।'

অপালা সভয়ে বলল—'আমি অভিনয় করব? তোর মাথা খারাপ হয়েছে মিতুল?'

মিতুল হাসতে হাসতে বললে—'আরে বাবা অ্যাক্টোটা করবে অন্য লোকে। তুমি শুধু গলা দেবে। গাইবে। প্লিজ, তুমি না করো না। আমি কথা দিচ্ছি তোমার অমার্যাদা বা অসুবিধে কিছু না ঘটে এটা আমি দেখব। দক্ষিণাও তোমার সম্মান অনুযায়ী হবে। মিউজিক ডিরেক্টর কে বলো তো?

অপালা চুপ করে ভাবছে।

—'রামেশ্বর ঠাকুর।'

—'সত্যি ?' অপালার মুখে-চোখে আলো ঝলসে ওঠে।

—'অবশ্য, আরেকজনও সঙ্গে থাকবেন যুক্তভাবে, কিন্তু তোমার গানগুলো তুমি ইচ্ছেমতো বাবার সঙ্গে আলোচনা করে কমপোজ করে নিতে পারবে। এবার হ্যাঁ-টা বলো।'

অপালা বলল—'মাস্টারমশাই যখন আছেন, তখন আমার না করবার কোনও প্রশ্ন নেই। তবু আমায় একটু সময় দে। ...মিতুল এবার চল, ওপরে চল।'

মিতুল বলল—'এখন তোমার ওপরে কে কে আছে বা আছেন অপুদি।'

'রণো নেই, খেলতে গেছে। টিটু-বনি কোচিং-এ, ফিরতে দেরি হবে। মা মানে আমার শাশুড়ি, শ্বশুর আর জা আছে।'

মিতুল বলল—'তাহলে কার কাছে যাবো ? আমি সোজা কথার মানুষ অপুদি, তোমার যে শ্বশুর-শাশুড়ির দাপটে তোমার এত বড় প্রতিভা ছাইচাপা হয়ে পড়ে রয়েছে...তোমার জা কে কিরকম জানি না, নতুন অ্যাকোয়েন্টেন্স, জাস্ট ফর ফর্ম, এতে আমার ইনট্‌রেস্ট নেই। শাশুড়িই বলেছিলেন না "আমার অমন গোরাচাঁদ ছেলের এমন কালিন্দী বউ। শাদা শাড়ি পরে বিয়ের কনে এসেছে, এ কি অলুক্ষুনে বউ রে বাবা !" তাঁদের কাছে শুধু শুধু ভীম নাগের সন্দেশ খেয়ে ফর্ম্যালিটি করতে যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।'

অপালা হেসে বলল, 'ওগুলো আমার পিসশাশুড়ি বলেছিলেন। তিনি মারা গেছেন মিতুল।'

—'মারা গেছেন বলেই তাঁর সাতখুন আমার কাছে মাপ হয়ে যাবে না, অপুদি। একটা উনিশ কুড়ি বছরের বাচ্চা বউয়ের মনে এসব কিরকম লাগে বোঝবার মতো বয়স নিশ্চয় তাঁর হয়েছিল।'

'আর শাড়িটা ? তোমার ওই ঢাকাই বেনারসীটা দীপুদি পছন্দ করে কিনে এনেছিল। কী ফাইট করে ! তোমার জেঠু আলতার মতো লাল চেলি কিনবেনই, দীপুদিও সেটা কিছুতেই কিনবে না। জিনিসটা আছে এখনও ? অমন শাড়ি আমি এখনও পর্যন্ত আর দ্বিতীয় দেখিনি। আর কালিন্দী বউ ! ওঁদের জন্ম-জন্মান্তরের ভাগ্য তুমি ওঁদের ঘরে এসেছো। শিবনাথদা থাকলে সেটা বলে বেশ খানিকটা কড়কে দিয়ে যেতুম। নেই যখন, অপুদি প্লীজ আমাকে ওপরে তুলো না।'

অপালা হাসছে। বলছে— 'কী যে বলিস !'

'না না। আমার ওসব ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। ওপরে গেলে কী বলব জানো ? বলব— এই যে মহাশয় এবং মহাশয়ারা আপনাদের গোরাচাঁদটি এনার গান শুনেই এনাকে গানের জগৎ থেকে একরকম ছিনিয়ে এনেছিলেন। প্রতিশ্রুতি ছিল এঁর গানের পথে কোনও বাধা হবে না। গোবরের ঘুঁটে দেবার জন্যে, আর লুচি বেগুনভাজা ভাজবার জন্যে. কিংবা বছর বছর বাচ্চার কাঁথা কাচবার জন্যে উনি ব্যবহৃত হলে ঐশ্বরিক ক্ষমতা নামক কনট্রোভার্শাল ব্যাপারটার একটা হিউজ ওয়েস্টেজ হয়।

অপালা বলল— 'থাম, থাম, উফ্— আমাকে ঘুঁটে দিতে হয় না। তুই মিতুল দিন দিন আরও ধারালো হয়ে উঠছিস। আর কী যে অপূর্ব দেখতে

হয়েছিস আমি তো চোখ ফেরাতে পারছি না।'

—'দা-রু-ণ! সুন্দর ? তুমিও সুন্দর দেখছ আমায় ? সত্যি অপুদি ?'

—'মানে ? সুন্দরকে সুন্দর দেখব না ? সুন্দর দেখবার চোখও আমার নেই বলছিস ?'

—'উঁহুঃ আমার কেমন মনে হয়, গানেও যেমন তুমি বাইরের অঙ্গগুলোর প্রথাসিদ্ধ কৃতকৃত্য না মেনে রাগের গভীরে চলে যাও, মানুষের বেলাতেও তেমনি। বাইরে আমি যতটা সো-কল্ড্ সুন্দর, ভেতরে হয়ত ততটা নই এবং তুমি হয়ত সেটাকেই দেখতে পাও।'

অপালা বলল— 'মিতুল, তুই তো আমাকে আমার চেয়ে বেশি চিনিস মনে হচ্ছে ?'

—'খুব বকবক করছি তো ? আসলে কথা বলবার লোক পাই না অপুদি। জীবনটা কী ভাবে কড়ায় সন্দেশের পাকের মতো বিজবিজ করতে করতে তৈরি হয়ে উঠছে, কি ভাবে সন্দেশের কড়া থেকে রসগোল্লার কড়াতে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছি, এসব উপলব্ধিগুলোর কথা বলবার লোক পাই না। অপুদি আমাকে এখনও ভালোবাসো ?'

—'তুই একটা খ্যাপা'

—'সত্যি সুন্দর দেখো ?'

—'তুই না সত্যি...'

—'তাহলে আমাকে একবার জড়িয়ে ধরো, প্লীজ।'

অপালার এসব অভ্যেস নেই। কিন্তু মিতুল ভেতরের আবেগে টগবগ করে ফুটছে। অপালা তো তার ছেলে-মেয়েকেও আদর করে না। যাই হোক, মিতুলকে নিয়ে তো পারা যাবে না, সে একটা হাত বাড়াতেই মিতুল প্রায় ঝাঁপিয়ে তার বুকের মধ্যে পড়ল, তার কাঁধে মাথা রাখল, দুদিকের গালে অনেকক্ষণ ঠোঁট রেখে মিষ্টি আওয়াজ করে চুমো খেল, তারপর ঠোঁটে ঠোঁট রেখে দুলতে দুলতে বলল— 'ও অপুদি, আই হ্যাভ অলওয়েজ লাভ্ড় ইউ সো, অ্যাজ ইফ ইউ ওয়্যার মাই লাভার, দা বিগ, ডার্ক, হ্যান্ডসম লাভার, সো কেয়ারিং, সো সফ্‌ট, সো আন্ডারস্ট্যান্ডিং! আই স্টিল রিমেমবার হাউ ইউ ইউজ্‌ড় টু সিং মি টু স্লীপ, আই হ্যাভ অলওয়েজ বীন এ বিগ চাইল্ড, য়ু হ্যাভ অলওয়েজ বীন সো ম্যাচিওর। ওহ্, হাউ সফট ইয়োর চীকস আর, হাউ সুইট স্মেলিং, হোয়াই কান্‌ট্ মেন বী লাইক দিস ?'

তার গলা জড়িয়ে ধরে মিতুল যখন এইভাবে প্রলাপ বকে যাচ্ছিল, তখন শিবনাথ ঢুকছিলেন অবাক হয়ে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে। তিনি মিতুলকে পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছেন, তার ফর্সা হাত আর গালের একটু অংশ, চুলের লালচে গুচ্ছ, সব মিলিয়ে তিনি তাকে মেমসাহেব-জাতীয় কিছু ভেবেছিলেন এবং এই অপরিচিত মেমসাহেব কেন তাঁর স্ত্রীকে এভাবে আদর করছে ভেবে পাচ্ছিলেন না। অপালা শিবনাথকে বড় বড় চোখে তাকাতে দেখে ভীষণ লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। সে ডাকল— 'মিতুল, সোজা হ, তোর শিবনাথদা আসছে।'

মিতুল সোজা হয়ে দাঁড়ালো। 'আসছেন তো সো হোয়াট! এই যে

শিবনাথদা, ডু ইউ সি হাউ প্রেশাস অ্যান্ড লাভেবল্ ইয়োর ওয়াইফ ইজ ? বেশ তো একটি নেয়াপাতি ভুঁড়ি বাগিয়েছেন দেখছি। আমি আপনার শ্যালিকা। কোনও কিছুতেই আমার ওপর আপনি রাগ করতে পারছেন না। কান মুলে দিলেও না। যাই বলুন আর তাই বলুন, আপনাদের বিয়ের সময়েই বুঝেছিলুম— ইউ ডোন্ট ডিজার্ভ অপুদি। লেনার্ড উলফের কথা জানেন ? ভার্জিনিয়া উলফের হাজব্যান্ড। নিজেও সম্ভাবনাময় পুরুষ ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর প্রতিভা নিজের থেকে অনেক উঁচু দরের বুঝে স্যাক্রিফাইস করেছিলেন প্রচুর। সোল এগজাম্‌প্‌ল। আপনাকে কেউ স্যাক্রিফাইস করতে বলছে না। অন্তত যাতে ক্ষমতাটা নিজের পথ ঠিকঠাক খুঁজে নিতে পারে সেটা তো দেখবেন ?'

শিবনাথ খুব গম্ভীর চাপা স্বভাবের মানুষ। তিনি একদম অপরিচিত অনিন্দ্যকান্তি এই যুবতীর আক্রমণে একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন।

অপালা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হেসে বলল— 'চিনতে পারছো না ? এ মিতুল। মাস্টারমশায়ের মেয়ে মিতশ্রী।'

এই বার শিবনাথ চিনতে পারলেন। কবে সেই বিয়েব সময়ে বাসরে গেয়েছিল, নেচেছিল, এখন নানা জায়গায় ছবি দেখেন, একেকটা একেক রকম। তিনি ঠিক বুঝতে পারেন না কোনটা মিতশ্রী ঠাকুরের আসল চেহারা। খুব পপুলার গায়িকা।

তিনি হেসে বললেন— 'আরে, সত্যিই তো আপনাকে আমার খুব চেনা উচিত ছিল। বাসরে সেই গান—

ট্যাং ট্যাং ডিং ডিং শান্তি ! কি শান্তি লো
অপুদির গলাতেই ফাঁস দিলো
বরখানা গিবগিটি জিভটা সড়াত করে বাব করে
তেলাপোকা গিলে নিলো !

তার সঙ্গে তেমনি রক নাচ। গানটা কি আপনার নিজেবই রচনা ছিল !'

—মিতুল ভীষণ হাসছে। বলছে—'এ গান আবার, আমি ছাড়া কে বাঁধবে ?'

শিবনাথ বলল— 'আমি তো আপনার অপুদির যোগ্য নই-ই। আপনিও কিন্তু যোগ্য বোন নন। অন্তত আট দশ বছর পরে খোঁজ নিচ্ছেন।'

মিতুল নিচু হয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে একটা আদাব জানাবার মতো ভঙ্গি করলে। বললে— 'অপুদির খাঁচাটা খুলে দিন শিবনাথদা, আজ চলি।'

শিবনাথকে কাটিয়ে সে দরজা পেরিয়ে ছোট্ট পথটুকু পার হল, তারপর তার মারুতিতে উঠে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এখন তার সারা শরীরের ত্বক জুড়ে অপুদির স্পর্শ। ছেলেবেলার মধুর স্মৃতি মাখা। অপুদিকেই সে বাবার ছাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে ভালোবাসত। একটা বীরপূজার ভাব ছিল। ছোটবেলার চোখে অপুদিকে অসম্ভব সুন্দর লাগত। অপুদি যখন গান ধরত, অনেক সময়ই বাবা তাকে তানপুরো ছাড়তে বলতেন। সে অবাক মুগ্ধ চোখে দেখত, ছোট্ট কপাল, চুলগুলো অতি সাধারণ ভাবে পেছনে একটা মোটা বেণী বাঁধা, ধনেখালি শাড়ির আঁচল কাঁধে বেড় দিয়ে সামনে এসে পড়েছে। লম্বা ভুরুর তলায় লম্বা লম্বা চোখ, কখনও বোজা,

কখনও আধখোলা, ছোট্ট মুখ, তার মধ্যে দিয়ে জলস্রোতের মতো কলকল কলস্বনে সুর বেরিয়ে আসছে। অপুদির শরীরে কী সুন্দর একটা গন্ধ, এ কোনও পাউডারের বা পার্ফুমের নয়। এ বোধহয় একাগ্রতার, বিশুদ্ধতার গন্ধ।

প্রথমে সে 'আশাবরী' নামক ফিলমের নায়িকা হবার কাজটা নিজের জন্যই নিয়েছিল। সম্পূর্ণ নিজের জন্য। কিন্তু ধীরে ধীরে তার মত বদলেছে। সে অবশ্য খুব কম সময়েই এক খেয়ালে, এক সংকল্পে স্থির থাকতে পারে। যতই সে বুঝেছে প্রোডিউসারের ওপর তার প্রভাব দৃঢ় হচ্ছে ততই তার আব্দার বেড়ে যাচ্ছে। বাবাকে মিউজিক ডিরেক্টর করতে ওরা একেবারেই রাজি হয়নি। বলেছে 'ছবি মার খেয়ে যাবে, মিতশ্রী দেবী, একটু কনসিডার করুন।' কেন রাজি হবে ? কে আজ চেনে রামেশ্বর ঠাকুরকে ? সে এসব ভালোই বোঝে কিন্তু সে তার আবদারে অটল থেকেছে। বলেছে, 'আরেকজন ডিরেক্টর রাখুন আপনাদের পছন্দ মতো। কিন্তু রাগসঙ্গীত পরিচালনা করা রামেশ্বর ঠাকুরের মতো কেউ পারবে না। আমি আপনাদের চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি।' জনৈক বিখ্যাত মিউজিক ডিরেক্টরকে অনেক কষ্টে যুগ্মভাবে রামেশ্বরের সঙ্গে কাজ করতে রাজি করানো হয়েছে। প্রচুর গান, পপগান, নাচের সঙ্গে গান। সেসব তিনি করবেন। রামেশ্বরের এলাকা অন্য।

গল্পটা ওরা যখন তাকে শোনাল তখন মিতুলের প্রথমেই মনে হয় এটা একটা এমন গতানুগতিক গল্প, যাতে তার জীবনের কিছুই ফুটবে না। কল্পনা, গভীরতা এসব এদের কিচ্ছু নেই। একজন প্রতিদ্বন্দ্বিনী গায়িকার ভূমিকা আছে, প্রথম থেকেই সে এটাতে অপুদিকে ভেবে এসেছে। কিন্তু এদের গল্প অনুযায়ী সে চিরকাল তার ওই ঝিংচাক গেয়ে জিতে যাবে আর অপুদি ওই স্বর্গীয় গলা এবং গায়কী নিয়ে হেরে যাবে। এটা হাস্যকর তো বটেই, অপুদির কাছে পেশ করাও শক্ত। অপুদি তো পেশাদার প্লে-ব্যাক-সিঙ্গার নয়। তার মাথায় একটা আইডিয়া আসে, বাবার সঙ্গে আলোচনা করে সেটা আরও পূর্ণতা পায়। তখন সে সিন্‌হাকে বলে— ডোন্ট মাইন্ড, আপনাদের স্টোরি-লাইনটা... জাস্ট লাইক এনি আদার স্টোরি।'

সিনহা আমতা আমতা করে বলেন— 'আসলে আমাদের একটা ফর্মুলা আছে তো... মিস ঠাকুর।'

—'আই নো। অ্যান্ড আই হেট ইট। অথচ বারে বারেই আপনারা ক্লেইম করছেন এটা নাকি এক্সপেরিমেন্ট। অর্ডিনারি মশালা ছবি নয়।' তার পরে সে প্রকাশ করে তার গল্প। চটুল, মনভোলানো, জলুস-অলা গানের আত্মিক দিক থেকে সমৃদ্ধ সঙ্গীতের কাছে আত্মসমর্পণের গল্প। সে এ-ও জানায়, যে রাগসঙ্গীত গেয়েও দর্শককে মাতিয়ে দিতে পারেন এরকম গায়িকা তার জানা আছে।

সিনহা বললেন 'আইডিয়াটা সত্যিই ভালো। আমরা নানারকম রুচিকে স্যাটিসফাই করবার স্কোপ পাচ্ছি। আপনি দেখছি সত্যিই ভার্সেটাইল মিতশ্রী দেবী। তা কে কণ্ঠ দেবেন, আমায় একটু যদি জানান, শেষকালে আপনাদের একটা ডুয়েট দিয়ে ছবি শেষ হতে পারে।' তখন অপালার নাম করে সে।

নামটা শুনে মিঃ গৌরাঙ্গ সিনহা উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল, বলল 'অপালা দত্তগুপ্ত। অপালা দত্তগুপ্ত। ইজ শী অ্যালাইভ? ইজ শী রিয়্যালি আভেলেব্‌ল্‌?' বছর আষ্টেক আগে আমি ওকে ডোভার লেনে শুনি। মারোয়া গেয়েছিলেন, তারপর ঠুম্‌রি; শেষে ভজন 'মৎ যা, মৎ যা, মৎ যা, যোগী...' এক কথায় অনির্বচনীয় সেই এক্সপিরিয়েন্স। আমি জীবনে ভুলব না। কত খুঁজেছি তারপর ওঁর নাম। আর কখনও পাইনি।'

মিতুল বলল—'গান বাজনার জগতের পলিটিকসের ব্যাপার জানেন তো? প্রথমত উদ্যোক্তারা ওঁকে হয় ঠুমরি নয় ভজন গাইতে বলেছিলেন। গানের মুড এসে গেলে অপালাদির জাতের গায়িকার ওসব মনে থাকে না। তিনি দুটোই গেয়েছিলেন। শ্রোতারা চেয়েওছিল। এই এক, তার ওপর গান নিয়ে এক নামকরা সমালোচক প্রচুর তর্কের ঝড় তোলেন...'

সিন্‌হা বলল—'গানের অত টেকনিক্যালিটি আমি বুঝি না। ইট ওয়াজ ফ্যানটাসটিক। মিতশ্রী দেবী, গানের ওপর আমার বিশেষ ঝোঁক বলেই কেজরিওয়ালকে এই ছবিটাতে ইনট্‌রেস্টেড করিয়েছি। আপনার অনেক প্রোগ্রাম শুনিয়েছি। কিন্তু স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি— অপালা দত্তগুপ্তকে পেয়ে যাবো। ইউ গো অ্যাহেড।'

মিতুল নিজের মনের মধ্যে খুঁজে খুঁজে দেখে সে কি এতে একটু ঈর্ষান্বিত হয়েছিল! না, না। একেবারেই না। একটা খুব সুন্দর সুগন্ধ ফুল, ফুটে আছে তার সমস্ত সৌন্দর্য ছড়িয়ে, সে কি দক্ষিণা হাওয়ার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে এক ধরনের আনন্দ পায় না। তার কোনও ক্ষণিকের ভালোবাসার মানুষকে আলিঙ্গন করে যে সুখ সে পায়নি, অপুদির বুকে মুখ ঘষে সে আজ তার চেয়ে অনেক বেশি সুখ কেন পেল! সে জানে না জানে না। অনেক আত্মবিশ্লেষণ করা সত্ত্বেও তার নিজের চরিত্রের কিছুটা এখনও মিতুলের কাছে ছায়াময়, দুর্বোধ্য। সে সানগ্লাসটা খুলে গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে রেখেছিল, এখন সেটা বার করে পরে নিল। রোদ নেই। গোধূলি ফুরিয়ে গেছে। রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠছে একে একে। সানগ্লাসের আড়াল তার এখনও কিছুক্ষণ দরকার।

॥ ১৭ ॥

শিবনাথ বললেন— 'অপু তুমি অফারটা নাও। সত্যি তোমার জীবনের সমস্ত সাধনা, আশা আমার জন্য, আমাদের জন্য নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু...'

অপালা আলনা গুছোচ্ছিল, বলল— 'বাজে না বকে আর কি বলতে চাও ঠিক করে বলো।'

'আমি বলছিলুম বাড়িতে এখন কিছু জানিয়ে দরকার নেই। আমি নিজে তোমায় নিয়ে যাওয়া আসা করব। কোনও অসুবিধে হবে না।'

কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল শিবনাথকে অপালার সঙ্গে যাতায়াত করতে হলে

অফিস কামাই করতে হয়। তার অবশ্য দরকারও হল না। মিতুলের গাড়ি নিয়মিত অপালাকে নিয়ে যাওয়া-আসা করতে লাগল। মিতুল নিজেও তাতে বসে থাকে।

একদিন অপালার ছেলের সঙ্গে মিতুলের আলাপ হলো। রণো তখন বেরোচ্ছিল। মিতুল আজ শাড়ি পরে এসেছে। রণো তাকে দেখে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মিতুল গাড়ি থেকে মুখ বার করে বলল—'তুমি নিশ্চয়ই রণো, মা রেডি হয়েছে? ডেকে দাও। আমি আর নামছি না। শীগগির যাও।' বলতে বলতে সে ঘড়ির দিকে তাকাতে লাগল। রণো এ ধরনের আদেশের সুরে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু এখন সে পেছন ফিরে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। অপালা তখন তার সাজ-পোশাকের শেষ পর্যায়ে। অর্থাৎ পায়ের গোড়ালি দিয়ে শাড়িটা টেনে নীচে নামাচ্ছে। রণো বলল, 'তোমায় এক ভদ্রমহিলা ডাকছেন, গাড়িতে বসে আছেন।'

—'চল্'— ব্যাগটা তুলে নিয়ে অপালা বলল। রণো দু তিনটে সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে নামতে নামতে বলল 'উনি কে?'

—'আমার মাস্টারমশায়ের মেয়ে, মিতুল মাসি।'

—'মুখটা আমার খুব চেনা লাগল। গত বছর আমাদের কলেজ সোশ্যালে এসেছিলেন।'

—'হতেই পারে। ভালো নাম মিতশ্রী ঠাকুর।'

—'তাই বলো তাই চেনা-চেনা লাগছে। ওঁর সঙ্গে কোথায় যাবে?'

অপালা ভালো করে মিথ্যে কথা বলতে পারে না। সে সংক্ষেপে বলল—'রেকর্ডিং আছে।'

—রণো গাড়ির পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল— মিতুল ডাকল— 'রণো, রণো, তুমি কোথায় যাবে?'

—'এই একটু...'

—'জায়গাটা বলো, আমি নামিয়ে দেবো।'

রণো আঠার বছরের ছেলে। সে মোটের ওপর তার বাবার মতো দেখতে। যদিও অনেক পাতলা। কিন্তু স্বভাব একদম বিপরীত। এখন সে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় কর্কশকান্তি। হঠাৎ লম্বা হয়ে যাচ্ছে। গোঁফ দাড়িতে মুখ আচ্ছন্ন। নিজের বয়সের ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গ ছাড়া স্বস্তি পায় না।

সে বলল— 'কাছেই, গাড়ি লাগবে না।' বলে বড় বড় পা ফেলে গাড়ির যে দিকে মুখ তার উল্টো দিকে চলে গেল। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে মিতুল বলল— 'অপুদি, তোমার ছেলে খুব শাই, ইনট্রোভার্ট তোমার মতো, না?'

—'আমাদের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলে না, তবে ইনট্রোভার্ট কি না জানি না। বয়সটা ভালো না, মিতুল, আমার ভয় করে।'

—'ভয়? কেন?'

—'ছেলেটা বাড়ির একমাত্র, এবং বড় ছেলে। কষ্ট করে বাঁচানো হয়েছে। দাদু-দিদার চোখের মণি। ছোট থেকেই ওঁদের হাতেই একরকম মানুষ হয়েছে। আমি ওকে ভালো করে চিনতে পারি না। আমি কেন, ওর বাবাও না।'

—'গান-বাজনা কিছু করে না ?'

—'গান ? গান এদিক দিয়ে যাবে তো ও উল্টো দিক দিয়ে যাবে। কিছু ওয়েস্টার্ন মিউজিক শোনে। কিছু হিন্দি ফিলমি গান। বাস। কখনও বাথরুমেও গুনগুন করতে শুনিনি।'

—'তোমার ছেলে গান করে না ? ছেলেবেলায় ওকে গান শোনাতে না ! ঘুম পাড়াবার সময়ে আমাকে যেমন শোনাতে। ধেড়ে মেয়ের কচি মায়ের মতো !'

—'দূর, ও বরাবর ঠাকুমার কাছে ঘুমোতো। তিনি ভাই খুব বেসুর। "ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো"টুকুও সুরে বলতে পারেন না। আমার ছেলেও অমনি বেসুর।'

মিতুল চুপচাপ গাড়ি চালাতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পরে বলল—'মেয়েরা ?'

—'বড় টিটুটার খুব স্বাভাবিক সুন্দর গলা আছে। কিন্তু কিছুতেই গানে বসবে না। ছোট বনিটার গলা ভালো না। ছাত্রীদের সঙ্গে তবু বসাই। কিন্তু বড্ড সহজে হতাশ হয়ে পড়ে। ইচ্ছে আছে। কিন্তু দমে যায়।'

—'তুমি দমিয়ে দাও না তো ? আমার সেই শ্রীকণ্ঠের কথা মনে রেখো।'

—'না মিতুল, দমিয়ে দিই না একেবারেই। কিন্তু আমার গান শুনেই ও সবচেয়ে দমে যায়। যাই হোক, চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজকালকার পড়াশোনার যা চাপ, তাতে রেওয়াজের সময় কতটুকু পায় ! কত আঁকাজোকা। বাপরে। অর্ধেক তো আমাকেই করে দিতে হয়।' একটু থেমে অপালা বলল— 'মিতুল তোদের গানের বংশ। গানের বাড়ি, কত পুরুষ ধরে গানের সাধনা চলেছে ? তোরা রক্তে ক্ষমতা নিয়েই জন্মেছিস। প্রথম দিকের গলার কর্কশত্ব কিছু না। বংশের সুরের ধারা যাবে কোথায় ? আর আমরা ভুঁইফোঁড়। শ্বশুরবাড়িতে তো গানের কোনও চর্চাই নেই। আমার বাপের বাড়িতেও আমিই একমাত্র গানের ভক্ত। খুব সম্ভব আমার বাবা, যিনি আমার খুব অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন, তাঁর ভেতরে গান ছিল। ঠাকুরঘরে বসে সন্ধেবেলায় নিয়মিত গাইতেন। 'তুমি বিবেক হলদি গায়ে মেখে যাও ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে', এই লাইনটা আমার এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে। হলুদ মাখলে কুমিরে ধরে না। এইরকম একটা বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল গানটা থেকে। ভাবলেও হাসি পায়। তোদের ঘরের সঙ্গে আমাদের কোনও তুলনা চলে না।'

মিতুল বলল— 'কি জানি অপুদি, এগুলো আমি ঠিক মেনে নিতে পারি না।'

—'তুই তো কিছুই মানিস না।'

—'মানবো কেন, .বলো। যে ঘরানাই হোক, কেউ না কেউ তো তাকে আরম্ভ করে। তার ক্ষমতাটা কোথা থেকে এলো। বিলায়েত খাঁয়ের তিন পুরুষের কথা আমরা জানি। তার আগে ? ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর ওই পাগলের মতো সঙ্গীতপ্রীতি, ঢোল থেকে আরম্ভ করে সরোদ, সুরশৃঙ্গার পর্যন্ত সমস্ত বাজনা বাজাবার ওই অদ্ভুত ক্ষমতা কোথা থেকে এলো ! তাঁর

পিতৃপুরুষের কাছ থেকে বলে তো আমি শুনিনি।'

অপালা বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল—'ঠিক আছে, তোর কথা মানলুম, আমি অপালা-ঘরানার সৃষ্টি করতে পারিনি, কারণ কি আমি জানি না।' শেষের দিকে তার গলা খুব বিষণ্ণ শোনালো। সে চেয়েছিলো টিটু, অন্তত টিটু গানটা ধরুক। ওকে সে কত দিয়ে যেতে পারতো!

ফিল্মের গান খুব ভালো হচ্ছে। বাঁধা গান, কিন্তু রামেশ্বর আর সে দুজনে মিলে বেঁধেছে। এতো ভালো গলা, তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে ফুটে উঠছে একটার পর একটা গানে। এরা বরং মুশকিলে পড়েছে মিতুলের গান নিয়েই। মিতুলের গানে যতক্ষণ চটক চমক, পপ-মেজাজ আছে ততক্ষণ ঠিক আছে। তার গলায় আছে এক ধরনের দানা, একটু ভারী গলায় এই দানা, ফিল্মের লোকেরা বলে খুব সেক্সি। এগুলোই তার গানের আকর্ষণ। কিন্তু শুদ্ধ রাগসঙ্গীত গাইতে গেলেই অপালার গানের গভীরতা, কণ্ঠ সবই এতো উচ্চ স্তরের যে মিউজিক ডিরেক্টরদের এটা খুব অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে। রামেশ্বর বিচলিত নন। তিনি জানতেন এটা হবেই। এমন কি নজরুলের গানের এক জলসার দৃশ্যেও অপালা তিলক কামোদে 'সৃজন ছন্দে' গানটি বহু সুরবৈচিত্র্য করে ভজনের ভঙ্গিতে গাইল, যা মিতুলের গানকে বহু বহু গুণ ছাড়িয়ে গেল। মিতুল বলল—'এটাই আমাদের গল্পের ক্লাইম্যাক্স হোক না। এই গানটা শুনেই নায়িকা প্রথম রিয়্যালাইজ করুক সত্যিকারের গান কী জিনিস। আপনারা ঘাবড়াচ্ছেন কেন?'

'আশাবরী' মুক্তি পেলো পুজোর সপ্তমীর দিন। রেকর্ড তার আগেই কিছু কিছু বেরিয়ে গেছে। অপালা দত্তগুপ্তর নজরুল, রাগপ্রধান, এমন কি খেয়াল, ঠুমরি, ভজনও পড়তে না পড়তে বিকিয়ে গেল। বেশির ভাগ পুজো-মণ্ডপেই তারস্বরে বাজছে 'ভোলো ভোলো-সৃজনছন্দে', 'দুসর ন কোঈ মেরে তো গিরধারী গোপাল' রাগপ্রধান 'গঙ্গা চিতপাবনী ভবানী শিবরঞ্জনী'

ছবি মুক্তি পাবার এবং রেকর্ডের অসামান্য সাফল্যের কথা পুরোপুরি জানবার পর খবরটা বাড়িতে ভাঙল শিবনাথ। খুব আশ্চর্যের কথা মনোহর বাবু বললেন—'এতো ভালো কথা, এতো দিন বলো নি কেন?' বাড়িতে রঙিন টিভি সেট এলো, শাশুড়ি ও জায়ের জন্য দামী শাড়ি। অপালা বলল—'বাবা, আমি ভাবছি একজন ওস্তাদ তবলিয়ার কাছে কিছুদিন শিখবো।'

মনোহর দত্তগুপ্ত অবাক হয়ে বললেন—'চল্লিশ বছর বয়স হতে চলল এখনও শিখবে? তা-ও আবার তবলা? হাসালে মা। আর কোনকিছু করতে হলে আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবার অভ্যেস তো তোমার নেই? হঠাৎ অনুমতি চাওয়া?'

অপালার মনটা বহুদিন পর আবেগে আনন্দে পরিপ্লুত হয়েছিল। কত দিন পর সে প্রাণভরে গান গেয়েছে, সেই গান এতো লোকে ভালোবেসে শুনছে, রাতারাতি অপালা দত্তগুপ্ত একটা নাম হয়ে গেছে। বাড়ির লোককে সম্পূর্ণ নিজস্ব উপার্জনের টাকায় দামী দামী উপহার দিতে পেরেছে। শ্বশুরের কথায় সে এক নিমেষে নিভে গেল। ছাইয়ের মতো মুখ নিয়ে ঘরের ভেতরে আসতে তার বড় মেয়ে ষোল বছরের টিটু বলল—'মা তুমি বুঝি ভেবেছিলে, কালার

টিভি ঘুষ দিয়ে দাদুর কাছ থেকে কিছু পাসপোর্ট আদায় করে নেবে ?' টিটুর গলায় শ্লেষ। অপালা তখন প্রাণপণে চোখের জল গিলছে। আঘাতটা কিছুটা অপ্রত্যাশিতই তো। টিটু বলে উঠল—'মা তোমার যেটা করবার দরকার সেটা বোল্ডালি করো, কে তোমাকে ভিক্ষে চাইতে যেতে বলেছে ?'

টিটু বয়সের আন্দাজেও বেশ পরিণত। সে মায়ের সামনে বসে আছে দু হাতের ওপর থুতনি রেখে। বলল—'তুমি তো সংসারের অনেক কাজ করো। রুটি বেলো, খেতে দাও, কাপড় কাচো। এই সমস্ত করেও তুমি তোমার গানের ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছো। গানও চালিয়ে যাচ্ছো। আর ওই কোয়ালিটির গান। কাকি তো তোমার চেয়েও অনেক কম কাজ করে সংসারের, খালি সিনেমা যাচ্ছে, আর বাপের বাড়ি যাচ্ছে, কই তাকে তো তোমার মতো শাসন সহ্য করতে হয় না! যত মানবে এই দাদু-দিদারা, ততই পেয়ে বসবে জানবে।

শিবনাথ বললেন—'এই টিটু, কী বলছিস ? থাম।'

—'থামতে তো বলবেই। আমরা ছোট,তোমাদের মধ্যে যা ছোটোমি তা দেখলেও বলবার অধিকার তো আমাদের নেই!'

বনি বলল—'মা সবার জন্যে খালি খাটে। শুধু আমার আর টিটুর বেলায় কিচ্ছু না।' আদুরে গলা বনির,—বলল, 'এতো করে বললুম শুটিং দেখতে নিয়ে যেতে,গেলে না। স্টিরিওটা তো দাদাই একচেটে করে রেখেছে।'

টিটু বলল—'বনি, থামবি ?'

শাশুড়ি ডাকলেন—'বড় বউমা এবার খাবে এসো।'

অপালা উঠছিল না। শিবনাথকে বলল—'খিদে নেই বলে দাও।'

টিটু বলল—'মাম্মি, না খেলে শরীর দুর্বল হয়ে যাবে । একেই তো তুমি অ্যানিমিক। চলো তো। খাবে তো রুটি আর আলু চচ্চড়ি, পটলভাজা সব দাদা মেরে দিয়েছে কিনা কে জানে। আজ আবার চিংড়ি মাছ হয়েছে। তোমার অ্যালার্জি। অলটারনেটিভ কিছু আছে বলে মনে হয় না। দেখি যদি একটু দুধ জোগাড় করা যায়।' টিটু উঠে গেল। শিবনাথ মিনতির সুরে বললেন—'যাও অপু, খেয়ে এসো। তোমার যার কাছে ইচ্ছে শিখবে। আমি তো রয়েছি।'

'আমি তো রয়েছি' কারুর মুখ থেকে এই আশ্বাস বাক্য বড় মূল্যবান। সাহস দেয়, সান্ত্বনা দেয়। আরও কত কিছু দেয়। কিন্তু শিবনাথের এই 'আমি' বড় ভালোমানুষ,দুর্বল 'আমি', এতদিনে অপালা এটা জেনে গেছে। বহুকাল আগে যেদিন মা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে জোর করে সাজগোজ করতে পাঠিয়েছিল, কনে দেখানোর জন্য, সেদিন অনেকক্ষণ কেঁদে অবশেষে বিপুল অভিমানে সে ঠিক করেছিল আজ থেকে সে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিল। গান ছাড়া তার জীবনে আর কিছু নেই। সেই গান জোর করে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, অতএব আজ থেকে সে এক রকম মৃত। মৃতও নয়, জীবন্মৃত। যান্ত্রিকভাবে বাকি জীবনটুকু কাটিয়ে দেবে। কিন্তু এই সংকল্প ধরে রাখাও তো খুব শক্ত। জীবনটা ছোট হলেও তো খুব ছোট নয়। তাতে প্রতি দিন চব্বিশটি ঘণ্টা। চব্বিশ ইনটু ষাট মিনিট, চব্বিশ ইনটু ষাট ইনটু ষাট সেকেন্ড। এতগুলো পল বিপল অনুপল যান্ত্রিকভাবে কাটানো তো সহজ নয়। তার ওপর

ছিল শিবনাথের আশ্বাস। পরবর্তী জীবনে এই আশ্বাস যে এক অসার তা সে ভালো করেই টের পেয়েছে। প্রথমত শিবনাথ অফিসের কাজে সাংঘাতিক ব্যস্ত থাকে। শ্বশুরবাড়ির আবহাওয়া এমনই প্রতিকূল যে সেখানে ভোর বা সন্ধেয় তানপুরো নিয়ে রেওয়াজে বসাটা খুব একটা হাস্যকর ব্যাপার। গলা ছাড়তেও লজ্জা লাগে। এদের চিলেকোঠা বলেও কিছু নেই। অথচ মুখ ফুটে কেউ বলেনি—'বউমা, তুমি গান করো।' বা 'এসব আবার কী?' প্রথম প্রথম কেউ বউ দেখতে আসলে বা এমনি কোনও অতিথি আসলে শাশুড়ি বলতেন—'আমাদের বউমা কিন্তু খুব ভালো গান জানে, একটা শুনিয়ে দাও তো মা।'

তখন অপালা তার সেই সোহমের উপহার-দেওয়া হাতির দাঁতের কাজ করা অপরূপ হার্মোনিয়ম নিয়ে অতিথির মন বুঝে গান করত। বিয়ের পর এরকম সুযোগ তার অনেক হয়েছে। 'ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়/ পথে পথে ওই নদীয়ায়/ কিম্বা 'এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ' কিম্বা 'ক্ষমিও হে শিব আর না কহিব'। শুনে অনেকেই চোখের জল ধরে রাখতে পারতেন না, বলতেন—'গান জানে তা শুনেছিলুম, কিন্তু সে যে এমন গান তা তো জানতুম না, গান এমন হয় কখনও ভাবিনি।' দিদি-জামাইবাবু যতদিন ছিলেন, এলেই গানের আসর বসাতেন, ফরমাশ করে করে গান শুনতেন। কিন্তু তাঁরা ভেনেজুয়েলায় চলে যাবার পর থেকে গান গাওয়ার, বিশেষ করে ওরকম সারা সন্ধে জুড়ে দু ঘণ্টা তিন ঘণ্টা টানা গান গাওয়ার সুযোগ কমে গেছে। কিন্তু এ তো গেল গান! রেওয়াজ কি জিনিস সে ধারণা এঁদের খুব একটা নেই। পাশের বাড়ির একটি মেয়ে রোজ সকাল-বিকেল তারস্বরে 'সা রে গা রে গা মা গা মা পা' করে চিৎকার করে, শ্বশুরমশাই বলেন—'বাপ রে, এ যে কবে পরের ঘরে যাবে!'

শীতকালের রাতে আটকাঠ বন্ধ করে সে শিবনাথকে বলত—'মালকোষ শুনবে?' শিবনাথ বলত—'অফকোর্স।' তখন সেই বন্ধ ঘরে মন্দ্র আর মধ্য সপ্তকে শুরু হত তার মালকোষের সুরবিহার। ভয়ে উঁচুতে উঠত না। ত্রিসপ্তক বিস্তৃত তার সেই অনুপম কণ্ঠ লাবণ্য সীমার মধ্যে বাঁধা থাকত। এর পরে পিলু কি মিশ্র খাম্বাজে ঠুমরি। ঠুমরি শেষ হতে না হতেই যে শিবনাথকে বাইরে থেকে দেখলে নরম প্রকৃতির, শান্ত স্বভাবের মানুষ বলে মনে হত সে-ই হয়ে উঠত খ্যাপা বাঘের মতো। সুর-ছমছমে সেই মধ্যরাতে যখন অপালার সমস্ত শরীর সুরের প্রেমে শিউরে-শিউরে উঠছে, মনে মনে সে অনুবাদী সুরগুলিতে লঘু পায়ে বিচরণ করে বার বার বাদীস্বরে ফিরে এসে নিজেকে ন্যস্ত করতে চাইছে দীর্ঘ সময় ধরে, তখন শিবনাথের দিক থেকে আসত একটা বীভৎস আক্রমণ। ঠিক যেন একটা শিকারী চিতা তার শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়ল। তারপর তাকে টুকরো টুকরো করছে। হাড় মাংস মজ্জা সব আলাদা আলাদা করে ফেলছে। শিবনাথ যদি এই সময়গুলোতে তাকে আদরে সোহাগে বেহালার ছড়ের টানে টানে বাজাত, তাহলে হয়ত তার অন্য রকম লাগত। কিন্তু শিবনাথের ওই উন্মত্ত ব্যবহার তাকে অসহ্য কষ্টে কাঁদিয়ে ছাড়ত। সুখের, উত্তেজনার, আনন্দের শীৎকার নয়। বাঘের হাতে অসহায় মৃগ শিশুর

মরণ-আর্তনাদ। অপালার তিনটি সন্তানই হয়েছে এইভাবে। অথচ তিনজনেরই সুরের সঙ্গে আড়ি। এভাবে ছাড়া তার রেওয়াজের উপায়ও বিশেষ ছিল না । কিন্তু আস্তে আস্তে সে বুঝেছে নির্জন মাঝরাতের সঙ্গীত শিবনাথের প্রথম রিপুকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যায়। সে আর শিবনাথ হাজার অনুরোধ করলেও ওই সময়ে গাইতে চায় না। শিবনাথ বলে—'ও একলা শ্রোতাকে শোনাতে বুঝি ইচ্ছে করে না! শ'য়ে শ'য়ে শ্রোতার সামনে গেয়ে অভ্যেস!' অপালা মনে মনে বলে—'শোনাতে খুবই ইচ্ছে করে, একলা কেন, কোনও শ্রোতা না থাকলেও আমার চলে যায়।' মুখে বলে—'বড্ড ক্লান্ত লাগছে গো, আজ থাক।' পরের দিনই শিবনাথ ভিটামিনের শিশি নিয়ে বাড়ি ফেরে। এইটুকুই তার হাতে। অবশেষে, অনেক কষ্টে নীচের ওই ঘর। সাহস নেই নেই করেও একটু সাহস তো অপুর আছেই। বিনা প্রতিবাদে, বিনা বিদ্রোহে, চুপচাপ নিজের কাজ করে যাবার সাহস! জেঠুর নিরবচ্ছিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেও সে তার কাজ করে গেছে, এঁদের উদাসীনতা এবং অজ্ঞতার পটভূমিতে কোনমতে চালিয়ে গেছে। কিন্তু তার উচ্চ শিক্ষা থেমে গেছে। জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রের মতো গানের ক্ষেত্রেও শেখার তো শেষ নেই। মাত্র উনিশ-কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত সে কী-ই বা শিখতে পেরেছে। মাস্টারমশাইয়ের কাছে সপ্তাহে দুদিন যেত। মাস্টারমশাই নিজেই বলতেন—'তুমি এবার অমুকের কাছে যাও অপু, তমুকের কাছে যাও, আমার যা দেবার সবই তুমি তুলে নিয়েছো!'

প্রথম প্রথম কনফারেন্সে ডাক আসত, প্রথম সন্ধ্যার শিল্পী হিসেবে। তখন রামেশ্বরের শিক্ষক হিসেবে অসম্ভব সুনাম। প্রভাব। অপালারও সম্ভাবনাময় শিল্পী হিসেবে গায়ক মহলে যথেষ্ট মর্যাদা। মঞ্চে বসে বসে অপালা দেখত শ্রোতাদের আসন তখনও অর্ধেকের ওপর খালি। চলাচল চলছে। মাঝরাতে যিনি আসবেন তাঁরই জন্যে এই টিকিট কাটা। কে অপালা দত্তগুপ্ত! হীরাবাই বরোদেকারের মতো শাড়ি গায়ে জড়িয়ে, শ্যামবর্ণ, ক্ষীণাঙ্গী গায়িকা, কোনও মোহন মুদ্রা ছাড়াই তানপুরো ধরে যে একঠায় গেয়ে যায়। গোড়ার দিকে বসে বসে কেউ 'ওয়া ওয়া', 'আহা আহা' করে তারিফ করতেন। যখন সে তিনতালে তিন আবর্তন তান করে সমে ফিরছে, কিংবা বিস্তারের মাঝে একটা অসাধারণ পুকার দিচ্ছে তখন পেছন দিকে একদল উঠে গিয়ে সম্ভবত ফুচকা খেয়ে আরেক দলের জন্য চুরমুর নিয়ে এলো, কোল্ড ড্রিংকসের বোতলগুলোর নড়া ধরে ঢুকলো আরেক দল! কী গাইল রে! কী গাইল রে ! নটবেহাগ? নতুন রাগ নাকি? অনেক সময়ে মন্তব্য হত সা থেকে মা-তে যেতে কত সময় নিল দেখলি? আমীরা খান সাহেবা। এই সমস্তর জন্য ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত বিরক্ত অপালা একদিন মারোয়ায় সংক্ষিপ্ত আলাপ সেরে মধ্য লয়ে গান ধরে চট করে পৌঁছে গেল তার সেই বড়ে গোলাম আলি সুলভ কূট তানে, তারপর তারসপ্তকের ধৈবতে অনেকক্ষণ ধরে সুরস্পন্দন সেরে তারসপ্তকের সা। নেমে এলো মধ্যসপ্তক তারপর মন্দ্রের সাতে। তখন সারা অডিটোরিয়াম জুড়ে হাততালির পর হাততালি। অপালা এইবার তার নিজস্ব মুড অনুযায়ী পিলুতে ঠুমরি শেষ করে ভজন ধরল মৎ যা। মৎ যা। মৎ যা যোগী। তার

ভেতরটা তখন সুরে টগবগ করে ফুটছে। বহুক্ষণ ধরে ভজনটি গাইল সে। তার পরেও অনুরোধ আসছে। আরও ঠুমরি, আরও ভজন এমনকি আরও খেয়ালের জন্য। উত্তাল অডিটোরিয়াম পেছনে ফেলে সে চলে এসেছিল। সে শুনেছে তার এই দিনের গানের পরই এক বিখ্যাত ওস্তাদের বাজনা ছিল, সেটা নাকি জমেনি। উদ্যোক্তা বিরক্ত হলেন, নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি নিয়েছে বলে। বিখ্যাত ওস্তাদ তো বঙ্কিমচন্দ্র নন, যে আগামী দিনের গায়িকার হাতে জয়পত্র তুলে দেবেন। তিনি রাগী, মেজাজী মানুষ, সাঙ্ঘাতিক রেগে গিয়েছিলেন। ফলে পরদিন কাগজে কাগজে কী সমালোচনা, কী সমালোচনা! সবই রামেশ্বরের বিরুদ্ধ দলের। কেন সে দ্রুত বন্দেজে যায়নি! অল্পবয়স্ক একটা মেয়ের নিয়ম ভাঙার এ কী ধৃষ্টতা! তাছাড়া ওটা মারোয়া হয়েছে না সোহিনী? তানের সময় কোমল ঋষভ তো লাগছিলই না। একটিমাত্র বাংলা সাপ্তাহিকীতে তার ছবিসহ তার সমগ্র পার্ফম্যান্সের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা হয়েছিল। তার পরে অন্য গান শোনবার মেজাজ ফিরে আসতে যে মাঝরাত পার হয়ে গিয়েছিল সে কথাও এঁরা উল্লেখ করতে ভোলেননি।

কিন্তু তারপর থেকে আর ডাক আসে না। অপালা এখন শ্যাওলা-ধরা ডোবা, বা লবণ হ্রদ, যার ভেতরে ভেতরে সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগের একটা গোপন রাস্তা আছে, কিন্তু অব্যবহারে সেটা বুজে এসেছে। মিতুল সেই পথটা খুলে দিল। মিতুল। তার গুরুভগিনী। কতদিন তো সে বড় কনফারেন্সে গান শুনতেও যায় না। ওরা আস্তে আস্তে কমপ্লিমেন্টারি কার্ড পাঠানো বন্ধ করে দিল। শিবনাথ বললেন—'এ একটা অপমান! অপালা দত্তগুপ্ত টিকিট কেটে কনফারেন্স যাবে! এ হতেই পারে না।' তখন গুরু রামেশ্বরকে নিয়ে ভীষণ দলাদলিও চলছে। অপালার মতো শান্ত-সমাহিত মানুষের পক্ষে সেখানে টেঁকাও খুব মুশকিল! কিন্তু... কিন্তু...! পণ্ডিত চন্দ্রকান্তকে সে আর শুনতে পাবে না। রবিশংকর। বিলায়েত! ভীমসেন! গিরজা দেবী! বিসমিল্লা! নিখিল ব্যানার্জী! সব, স-ব হারিয়ে গেল জীবন থেকে! খালি এক অন্যমনস্ক বউ দিস্তে দিস্তে রুটি বেলে যায়, এবা প্রাতবাশে, টিফিনে, সবেতে রুটি পছন্দ করে, এক অন্যমনস্ক মা ছেলের জামা মেয়েকে পরাতে যায়, মেয়ের বই নিয়ে ছেলেকে পড়াতে বসিয়ে বকুনি খায়, সংসারে নতুন-আসা ধনীঘরের দুলালী ফর্সা নতুন বউটির সঙ্গে তুলনা ক্রমশই মুখর, আরো মুখর হয়ে উঠতে থাকে। সে বউটি প্রাত্যহিক কাজের খুঁটিনাটি করে না বটে, কিন্তু এক একদিন হঠাৎ কেক কি পুডিং কি মাংসের কাশ্মীরি রান্না করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। রণো ভ্রূকুটি তুলে বলে—'মা, তুমি কি একটা সিনথিটিক জামাও ঠিকভাব কাচতে পারে না! কলারে, কাফে ময়লা লেগে রয়েছে!' বনি বলে—'ওমা, আজকে কিন্তু আমরা সিনেমা যাবোই, বর্ন-ফ্রি এসেছে, সবাই দেখেছে স্কুলে, খালি আমরাই দেখিনি।' অপালা বলে—'যা, না, যা, বাবাকে বল।' —'ন্ না, তুমিও যাবে, তুমিও! 'টিটু বয়সের তুলনায় ভারী পাকা, বরাবরই। সে বলবে —'গান নিয়ে থাকলে কী পরিণতি হয় তোমাকে দেখেই তো বুঝছি মা, প্লীজ আমাকে জোর করো না। আমি আই.এ.এস হবো।'

॥ ১৮ ॥

এক মঙ্গলবার ভোর সকালে একটা ফোন পেলো অপালা। সকাল ছ'টা হবে। সে সবে স্নান সেরে বেরিয়েছে। শিবনাথ বললেন—তোমাকে কেউ লন্ডন থেকে ফোন করছেন।'

—'কে? বিদ্যুৎদা? হঠাৎ?' অপালা তাড়াতাড়ি এসে ফোন ধবল। বিদ্যুৎদা তাকে বা তার মাকে মাঝেমাঝে চিঠি লেখেন। গীতালিদিও লেখে। কিন্তু এরকম হঠাৎ ফোন-টোন পেলে বড় ভয় করে। দাদা চিঠিও দেয়। ফোনও করে। থাকে ক্যালিফোর্নিয়ায়। কিন্তু লন্ডন থেকেও মাঝে মাঝে দাদার ফোন আসে। কোনও কনফারেন্সে ওখানে গেলে ফোন করে খবব নেয়। ওখানেই বিয়ে করে পাকাপাকি থেকে গেল। মাকে নিয়ে গিয়েছিল একবার। মার আবার একা-একা মুখ বুজে থাকা সহ্য হল না। চলে এলো। সেই থেকে এখানেই একা থাকে।

ফোন ধরতে ওপাশের কণ্ঠটি বিনা ভূমিকায় বলল—'তোর ভাটিয়াব আর বৃন্দাবনী সারঙের রেকর্ড শুনলুম অপু। এককথায় অপূর্ব।'

অপালা বলল—'কে,বিদ্যুৎদা?'

—'কী? কী বললি? বিদ্যুৎদা? বিদ্যুৎ সরকার ডাক্তার হিসেবে ভালো হতে পারে কিন্তু এরকম গলা পেতে হলে তাকে বেশ কয়েক জন্ম ঘুরে আসতে হবে।'

অপালার তখন সত্যিই খেয়াল হল ওদিকের কণ্ঠ বিদ্যুৎ সরকাবের তো নয়ই। অসামান্য ভাবসমৃদ্ধ এক পুরুষালি কণ্ঠ। সে চুপ কবে আছে দেখে কণ্ঠ আবার বলল—'তুই কি আজকাল বিদ্যুৎ-টিদ্যুৎ সবার সঙ্গেই তুই-তোকারির টার্মস্-এ এসে গিয়েছিস নাকি অপু? খুব উন্নতি হয়েছে দেখছি!'

অপালা প্রাণের সমস্ত আনন্দ ও বিস্ময় ঢেলে দিয়ে বলল—'সোহম? সোহম? তুই সোহম কথা বলছিস?'

—'ইয়া, ম্যাডাম, দিস ইজ সোহম চক্রবর্তী দি ইনফেমাস গজলিয়া স্পীকিং।'

—'কোথা থেকে বলছিস?'

—'বিদ্যুৎদার বাড়ির থেকে খুব দূরে নয়, কেন্ট-এই, বার্লে অ্যাভেন্যু বলে একটা জায়গা থেকে।'

হঠাৎ অপালার একটা প্রশ্ন মনে পড়ল, সে বলল—'ইনফেমাস বললে কেন সোহম?'

—'আরে ম্যাডাম, ইনফেমাস শুনেই তুমিতে ট্রান্সফার করে দিলি? আমার সব রোম্যান্টিক রসালো কাণ্ড-কারখানার বিবরণ কেচ্ছা-কাগজে বেরোয় না? নাবিকদের মতন প্রতি বন্দরে একটা করে বউ আছে ইত্যদি ইত্যাদি।

কিছু কিছু অপালার কানে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু সে যে সোহমকে চেনে তাকে ছাড়া আর কাউকেই চিনতে পারে না। সংক্ষেপে বলল— 'আমি ওসব কিছু জানি না, আসলে গানবাজনার জগতের পলিটিক্স্ থেকেও বহুদূরে বাস করি।'

—'পলিটিক্স্ থেকে দূরে বাস কর, ইট্স্ ওকে বাই মি, কিন্তু গান-বাজনার থেকেও দূরে থাকিস না। "আশাবরী" নামক ছবিটার রেকর্ডে পুরনো অপালাকে খুঁজে পাচ্ছি যেন, খালি মাঝের কয়েক বছর কোথায় ডুব গেলে ছিলি, জানতে পারি কি ?'

অপালা বলল—'অত কথা ফোনে বলা যাবে না। তোর বিল উঠছে না ?'

—'বিল আমার হোস্ট দেবে। আমার কি। তোর কি আমার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না ? প্রুডিশ হয়ে গেছিস নাকি আজকাল ?'

—'বাজে কথা বলিস না সোহম। কিন্তু তুই গজলিয়া হয়ে গেলি কেন ?'

—'সে অনেক কথা। ফোনে এত দূরত্ব থেকে বলা যাবে না। অপালা, ভালো আছিস তো ? তোর সেই কার্তিক ঠাকুর বরটি ? ছেলেপিলে কটি ?' শেষ কথাটা সোহম বলল গিন্নিদের মতো করে। অপালার উত্তর শুনে বলল— 'তিনটি ? বলিস কি ? একেবারে ভারত সরকারের লিমিট অবধি চলে গেছিস ? তুই যে এতটা মানে ইয়ে, তা তো জানা ছিল না, বাইরে থেকে দেখে তো মনে হত ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানিস না।'

অপালা বলল—'মার খাবি সোহম্।'

—'আচ্ছা রাখি। শীগগির দেখা হবে।'

আলো-ঝলমলে মুখ নিয়ে অপালা ফিরে দাঁড়াল। শিবনাথ মুখ থেকে কাগজ সরিয়ে বললেন—'সোহম ? বাঃ কতদিন পর ? তোমার এক নম্বর বন্ধু।'

রণো সবে ঘুম থেকে উঠে দাদুর ঘর থেকে বেরোচ্ছিল। বলল —'কে ফোন করছিল ? সোহম চক্রবর্তী ? গজল ? ওহ্ ফ্যানটা ! মা সোহম চক্রবর্তী কেন তোমায় ফোন...'

—'ও তো আমার বন্ধু !'

—'তোমার বয় ফ্রেন্ড ? আই কান্ট রিয়্যালি থিংক অফ ইট !'

—'সোহম আমার গুরুভাই। দুজনেই রামেশ্বরজীর কাছে ছোট থেকে শিখেছি।' অপালা গম্ভীর মুখে বলল।

রণো বলল—'তোমাকে আজকাল ম্যাজিশিয়ান বলে মনে হচ্ছে। টুপির থেকে খরগোসের মতো একটার পর একটা চমক বার করছ ? মিতশ্রী ঠাকুর... সোহম্ চক্রবর্তী... আর কতকগুলো এরকম খরগোস আছে বলো তো ?'

আনন্দের আতিশয্যে আজকে অপালা চায়ে চিনির বদলে সুজি দিয়ে ফেলল। মনোহর বললেন—'বউমা আমার যে ব্লাড সুগার হয়েছে তা তো জানতুম না !'

অপালা হাঁ করে চেয়ে আছে দেখে ছোট দেওর বিশ্বনাথ হাসতে গিয়ে বিষম খেল। তারপর বলল—'চায়ে চিনি নেই বউদি।'

অপালা জিভ কেটে রান্নাঘরের দিকে চলে যাচ্ছে, বিশ্বনাথ ডেকে বলল— 'বউদি, কিছু একটা দিয়েছো, কিন্তু সেটা চিনি নয়, এই যে তলায়, ক্রমশ ফুলে উঠেছে !' তখন শাশুড়ি বলে উঠলেন— 'ওই দ্যাখো, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই সুজি দিয়েছো, একরকম কৌটো-পাশাপাশি থাকে !' তখন সবাইকারই হাসির পালা।

নিজের বিয়ের আগে পর্যন্ত বিশু দারুণ বউদি-ভক্ত ছিল। গান শুনতে চাইত, অবশ্য ক্ল্যাসিক্যাল নয়, কিন্তু অন্য যে কোনও গানেই তো অপালার সিদ্ধি আছে। বন্ধুর টেপ-রেকর্ডার এনে রেকর্ড করত, ভালো ভালো রেকর্ড, ক্যাসেট এনে উপহার দিত। রেডিও বা দূরদর্শনে রেকর্ডিং-এ যাবার সময়েও প্রায়ই বউদির সঙ্গী হত। প্রথম চাকরি পেয়ে বউদিকে একটা স্বরমণ্ডল কিনে দিয়েছিল। সেই দেওর একটু বেশি বয়সে বিয়ে করবার পর একেবারে বদলে গেছে। ধনী ঘরের ছোট জাটি খুব ফর্সা, নাদুসনুদুস, তার পিসশাশুড়ির ভাষায় এতদিনে বাড়িতে একটা সুন্দর বউ এলো। বেশ ভদ্র মার্জিত ব্যবহার। কিন্তু অপালা যতই তার দিকে এগিয়ে যায়, ততই সে দূরে সরে যায়। এভাবে নিজের থেকে এগোনোও অপালার স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু একে বিশুর বউ, তার ওপর তাব নিজের জা, তার বোনও নেই। স্বাভাবিক স্নেহেই সে এগিয়েছিল। বিশুও তখনও বউদির অনুগত দেওর। তারপর হঠাৎ একদিন বিকেলের জল-খাবারের পাত্রটা ছোট বউ জয়া তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। তখন খেতে বসেছেন শ্বশুরমশাই। রণো এবং বিশু সবে এসে বসছে। জয়া বিশুর প্লেটে সযত্নে খাবার সাজিয়ে দিল, তারপর হুড়মুড় করে ছুটে চলে গেল রান্নাঘরে। চা-এর কাপটা সন্তর্পণে নামিয়ে রাখল বিশ্বনাথের প্লেটের পাশে। বাকিগুলো অপালাই পরিবেশন করল। বিশু আগে খাবার টেবিলে বসে অনেক গল্প করত। বউদির সঙ্গে দাদার সঙ্গেও তার নানাবিষয়ে আলোচনা হত, তর্ক হত। বিয়ের পর আস্তে আস্তে সে ঘরবন্দী হয়ে পড়ল। হয় ঘরে, নয় জোড়ে। সে খাবার টেবিলেই হোক, বাইরে বেড়াতে যেতেই হোক। আজ অনেক দিন পর ও বাবার সঙ্গে বসে চা খাচ্ছে, সম্ভবত জয়া কদিনের জন্য ভাইয়ের বিয়েতে বাপের বাড়ি গেছে বলে। অনেকদিন পর বিশু বউদি কথাটা উচ্চারণ করল। অপালার মনে হল একেকটা দিন যেন সুখের রোদ নিয়েই ওঠে। কী গভীর এই সুখের, শান্তির, আনন্দের স্বাদ, সে ছাড়া কে বুঝবে?

॥ ১৯ ॥

'আশাবরী' ফিল্মের শেষ গানটি ছিল অপালা এবং মিতশ্রীর যুগ্ম গান। আসাবরীতে। ললিতে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে আসাবরীতে মিশে গেছে। অসম্ভব সাফল্য পেয়েছে গানটি। মিতশ্রীর গলার দানাওলা বুনোট, একটু ভারী যেন স্প্যানিশ গীটারের মতো দাপট, অন্যদিকে অপালার সুরবাহার। সত্যি-সত্যিই কখনও নাভি থেকে, কখনও হৃদয় থেকে, কখনও কণ্ঠ থেকে কখনও মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে আসছে সুরধারা। দুটো স্বর একেবারে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে তাদের দ্বৈতসঙ্গীতে। তারা কখনও গেয়েছে দুজনে, কখনও এ একা, কখনও ও একা।

'আশাবরী' ফিল্ম জগতে একটা হই-হই ফেলে দিল। সকলেই বলছে মার্গ-সঙ্গীতের ওপর ভিত্তি করে কোনও ছবির এতখানি সাফল্য কেউ চিন্তাতেও আনেনি। মার্গ সঙ্গীতের বিক্রিরও একটা রেকর্ড হয়ে গেল। সকলেই বলছে ফিল্ম যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীতকে এক সময় পপুলার করেছিল, সেরকমই ফিল্ম এবার

উচ্চাঙ্গসঙ্গীতকে জনপ্রিয় করল। ছবির প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী চললে এটা হত কিনা সন্দেহ। গল্পটাকে বহুবার বদলে বদলে ফেলা হয়েছে। বেশ কিছু ফিল্ম নষ্টও হয়েছে। কিন্তু মিতুল যতক্ষণ না তৃপ্ত হচ্ছে ততক্ষণ থামেনি। এবং দেখা গেছে তার সৃজনীশক্তি, কল্পনা, পরিচালক গৌরাঙ্গ সিন্‌হার থেকে অনেক অনেক পরিণত। রামেশ্বরের অপূর্ব সব বন্দিশ চয়ন, অপালার অপ্রত্যাশিত কণ্ঠলাবণ্যের আবিষ্কার ছবির মূল ভিত্তি। মিতুল তার জীবনের যা কিছু স্খলন, পতন, ত্রুটি, খেয়াল, জেদ, সাফল্য, গ্ল্যামার ছড়িয়ে দিয়েছে ছবিটির প্রথম অংশে। অপালার সঙ্গে তার গানের মোকাবিলা ছবিটির ক্লাইম্যাক্স। প্রথমে এরা রেখেছিল সেই বহুব্যবহৃত প্রতিযোগিতা টেকনিক। কিন্তু অপালার গানের পরিপক্কতার সঙ্গে প্রতিযোগিতাকে খাপ খাওয়াতে স্বয়ং মিউজিক ডিরেক্টরই ব্যর্থ হয়ে গেলেন। মিতুল একে পাল্টে দিল এক জলসায়। যাতে নাকি সে জনপ্রিয়তম পপ-সিঙার হিসেবে উপস্থিত। এবং এইখানে মিতুল তার মনের সাধ মিটিয়ে গানের সঙ্গে নাচলও। সে নাচ ভরতের নাট্যশাস্ত্র মেনেও নয়, ব্যালের নিয়ম মেনেও নয়, শুধু গানের সুরের সঙ্গে নিজেকে কখনও সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ মুচড়িয়ে যাওয়া, কখনও ভেসে যাওয়া মঞ্চের ওপর দিয়ে, কখনও শুধু পায়ের কাজ, কখনও কত্থকের মতো, কখনও ব্যালের ভঙ্গিতে। তার এই অদ্ভুত খিচুড়ি নাচের এফেক্ট দেখে ডিরেক্টর আরও কয়েকটা এরকম নাচের সিকোয়েন্স রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মিতুল রাজি হয়নি। অন্য গানের সঙ্গেও সে নেচেছে কিন্তু সে শুধু অল্পস্বল্প হাতের মুদ্রা, কটিভঙ্গ। একটু পায়ের কাজ, চোখের ভঙ্গি এই পর্যন্ত। তার যুক্তি এ জিনিস আগে থেকে অভ্যাস করিয়ে দিলে ক্লাইম্যাক্সের দৃশ্যে এর তেমন ইম্প্যাক্ট হবে না। উপস্থাপনার শিল্পে মিতুলের জন্মগত অধিকার। দেখা গেল মিতুলের ধারণাই ঠিক। ফিল্‌মে আছে নায়িকার এই গানের পরে দর্শক-শ্রোতা তুমুল হাততালিতে ফেটে পড়ল। হলে হলে ফিল্‌মটি দেখার সময়েও দর্শকদের একই প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত। এর পরই অপালার গান। অভিনয় করছেন একজন নামকরা পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছর বয়স্ক প্রতিথযশা অভিনেত্রী। সেই তুমুল হাততালির পর তিনি তাঁর মহিমাময়, শান্ত, প্রত্যয়ী পদক্ষেপে আস্তে আস্তে এসে বসছেন, যন্ত্রীরা চারপাশে নিজেদের সাজিয়ে নিচ্ছে ধীরে ধীরে। তিনি ধীর ভঙ্গিতে আরম্ভ করলেন কৌশিকী কানাড়া। আশ্চর্যের বিষয় অন্তত কুড়ি মিনিট এই গানের সিকোয়েন্স। আলাপ, গান, সুরবিস্তার, নানারকম লয়কারি, সরগম। এবং অবশেষে ভজন 'দুসর ন কোই মেরে তো গিরধার গোপাল।' ফিলমের দর্শক একেবারে লুপ্ত পূর্বস্মৃতি হয়ে এই গান শুনল, যখন শেষ হল তখন নায়িকার বহু আলো এবং যন্ত্রের কারসাজি সমেত গান ও নাচের রেশ সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে। ফিলমে দেখানো হচ্ছে এই গানের শেষে একটিও হাততালি নেই, আবহসঙ্গীত নেই, এক ভরাট নৈঃশব্দ্যের মধ্যে গায়িকা যুক্ত করে মাথা নিচু করে তাঁর শ্রোতাদের নমস্কার জানাচ্ছেন। শ্রোতারাও ঠিক সেই একইভাবে তাঁকে নমস্কার করছেন, নিচু হয়ে। পাশ থেকে সামনে থেকে ওপর থেকে শট নেওয়া হয়েছে। ওপর থেকে নেওয়া শটটা দেখাচ্ছে অনেকটা রেড রোডের ওপর ঈদের নামাজের

দৃশ্যের মতো। তারপর দিগ্‌ধা দিগ্‌দিগ্‌ থেই এই ছন্দের তেহাইয়ে সমস্ত দৃশ্যপটটিকে তিনবার ঘুরিয়ে অবশেষে অডিটোরিয়ামে বসা মিতশ্রীর স্তব্ধ দেহ আর মুখের ওপর ক্যামেরাকে স্থির করা হয়েছে। যেন একটা উদ্দেশ্যহীন ঘুবন্ত জীবনের চক্রদার শেষ করে এবার তার জীবন এক অর্থপূর্ণ মূল্যবান সমে এসে থামল। ইঙ্গিতটা এইরকম। এরপর আছে অপালার যথেষ্ট গান, ভাটিয়ার, বৃন্দাবনী সারং-এ রাগপ্রধান, তিলক কামোদ যার শেষে সে হঠাৎ নজরুলের গানটি ধরে নেয় মাঝখান থেকে। ছবি যেখানে শেষ হচ্ছে সেখানে অনেক প্রার্থনা অনেক সাধনার পর নায়িকা এই সাধিকা শিল্পীর পর্যায়ে পৌঁছতে আবম্ভ করেছেন। নির্জন পর্বতবাসে ডুয়েট গান প্রথম ললিত তারপর আসাবরীতে। পুরো আধ ঘণ্টার গান, আলাপ, বিলম্বিত খেয়াল, দ্রুত খেয়াল যাব অনেকটাই যন্ত্রসঙ্গীতের মতো ঝালার ভঙ্গিতে গাওয়া। একজন দ্রুত তান করে যাচ্ছে, আরেকজন মিড় টানছেন কণ্ঠে, গভীর দরদী। ব্যাকুল মিড়। তারপর সেই দ্রুত গান চৌগুণ থেকে একেবারে প্রথমে যে ভাবে আরম্ভ হয়েছিল সেই ধীর বিলম্বিত ঠায়ে শেষ হচ্ছে। অবশ্য এর সঙ্গে আছে প্রচুর দৃশ্য। নায়িকার জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, দুঃখ, শোক, আনন্দ, আবেগ সবই এখানে গানের অগ্রগতির সঙ্গে দেখানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে রয়েছে অন্ধকার কেটে ভোর হবার দৃশ্য। পাহাড়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গে শৃঙ্গে নানান রঙে সূর্যালোকের প্রতিবিম্বিত হবার দৃশ্য। কিন্তু এই সব দৃশ্য-কাব্য ছাড়াও শুধু গানের গুণেই ছবিটি জনপ্রিয়তা অর্জন করল। এটা কোনও মার্গসঙ্গীত-ভিত্তিক ছবির পক্ষে সম্ভব বলে কেউ মনে করেনি। পরিকল্পনার বাহাদুরি যে প্রায় সম্পূর্ণই মিতশ্রীর প্রাপ্য সে কথা স্বয়ং গৌরাঙ্গ সিনহা পর্যন্ত শতমুখে স্বীকার করলেন। ছবিটির ইংরেজি সাব-টাইটল হল— 'দা মিউজিক অফ অ্যাসপিরেশন।' স্বদেশ-বিদেশে প্রচুর পুরস্কার পেলো ছবিটি। শ্রেষ্ঠ গায়িকার পুবস্কার পেলো অপালা দত্তগুপ্ত। কিন্তু মিতুলের আসল লাভ হল অন্যখানে। সে বরাবর অপালাকে ভালোবাসে। অপালাদির এই সাফল্যে সে শুধু যে আনন্দিত তাই নয়, একটা প্রিয়জনকৃত্য এতদিনে করল—এই তার মনোভাব। দ্বিতীয়ত রামেশ্বর ঠাকুরকে এখন অনেকেই মিউজিক ডিরেক্টর হবার জন্য ডাকছে। তিনি রাগসঙ্গীতের সুর তো সম্পূর্ণ দিয়েছেনই, তার ওপর জায়গায় জায়গায় আবহসঙ্গীত করেছেন অসাধারণ। আর তৃতীয়ত মিতুল এতদিনে বোধহয় তার বহুদিনের অন্বিষ্ট এবং নাচকে একত্রে পেলো।

নাচের কমপোজিশনের জন্য রাখা হয়েছিল শেখরণ নামে একটি যশস্বী শিল্পীকে। অন্যান্য নাচের রচনা ইনি নিজেই করলেন যথাযথ। কিন্তু মিতুল যখন তার ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যের নাচটি দেখালো, শেখরণ্‌ বললেন— 'এ তো একেবারে অন্যরকম। খানিকটা আমেরিকান মডার্ন ডান্সের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এতে আমি হাত দিতে পারবো না। এতে কিছু করার নেই। ইট ইজ পার্ফেক্ট ইন ইটস ওন ওয়ে। আপনি কার কাছে নাচ শিখেছেন ?'

মিতুল একটু হেসে বলল— 'কারুর কাছে না। দেখে দেখে। বই পড়ে পড়ে।" শেখরণ্‌ অবাক হয়ে বললেন— 'আর ইউ সীরিয়াস ?'

—'ওহ্ ইয়েস।'

—'আমার কাছে শিখবেন ? আপনাকে আমি কয়েক বছরের মধ্যেই তৈরি করে দেবো। আপনার তো দারুণ ফ্লেক্সিব্‌ল্ বডি, শিখবেন ?'

শেখরণ্ দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। তার গায়ের রঙে একটা খাঁটি সর্ষের তেলের মতো আভা। শুধু গায়ে এক ফালি উত্তরীয় পৈতের মতো করে পরে মাথার ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সে যখন বিশুদ্ধ তাঞ্জোর স্টাইলে নাচে, তার দেহের সমস্ত পেশীগুলিও নাচতে থাকে। মিতুলের গা শিরশির করে। সে অনুভব করে ডিরেক্টর সিনহার প্রতি তার যে একটা প্রাথমিক যৌন টান গড়ে উঠেছিল, সেটা কবে ছবি তৈরির নানা মুহূর্তে শিথিল হতে হতে এখন একেবারে উধাও হয়ে গেছে। সিনহার মতো কল্পনাহীন, এক কথায় ম্যাদামারা পুরুষ, যে আবার কেজিরিওয়ালের থাবার দিকে তাকে নানান কায়দায় এগিয়ে দেবার চেষ্টা করে গেছে, তার প্রতি যে কোনদিন কোনও আকর্ষণ অনুভব করেছিল এটা ভাবলেও মিতুলের নিজেকে চড় মারতে ইচ্ছে হয়। কেজরিওয়াল একেবারে তার গা ঘেঁষে নিজের সমস্ত মেদভার তার ডানদিকটার ওপর ন্যস্ত করে বসল। দুজনের হাতেই গ্লাস। মিতুল খাচ্ছে জিঞ্জার বীয়ার, কেজরিওয়াল হুইস্কি। মিতুল মিষ্টি হেসে জিগগেস করল— 'হুইচ ব্র্যান্ড অফ আফটার শেভ ডু ইউ ইউজ মিঃ কেজরিওয়াল ?'

কেজরিওয়াল প্রায় মিতুলের গালে গাল ঠেকিয়ে বলল— 'হোয়াই শুড আই ডিসক্লোজ মাই সিক্রেট মিতসিরি ?'

মিতুল আরও হেসে বলল— 'নো, আই ওয়াজ ওয়ান্ডারিং ইফ ইট ওয়াজ মেড অফ কাউ-ডাঙ।'

তখন ছবি শেষের দিকে। কেজরিওয়ালের আর ফেরবার পথ নেই। সিনহাকে নিজের ঘরে ডেকে মিতুল বলল— 'গৌরাঙ্গ, এখন যদি আপনার দু গালে কষে দুটো চড় কষাই পুরো টীমের সামনে, হাউ উড য়ু ফীল।'

গৌরাঙ্গকে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হয়েছিল। বহু টাকার প্রজেক্টটা নইলে মুখ থুবড়ে পড়ত।

কিন্তু শেখরণ্‌কে সে কিছুতেই তার মন থেকে সরাতে পারছে না। অথচ আপাতদৃষ্টিতে শেখরণ্ তার বিখ্যাত আবেদন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন। তার সঙ্গে শেখরণের বেশি কাজও নেই। তা সত্ত্বেও বম্বের যে হোটেলে মিতুলরা তখন বাস করছে সেখানে নিজের ঘরে সে শেখরণ্‌কে আলোচনার জন্য ডেকে পাঠাল।

কিছুক্ষণের মধ্যে শেখরণ্ এসে গেল। সে পরেছে ফেডেড জীনস্ এবং ঢোলা হাওয়াই শার্ট। শেখরণের চলাতেও একটা তাল থাকে। সে যখন তালে তালে চলছে তার শার্টটা দুলছে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। কোথাও বাধছে বলে মনে হচ্ছে না। এতো সরু কোমর। মিতুল আজকে একটা চামুণ্ডি জর্জেট পরেছে। মাথার চুল ছাড়া। ঠোঁটে কোনও প্রসাধন নেই।

শেখরণ্ ভালো বাংলা বলতে পারে— আড়াই বছর শান্তিনিকেতনে নাচ শিখিয়েছে। সোফার ওপর বসে সে হাঁটুর ওপর হাঁটু রাখল, তারপর তার উদয়শংকরী হাত দুটো দুদিকে ডানার মতো মেলে দিয়ে বলল— 'বলুন।'

কোনও নর্তক যখন পোশাক পরে থাকে তখন তার দেহসৌষ্ঠব প্রায় কিছুই

বোঝা যায় না। ঠিক ব্যায়ামবীরদের মতো। কিন্তু শেখরণ্ আয়ার শুধু সুদেহী নয়, সুমুখও। তার ভ্রূ দুটি প্রায় জোড়া। শক্তপোক্ত টিকোলো নাক। চোখ দুটি ভাষাময়। ঈষৎ স্থূল, বঙ্কিম এবং একটু ছড়ানো তার ওষ্ঠাধর।

মিতুল অপলকে তার দিকে তাকিয়ে বলল— 'বলবার কথা তো আপনারই।'

—'আমার ?'

—'বাঃ আপনি তো বলছিলেন আমার নাচের ট্যালেন্ট আছে। বছর দুয়েকের মধ্যে নাকি তৈরি করিয়ে দেবেন।'

—'দেখুন মিতশ্রী, পিওর ক্ল্যাসিক্যালের দৃষ্টি থেকে দেখতে গেলে আপনার অনেক ভুল আছে। যেমন আপনি কত্থকের পায়ের কাজের সময় যেখানে পায়ের পাতা সোজা পড়বে, সেখানে গোড়ালি তুলছেন। তাছাড়া কত্থকের পায়ের সঙ্গে আপনি প্রচুর ভরতনাট্যমের মুদ্রা করেছেন। অনেক লিবার্টি নিয়েছেন। সেই জন্যেই জিজ্ঞেস করছিলুম আপনি কার কাছে শিখেছেন। কিন্তু আপনি যে আনইউজুয়ালি ক্রিয়েটিভ, সে আমি একটু দেখেই বুঝে নিয়েছি। আর যেহেতু এতে আবার ব্যালের অঙ্গও মিশিয়ে একটা ইম্প্রোভাইজ্‌ড় ধরনের নাচ তৈরি করেছেন, আমি এতে দোষের কিছু দেখতে পাইনি। এটুকু ক্যাথোলিসিটি আমার আছে। ইভ্‌ন দো আই বিলং টু দা কট্টর তাঞ্জোর ঘরানা।'

—'আপনি কি সত্যিই মনে করেন, এই বয়সেও আমি নতুন করে নাচ শিখতে পারবো ?'

—'দ্যাট ডিপেন্ডস্'...

—'বুঝিয়ে বলুন।'

—'আপনি কি একেবারে পিওর ক্ল্যাসিক্যাল ডান্সার হতে চান ?'

—'আমি কিছু হতে চাইনি। আপনিই বলছিলেন...'

—'বলেছিলাম...তবে সেটা অন্য কথা ভেবে...'

—'অর্থাৎ...'

—'দেখুন মিতশ্রী, আমি নিজেও ক্রিয়েটিভ স্বভাবের মানুষ। কতকগুলো স্টাইলের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বিশিষ্ট ঘরানার প্রয়োজন আছে এটা আমি অবশ্যই অনুভব করি। কিন্তু শান্তিনিকেতনে থাকবার সময়ে ওখানে বহু নৃত্যনাট্যর কোরিয়োগ্রাফি করবার সময়ে বিশেষত উদয়শংকরের 'কল্পনা' দেখে আমার ভেতরে অনেকদিন থেকেই কতকগুলো আইডিয়া আসছে। ভরতনাট্যম পুরোপুরি ভাবনৃত্য ও নাট্যনৃত্য। কিন্তু কিছুটা ইনিসিয়েশন না থাকলে তার মর্ম বুঝতে সাধারণ দর্শকের কালঘাম ছুটে যাবে। বিদেশি দর্শক শুধু অঙ্গভঙ্গি, সাজপোশাক আর সমবেত নৃত্যের যে অ্যাপীলটা আছে সেটা বুঝবে। তার বাইরে কিছু না। আমার ইচ্ছে ছিল কিছু নাট্যনৃত্য কমপোজ করি কিছু মিথ-এর ওপর বেস করে যেমন মহাপ্রলয়, মডার্ন থীমস্ যেমন বার্লিন ওয়ল, ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের কিছু পর্যায়। রবীন্দ্রনাথের 'চার-অধ্যায়'ও আমার মাথায় আছে। এর মধ্যে সব রকম আঙ্গিকের মিশ্রণ থাকবে, মিশ্রণটা ইচ্ছে মতো হবে না, ভাবকে অনুসরণ করবার জন্য হবে। যেমন আপনি

'আশাবরী'র ক্লাইম্যাকটিক সিনে করলেন। জিনিসটা আরও রিচ হবে যদি আপনি কিছু ভারতীয় ক্লাসিক্যাল এবং ফোক ডান্স শিখে নেন।'

—'ওরে বাবা', মিতুল বলল— 'সে তো ভীষণ পরিশ্রম!'

—'তা একটু আছে। তবে ইউ আর আইডিয়্যালি সুটেড ফর দিস কাইন্ড অফ থিং। আমরা একটা ইয়োরোপ টুর অ্যারেঞ্জ করতে পারি। আমার সঙ্গে যেতে রাজি, এরকম অনেক আর্টিস্ট আছেন, বাই দা ওয়ে, অপালাদিকে পাওয়া যাবে এ ধরনের পরিকল্পনায়?'

মিতুল নিজের ভেতরে সূক্ষ্ম খুব সূক্ষ্ম একটা বিদ্রোহ অনুভব করল, বলল— 'না। অপালাদি ঘরোয়া মানুষ। আমার মনে হয় না উনি বাজি হবেন।'

—'আমারও তাই মনে হয়েছিল। শী ইজ কোয়াইট ডেফিনিটলি এ জিনিয়াস।'

মিতুল বলল— 'আমার জাস্ট দেখে দেখে শেখা একটা তিল্লানা দেখবেন?'

—'দেখান।'

একজন নামী ক্লাসিক্যাল ডান্সাব-এর কাছে সে তার অ্যামেচারি দেখাচ্ছে, কিন্তু মিতুল বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়।

সে তৎক্ষণাৎ তার জর্জেটের আঁচল কোমরে জড়িয়ে চুলে একটা ফেট্টি বেঁধে নাচতে প্রস্তুত হয়ে গেল। শেখরণ্ আদিতালে গান ধরল। মিতুল নাচতে থাকল।

কিছুক্ষণ পর সে শেখরণের পাশে বসে পড়ল। তার ডান কাঁধ স্পর্শ কবেছে শেখরণেব প্রসারিত হাতের আঙুল।

শেখরণ্ বলল— 'ফ্যানটাসটিক। এটা আপনি শুধু দেখে তুলেছেন? আপনার নাচের প্রতিভা জন্মগত। গানও খুব ভালো গান। রিচ ভয়েস। কিন্তু নাচ করলে আপনি এতোদিনে একটা ওয়ার্ল্ড ফিগার হয়ে যেতেন। এটা কি আপনি আমাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখালেন? পিওর ক্ল্যাসিক্যালে যাওয়া শক্ত হিন্ট দিয়েছিলাম বলে?'

মিতুল ছেলেমানুষের মতো বলল— 'আপনি যদি সাভেরীতে গানটা ধরেন আমি আপনাকে একটা পল্লবীও দেখাতে পারি। এক্ষুনি। জাস্ট ফাইভ মিনিটস রেস্ট।'

শেখরণ্ হেসে বললেন— 'লোভ হচ্ছে দেখতে। কিন্তু দরকার নেই। আপনি সব পারবেন এ বিশ্বাস আমার হয়েছে। আমি যে প্রজেক্টটা করছি, তাতে যদি আপনি ইন্টারেস্টেড হন তাহলে খুব ভালো হয়। ইন্টেনসিভ রিহাস্যালি দিলে ছ মাসে আমরা তৈরি হয়ে যেতে পারবো। দা টুর ইটসেলফ মে টেক, সে, টু ইয়ার্স।'

—'আমার একটা নিজস্ব কেরিয়ার আছে।'

—'সেই জন্যই তো জিজ্ঞেস করছিলাম।'

মিতুল একটু ভাবল। এক 'আশাবরী' থেকেই সে বহু টাকা পেয়েছে। দু বছর বাবাকে ছেড়ে থাকতে হবে। দুই কেন আড়াই। অপুদির সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার। এতদিনে দীপালিদির দিদি মিতালিদির ক্লাসগুলোতে হাঁ করে বসে থাকার ফল মিলল। সে মাথাটা হেলিয়ে বলল— 'ডান।'

শেখরণ্ উঠে পড়ল, বলল— 'মেনি মেনি থ্যাংকস। আমার কয়েকটা কোরিওগ্রাফি রেডি। মডার্ন থিমগুলো নিয়ে এখন কাজ করছি। আপনি যখন রিং করলেন, ইন ফ্যাক্ট তখনও ওই কাজই করছিলাম।'

মিতুল ব্যস্ত হয়ে বলল— 'অ্যাট লীস্ট হ্যাভ সাম ড্রিঙ্কস শেখরণ্।'

তার স্বরে কি ছিল, শেখরণ্ মুখ ফিরিয়ে চাইল, মিতুলের চোখে চোখ পড়ল। এই প্রথম, জীবনে এই প্রথম বোধ হয় মিতুল তার চোখ নামিয়ে নিল। শেখরণ্ খুব নরম গলায় বলল—'ও কে। লেটস হ্যাভ সামথিং হট্। ধরুন কফি।'

ফোন তুলে কফির অর্ডারটা দিল মিতুল। সে একটু একটু কাঁপছে। তানপুরোর খরজের তারটা বাজালে, জুড়ির তার দুটো যেমন সরু করে বেজে ওঠে! তেমন! শেখরণ্ হঠাৎ একদম অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল— 'জানেন মিতশ্রী, আই ওয়জ ম্যারেড হোয়েন আই ওয়জ টোয়েন্টি। তখন আমার স্ত্রী সাবিত্রীর বয়স ছিল পনের। আমার এখন বিয়াল্লিশ বছর বয়স। সাবিত্রী আমার ছেলেবেলাকার সাথী বলতে পারেন। আনফর্চুনেটলি উই আর চাইল্ডলেস। সাবিত্রী একটি ছেলেকে অ্যাডপ্ট করেছে। আমার বাবা-মাব সঙ্গে থাকে মাদ্রাজের একেবারে উত্তরে এরুক্কানচেরি বলে একটা জায়গায়। গান, বাজনা, নাচ কিছুই ওর আসে না। এমনকি খুব বোঝেও না। বাট শী ইজ ভেরি ভেরি সুইট অ্যান্ড গুড। আমি তো বাইরে বাইরেই থাকি। বাট হোয়েন আই অ্যাম ইন ম্যাড্রাস, আই অ্যাম অল হার্স। এ গুড অ্যান্ড ডিউটিফুল, রেসপনসিব্‌ল অ্যান্ড লাভিং হ্যাজব্যান্ড। তখন এসব নাচ-টাচ চলবে না। অথচ আশ্চর্যের কথা, ওই সময়টা থেকেই আমি আমার অনেক আইডিয়াজ, ইনসপিরেশন পাই।'

কফি এসেছে। মিতুল কাঁপা কাঁপা হাতে শেখরণ্কে ঢেলে দিল তার কফি। শেখরণের বিয়াল্লিশ বছব বয়স? সে ভেবেছিল বত্রিশ-টত্রিশ হবে। কী ভাবে চেহারা রেখেছে? ম্যারেড? ম্যাবেড টু এ তামিল হাউজওয়াইফ! নাকের দুদিকে দুটো নাকছাবি। কুচকুচে কালো রঙের ওপর বেগনি কাঞ্জিভবম্ পরে ইডলি বানাচ্ছে! মাথায় গাঁদা ফুল!

শেখরণ্ কফিতে চুমুক দিয়ে বলল— 'অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট ইউ?'

মিতুল প্রথমটা জবাব দিল না। শেখরণের এই অপ্রাসঙ্গিক কিম্বা কে জানে হয়ত প্রাসঙ্গিক স্বীকারোক্তি তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নিয়েছে। তারপরে তার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে— ক্রোধ! ক্রোধ! ক্রোধ! তার চেহারাটা লাল হয়ে উঠেছে।

সে বলল— 'বাবা অর্থাৎ রামেশ্বর ঠাকুর ছাড়া আমার কেউ নেই। আই লাভ হিম, অ্যান্ড হিম অ্যালোন। আমার মা আমার পাঁচ বছর বয়সের সময়ে বাবার এক মুসলিম শিষ্যর সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন। সে ভদ্রলোকের নাম বললে আপনি চিনবেন। এখন মায়ের সঙ্গে থাকেন না। মোস্ট প্রব্যাব্‌লি মাই মাদার ইজ দা সোর্স অফ মাই ট্যালেন্ট ইন ডান্স। আমি বিয়ে করিনি, করবও না। আই হেট মেন।'

শেখরণ্ দেখল— মিতুলের চোখ দিয়ে জল ঝরছে। নীচের ঠোঁটটা সামান্য

ফুলে ফুলে উঠছে।

শেখরণ্ নিজে শিল্পী। তার সমস্ত দেহ-মন সুর তাল ছন্দে বাঁধা। সে ভীষণ স্পর্শকাতর। কিন্তু তার আরেকটা দিকও আছে। বৈরাগ্যের দিক। জীবনে কিছু-কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস না পেয়ে পেয়ে যেমন মনোবৃত্ত্যনুসারিণী স্ত্রী, সন্তান, হয়ত আরও কিছু, এবং এই না পাওয়াটাকে মেনে নিতে নিতে সে সচেতনভাবে নিজের মধ্যে এই বৈরাগ্যকে গড়ে তুলেছে। এই বৈরাগ্য থেকে সে বহু উদাসীন প্রতিক্রিয়া আয়ত্ত করেছে। সে জানে এখন যদি ওই ক্রন্দসী শিল্পীকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে বহু যন্ত্রে এখনই বাগেশ্রী বেজে উঠবে, দুটি দেহকে নিঙড়িয়ে নিঙড়িয়ে। সে জানে মিতশ্রী কেন কাঁদছে। কতটা তার মায়ের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে আর কতটা জীবনের এই পরিপূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য যা আজ শেখরণের প্রতীকে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সেই অনুপাতটা সে শুধু জানে না।

শেখরণ্ বহু প্রয়াসে নিজেকে সংযত করে ফিরে দাঁড়াল। বলল— 'প্লীজ কালেক্ট ইয়োরসেলফ্ মিতশ্রী। কত আঘাত, কত হতাশা, আবার কত আনন্দে একটা শিল্পী তৈরি হয়! আই টু হ্যাভ গ্রোন আপ লাইক দ্যাট।' বলতে বলতে শেখরণ্ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

কে চেয়েছিল, কে চায় এই উপদেশ, সান্ত্বনা, এতো কথা! মিতুলের শরীরের ক্রোধটা যেন দাউ-দাউ করে জ্বলে তাকে পুড়িয়ে দিয়ে এবার আস্তে আস্তে নিভে যাচ্ছে। চোখের জলে নয়, শেখরণের কথায় তো নয়ই। কিসে এ আগুন নিবল তা সে জানে না। মিতুল হোটেলের মহার্ঘ শয্যার ওপর শুয়ে পড়ল সটান। সেই জর্জেট পরেই। তার শরীরে তিল্লানা নিভে গেছে, বাগেশ্রী বাজছে না। কিন্তু কিরকম একটা ঘুম আসছে, খুব গভীর ঘুম। যেন সুষুপ্তি। সে ঘুমে কোনও স্মৃতি নেই, স্বপ্ন নেই, এমনকি কারুর প্রতি কোনও নালিশ পর্যন্ত নেই।

॥ ২০ ॥

'আশাবরী' অপালার জীবনটাকে খানিকটা বদলে দিল। সে প্রচুর জলসায় ডাক পেতে লাগল, কলেজ সোশ্যাল, ক্লাব-ফাংশন। বেশির ভাগই অবশ্য সে নেয় না। কিন্তু মাঝারি ধরনের কিছু সঙ্গীত-সভায়, যেগুলো বন্ধ হলে হয়, সেখান থেকে ডাক আসলে রামেশ্বর তাকে খুব জোর করতে থাকেন। যদিও বাড়িতে সকলে খুব খুশি হন না। যেখানেই যায় দর্শকদের কাছ থেকে সেই এক অনুরোধ আসে কৌশিকী কানাড়া, কিম্বা আসাবরী। ভাটিয়ার আর বৃন্দাবনী সারং-এ রাগপ্রধান দুটির চাহিদাও খুব বেশি। অভিজাত মার্গসঙ্গীতের আসরে তার ডাক এলো বছর খানেক পরে। এখন সে ছাত্র-শেখানো কমিয়ে দিয়েছে। রামেশ্বরের সল্টলেকের বাড়িতে নিয়ম করে যায়। ইমতিয়াজ খাঁ নামক এক কুশলী তবলিয়ার কাছ থেকে বহু কূট তালের পাঠ নিচ্ছে। রামেশ্বরের বাড়িতেই।

এবার তাকে সময় দেওয়া হয়েছে মাঝরাতে। প্রথম এ ধরনের প্রোগ্রাম।

অল্প স্বল্প একটু আলাপ সেরেই সে তিলক কামোদে গান ধরে ফেলল-'ক্যায়সে জীবন রাখুঁ এরীসখী/অব তো প্রাণ রাখো না জায়। নিশিদিন হৃদয় ভরে বিরহামে/ দরশ বিনে মেরো নয়ন দুখায়।' তারপর তরানা গেয়ে ভজনে পৌঁছে গেল, 'পগ ঘুঙরু বাঁধ মীরা নাচি রে।' ভজনের বাণীর ওপর তার মনোযোগ অন্য ধরনের। অনেক মিড় অনেক টুকরা থাকা সত্ত্বেও বাণী অস্পষ্ট হয় না। 'বিষকা পিয়ালা রাণাজী ভেজা/পীবত মীরা হাসি রে', যখন সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গায় তখন অডিটোরিয়াম সিক্ত হয়ে থাকে, 'সহজ মিলে অবিনাশী রে।' শেষ চরণ গেয়ে সে আর ফিরে আসে না। সুরে সুরে সত্যিই যেন কোন অবিনাশীর মধ্যে মিশে অবিনশ্বর হয়ে যেতে চায়। এ ধরনের ভজনের স্বাদ শ্রোতারা বহুদিন পাননি। আরও ভজনের অনুরোধ আসতে থাকে। কিন্তু অপালা নম্রভাবে পরবর্তী শিল্পীর অসুবিধের কথা জানিয়ে তার প্রোগ্রাম শেষ করল। অনেক দিন আগে এই কনফারেন্সেই দীর্ঘ আলাপ এবং রাগের বাঢ়হতের জন্য গাল খেতে হয়েছিল। তার অভিজ্ঞতায় সে এখন যা বুঝেছে, তাতে করে বড় রাগগুলো প্রাণ ভরে গাওয়া যাবে শুধু মাস্টারমশাইয়ের কাছে। বা নিজের কাছে। আজ সে অল্পক্ষণ গেয়ে শ্রোতাদের মনে আরো আরো'র আশা জাগিয়ে ফিরে গেল যেন সেই কতদিন আগেকার ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে। যত শান্ত মেজাজের মানুষই হোক, জমাটি আসর পেছনে ফেলে আসার পুলকই আলাদা। 'সহজ মিলে অবিনাশীরে' পংক্তিটির ভাঁজে ভাঁজে সুরবৈচিত্র্যের রসালো টানটোনগুলো এখনো মনে মনে দিতে দিতে সে সাজঘরে ঢুকল। ঢুকতেই এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। দীর্ঘদেহী, দোহারা গড়ন, রঙ টকটকে ফর্সা। মাথায় প্রচুর অবিন্যস্ত চুল। বড় বড় উত্তেজিত পায়ে তিনি অপালার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। 'অপু !' অপালার তন্ময়তা ভেঙে যাচ্ছে। সামনে চল্লিশোত্তর দেহের ছদ্মবেশের মধ্যে থেকে উঁকি মারছে সোহম। সোহম তাকে দুই শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরল। —'অপু, অপু, কতদিন পর, কত কতদিন পর... !'

দুজনের চোখ দিয়েই জল পড়ছে। গ্রীনরুমে আরও গায়ক, বাদক, উদ্যোক্তা, দু চারটে ক্লিক ক্লিক শব্দ হল। একটু দূরে শিবনাথ এসে দাঁড়িয়েছেন। সঙ্গে টিটু। শিবনাথ দেখছেন অপালা আর সোহম ঘন আলিঙ্গনে বদ্ধ। অপালার অনতি-উচ্চ স্তনচূড়া নিষ্পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে সোহমের প্রশস্ত বুকে। তার মাথা সোহমের কাঁধে, সোহমের মাথা অপালার পিঠে। দুজনেরই চোখের জলের সঙ্গে মিশে আছে খুব মধুর হাসি। জীবনে বোধহয় আর কোনও আলিঙ্গনে অপালা এভাবে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়নি।

টিটু দেখল মা হাসছে, মা কাঁদছে। মাকে এমন মেজাজে সে আর কখনও দেখেনি। সোহম চক্রবর্তীকে সে ছবিতে বহুবার দেখেছে। তার হট ফেভারিট। তাই চিনতে অসুবিধে হল না। প্রদ্যোৎ মামু দু বছরে একবার করে আসবার চেষ্টা করে, কখনও কখনও আরও দেরি হয়ে যায়। তখন দুই ভাই বোনের আনন্দ দেখে কে। সোহম মামু মনে হচ্ছে প্রদ্যোৎ মামুর থেকেও মায়ের বেশি প্রিয়। গুরু ভাই তো। একজনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্তের। আরেক জনের সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষা-রুচির, অর্থাৎ মরমের মিল।

সোহম বলল—'আমি ইচ্ছে করে তোকে জানাইনি। এঁদেরও আমার নামটা আগে থেকে অ্যানাউন্স্ করতে বারণ করে দিয়েছি। চন্দ্রকান্তজী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় এই সুযোগটা হয়ে গেল। আজকের আসরে আমি অনেক দিন পর খেয়াল গাইব, একটু চটকদারি করব, ডোন্ট মাইন্ড। থাকছিস তো!'

অপালা বলল—'থাকবার তো কথা ছিল না। কিন্তু এখন তো থাকতেই হয়!' শিবনাথের দিকে একমুখ হাসি নিয়ে ফিরল অপালা। —'এসো। সোহম, এই আমার..'

'কর্তা!' সোহম একগাল হেসে বলল।

শিবনাথ শুকনো গলায়, শুকনো হেসে বললেন—'গ্ল্যাড টু মীট ইউ।'

—'এই আমার বড় মেয়ে সোহম, টিটু...' অপালা ততক্ষণে বলছে।

টিটুর মাথার চুলগুলো ঘেঁটে দিতে গিয়ে সোহম সামলে নিল। বলল—'ও হো, তোমরা তো আবার এসব পছন্দ করো না। তার ওপর আবার হেয়ার স্টাইল আছে!'

টিটু কিছু না বলে একটু হাসল।

শিবনাথ ঘড়ি দেখে বললেন—'দেড়টা বাজে। আমার পক্ষে আজ বসা সম্ভব হচ্ছে না। কাল ফার্স্ট আওয়ারেই প্রচুর কাজ। প্লীজ ডোন্ট মাইন্ড। টিটু তুই বরং থাক। এত রাত্রে তোকে নিয়ে মুশকিলে পড়ব। মার সঙ্গে আসিস। অপু তুমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে এখন যতখুশি আড্ডা মারো।'—বলে শিবনাথ হাসলেন—'আচ্ছা মিঃ চক্রবর্তী, আবার দেখা হবে।' তিনি তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেলেন।

সোহম বলল—'ওরা চন্দ্রকান্তজীর বদলে আমার নাম ঘোষণা করছে। এইবেলা কটা জরুরি কথা তোর সঙ্গে সেরে নিই। আমি কিন্তু সারা শীতকালটা ক্ল্যাসিক্যালের প্রোগ্রাম করব, গজল গাইতেই হলে গাইব শেষে। আমার তোর কাছে বিশেষ অনুরোধ আমরা যুগলবন্দী করব।'

—'মানে?'

—'মানে আর কি? বিসমিল্লা বিলায়েত হতে পারে, রবিশংকর-আলি আকবর হতে পারে, অপালা-সোহম হতে পারে না! তোর সাপোর্ট আমার চাই। বড় খেয়াল গাওয়ার কনফিডেন্স আমার নড়বড়ে হয়ে গেছে এখন। আচ্ছা অপু, চলি।'

মেয়ের সঙ্গে প্রথম সারির একেবারে শেষের আসনে বসে সোহমের গান কতদিন পর শুনছে অপালা। শংকরা গাইছে ও। সেই বহুদিন আগেকার মতো। সেবার শোনা হয়নি। আজ হল। সোহমের গলার স্বর কত পাল্টে গেছে। অনেক মোলয়েম হয়ে গেছে। সে সত্যি খুব সহজ হতে পারছে না। ঠুংরিতে এসে সে তার কেরামতি দেখাল। পিলুতে 'ছোড়ি মোরি বৈঁয়া' গাইল অসাধারণ, আদ্ধাতালে। তারপর হংসকিংকিণীতে ঝাঁপতালের গান 'সখী মনমোহন শ্যাম, বাঁশীয়া বজায়ী।'

শেষ হলে, উদ্যোক্তাদের একজন বলে গেলেন গ্রীনরুমে সোহম চক্রবর্তী ডাকছেন। তখন আসরের শেষ শিল্পী ললিতে সানাই ধরেছেন। পাখিদের ঠিক আড়মোড়া ভাঙার অবস্থা। টিটুর চোখ ভারী হয়ে এসেছে। সোহম

বলল—'চল্ অপু একসঙ্গে যাই। আগে তোকে নামিয়ে দোব। কাছাকাছিই তো।'

অপালা বলল—'তুই তোদের সাবেক বাড়িতেই এসে উঠেছিস ?'

'—অবশ্যই। কি ভাবিস বল তো আমাকে ? মেজদা দিল্লিতে জানিসই তো ! বড়দা জার্মানিতে সেট্‌ল কর গেল। আর ছোড়দা গন, মাচ, মাচ বিফোর হিজ টাইম। এ বাড়িটা তো এখন পুরোটাই আমি নিয়ে থাকি। বাবা বড্ড বুড়ো হয়ে গেছেন। কোনদিন টুক। অনেক দিন বম্বে, লখনৌ, লন্ডন, পারী হয়েছে। এখন আমি কলকাতাতেই গান গাইব। কিন্তু অপু একটা কথা। গাইয়েব সঙ্গে সঙ্গে আজকাল আমি দারুণ চালাক চতুর শোম্যানও হয়ে গেছি। প্রত্যেক প্রোগ্রামে তুই আমার সঙ্গে থাকছিস ! থাকছিস তো !' অপালা বলল—'প্রত্যেকটা ? আমার পক্ষে কি সম্ভব হবে ? আমি তো একটা বাড়ির বউ ! ছেলেমেয়ের মা !'

সোহম বলল—'তোর এ মেয়েটাকে তো দেখে মনে হচ্ছে বেশ ইনডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছে। দেখ অপু তোর সবচেয়ে বড় পরিচয় তুই শিল্পী। কয়েকটা কনফারেন্সে গাইলে তোর বধূত্ব, মাতৃত্ব খুব একটা ক্ষুণ্ণ হবে বলে মনে হয় না। মঘুবাই, হীরাবাই, সকলেই তো সংসার করেছেন। এমন কি নাজনীন বেগম পর্যন্ত !

অপালা বলল—'সোহম, ঠুম্‌রিতে তুই সিদ্ধ। তোর 'হমারি পিয়া যো মানত নাহি'-র ভেরিয়েশনগুলো এখনও আমার কানে বাজছে।'

সোহম বলল—'হ্যাঁ, তোরটা চুরি করে গেয়েছি।'

—'সে আবার কি ?'

—'মানে, নাজনীনের তালিম ছাড়া তো ও জিনিস গলা দিয়ে বেরোত না। এই শুনেই সিদ্ধ টিদ্ধ বলছিস। কী অদ্ভুত যে ওই মহিলার ক্ষমতা ! অদ্ভুত ধরনের ভাওবাতানো, আর মুখবিলাস, সেসব তো আমার মুখে মানাবে না ! শুনবি যখন ভুলে যাবি এ কি পুরব অঙ্গ না পছাঁও। পঞ্জাবী সুরের ছোঁয়া আছে না বিশুদ্ধ বেনারসী লচাও ঠুমরি। শুধু সুরের ইন্দ্রজালে সুরের ভাষায় তোকে নাচিয়ে, কাঁদিয়ে, আশা নিরাশার দোলায় দুলিয়ে একেবারে সব বিস্মরণ করিয়ে ছেড়ে দেবে। আর অসাধারণ ভয়েস কনট্রোল ও মডুলেশন। কখনও ফিসফিসিয়ে গাইছেন যদিও প্রত্যেকটি কন্ পর্যন্ত কানে পরিষ্কার ধরা পড়ছে, কখনও গম্ভীর নাদে, কখনও মত্ত কুরঙ্গীর মতো। শুধু দিনের পর দিন ওঁকে শোনাই একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। অপু ভীষণ মিস করলি। ভী-ষণ। আর তুই যেটা মিস করলি, আমি সেটা পেলুম, অথচ পুরোপুরি নিতে পারলুম না। কোনদিনই এ কথা আমি ভুলতে পারব না।'

অপালা বলল—বাজে বকিস না সোহম। আমার ভাগ্যে ছিল না, আমি পাইনি। কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের একজন শিষ্য তো অন্তত সুযোগটা পেয়েছে। এটাই আমাদের সান্ত্বনা !

—'কী জানি আমার মধ্যে সব সময়ে একটা অপরাধ বোধ কাজ করে যায় অপু। আমি ভুলতে পারি না।'

তাদের বাড়ি এসে গিয়েছিল। অপালা নামছে। সোহমের হাতে তার

তানপুরো। টিটু দরজার বেল বাজালো। 'তোর আসাবরী'র ডুয়েটটা থেকে আমাদের ডুয়েট-এর কথাটা আমার মনে এসেছে। শেষের দিকে ওই ঝালা-টাইপ পরিকল্পনাটা কার ?'

—'অবশ্যই মাস্টারমশায়ের।'

—'ওই আরেক ভাগ্যহত ভদ্রলোক। সত্যিকার প্রতিভাবান। জীবনের বেশির ভাগটাই তরোয়াল দিয়ে ঘাস কেটে গেলেন। তুই গেয়েছিস যা একেবারে সুরের সমুদ্রে নুনের পুঁটলির মতো ডুবিয়ে দিয়েছিস অপালা। 'সব সখী আনমিল মঙ্গল গাও/ সদারঙ্গে জগত দুলারে ॥ সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে বাংলা করে যাওয়ার পরিকল্পনাটাও খুব চমৎকার হয়েছে।'

—'আমারটা ভালো বললি, মিতুলের কথা বলছিস না যে।'

—'মিতুল তো তোকে জাস্ট সাপোর্ট করে গেছে। খারাপ করেনি, ও যে এই রকমটা দাঁড়াবে আমি ভাই বুঝতে পারিনি। গিধড়ের মতো গলা ছিল। এনিওয়ে, ফোন করবো।'

সোহমের গাড়ি গলির মোড়ে বাঁক ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সোহম আর অপুর বাড়ি দেখতে পাচ্ছে না। অপুর জন্য বিদেশ থেকে এবং দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সে বহু জিনিস উপহার এনেছে। শাড়ি, গন্ধ দ্রব্য, দুস্প্রাপ্য বন্দিশ, শ্যামপু, ইলেকট্রনিক নানা রকম জিনিস। কিভাবে সেগুলো দেবে তাই ভাবছে। যতই তার জীবন এগিয়েছে সোহম ততই একেবারে স্থিরনিশ্চিত হয়ে গেছে যে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে লখনৌ-এর অভিজ্ঞতা ও তালিম। এবং তার পেছনে অপুর সেই করুণ পিছিয়ে-যাওয়া, ভবিতব্যের হাতে অসহায় আত্মসমর্পণ। তার চেয়েও বড় কথা ওই তালিমের জন্য সে সময়মতো কেন কোনদিন উপস্থিত হতে পারত না যদি না অপু তাকে তার হিংস্র উন্মাদ অবস্থা থেকে সারিয়ে তুলত। সে জানে, অপু তখন ওইটুকু মেয়ে হয়েও ঠিক বুঝেছিল কোথায় তার ব্যথা,কিসে তার যথার্থ প্রলেপ। তার অনেক ভাগ্য সে কোনও নামী সাইকিয়াট্রিস্টের হাতে পড়েনি। সে অপুর চেষ্টায় একটু ভালো হয়ে না উঠলে বাবা তাকে ওইসব মনস্তত্ত্ববিদদের কাছে নিশ্চয়ই নিয়ে যেতেন, কড়া ওষুধ খেয়ে, ইলেকট্রিক শক খেয়ে সে আজ একটা জীবন্মৃত জরদ্‌গবে পরিণত হত। বিয়ের ক'দিন আগে, ওই রকম রক্ষণশীল পরিবারের সমস্ত আপত্তি উপেক্ষা করে তার মতো উন্মাদের কাছে অপু এসেছিল নির্ভয়ে, গেয়েছিল অসীম প্রত্যয়ে সেই গান যা অমৃতধারার মতো তাকে নতুন জীবন দিয়েছে। এই সাহস অপু কোথা থেকে পেলো ? নিজের ব্যাপারে তো পায়নি। সেখানে মেনে নিয়েছে দিনগত পাপক্ষয়ের ভবিতব্য। অথচ তার বেলাতেই অপু আর ভয় করল না, কারো নিষেধ শুনল না, জেঠুর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করল। দীপালির জীবনটাকেও তো অপুই সাজিয়ে দিল। তার ভাগ্যে সইল না। কিন্তু দীপালির দিদিটি তো পরম সুখে আছে। এই যে 'আশাবরী'র সাফল্য এ-ও কি অপু ছাড়া হত। অপুকে সে কখনও আলাদা করে মেয়ে বলে দেখেনি। অপু তার সবচেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। এটা হচ্ছে অপু মানুষটার কথা। কিন্তু অপুর গান তাকে বরাবর কিরকম অন্যভাবে নাড়িয়ে দেয়, যেন অপুর সুরের সঙ্গে সুরসংযোগ করতে না পারলে সে

চিরবিরহী থেকে যাবে। তার জীবনের লখনৌ-পর্ব থেকে আরম্ভ করে প্রচুর নারী এসেছে। তার জীবনের প্রথম প্রেম ছিল মিতুল। কিন্তু সেই বিশ্রী ঘটনার পর থেকেই মিতুলের প্রতি সে বীতরাগ। মিতুল বা মিতশ্রী দারুণ পাবলিসিটি পায়। দেখতে অতীব সুন্দর। এবং নিজেকে, নিজের গানকে পেশ করার সর্বাধুনিক সমস্ত কায়দা নাড়ি-নক্ষত্র মিতুল জানে বলে তার ধারণা হয়েছে 'আশাবরী' দেখে। মিতুলের কোনদিন গান হবে সে ভাবেনি। দীপালির কথা, অর্থাৎ দিলীপ সিনহার কাছে সে সেতার শিখছে এ কথা সে বিশ্বাস করে নিয়েছিল। সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক সমস্ত কথাও। এখন দেখা যাচ্ছে দীপালি সঠিক অনুমান করতে পারেনি, কিম্বা ঘটনার মোড় ঘুরে গেছে। মাস্টারমশাই তাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন—'মিতুলের গান কিরকম শুনছো?' মাস্টারমশাই যে সমস্ত পূর্ব ইতিহাসের মুখে তুড়ি মেরে এ কথা তাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, তা সে ভাবেনি। কিন্তু মাস্টারমশাই সব সময়েই সব অনুমানকে, সব প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে যান। সে বলল—'ওর একটা অদ্ভুত গলা তৈরি হয়েছে, একটু ওয়েস্টার্ন ধবনের। ওই গলায় ক্ল্যাসিক্যাল গাইলে একটা পিকিউলিয়ার এফেক্ট হয়, যেন গিটারে এদেশী মার্গসঙ্গীত বাজছে। তবে গিটারের চেয়েও ওর গলাটা অনেক খসখসে।' মাস্টারমশাইয়ের দাড়ি-ভরা মুখে একটা সরল হাসি—'ও আমার একটা চ্যালেঞ্জ ছিল সোহম। সুর তো ছিলই। খালি গলাটাই ছিল নীরস। ওকে বহু খাটিয়েছি। নিজেও খেটেছি।'

—'যন্ত্রের দিকে দিচ্ছিলেন শুনেছিলাম।'

—'কই না! তবে কি জানো, বাজিয়েকেও যেমন কণ্ঠসঙ্গীত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়, গাইয়েকেও তেমনি একটু আধটু যন্ত্র ধরতে হয় সোহম। নইলে পূর্ণতা আসে না। আদিতে তো দুটোর কোনও তফাত নেই। একটায় সুর নিজের গলায় তুলছ, আরেকটায় তুলছ আঙুলের টিপে। শুনেছি ওস্তাদ কালে খাঁ সাহেব অসম্ভব সব লরজ্‌দার তান করতে পারতেন গলায়, যা নাকি তিনি বীণ থেকে তুলেছিলেন।...তবে মিতুল তো পুরোপুরি উচ্চাঙ্গের দিকে গেল না। গেলে আরো উন্নতি করতে পারতো।'

মাস্টারমশাইয়ের সল্ট লেকে বাড়ির চারপাশে চোখ বুলিয়ে সোহম ভাবল—না—উচ্চাঙ্গে পুরোপুরি গেলে মিতুল এ ধরনের উন্নতি করতে পারত না। এই ছবির মতো বাড়ি। পুরোটা যেন তেলরঙে আঁকা মনে হয়। দুখানা গাড়ি। আয়নামোড়া গান ঘর। মাস্টারমশায়ের বৃদ্ধ বয়সের জন্য এতো আরাম।

মিতুল এখন শেখরণ আয়ারের সঙ্গে ফ্রান্সে গেছে। সে নাকি ওর ট্রুপে নাচও করেছে। ছ'মাস ইন্টেনসিভ নাচের তালিম নিয়েছে। যতই পরিশ্রম করুক ছ' মাসের তালিমে নাচ হয়? সোহম জানে না। সবটাই নির্ভর করছে শেখরণ আয়ার ওকে তার নাট্যনৃত্যে কী ভাবে ব্যবহার করছে তার ওপর। হঠাৎ তার স্মৃতিতে একটা খসখসে গলা আবদেরে সুরে বলে উঠল—'সোহমদা আলারিপু দেখবে? আলারিপু? দেখো কেমন পারি?' 'সেলামী আর তৎকার দেখো। সব মিতালিদির ক্লাসে বসে বসে তুলে নিয়েছি।' এখন মাস্টারমশাই বাড়িতে একলা। কিন্তু ড্রাইভার, দাস-দাসী সব রয়েছে। অপালা সপ্তাহে তিন

দিন আসে। ফোনেও সর্বদা যোগাযোগ রাখে। এখন সোহম এসে পড়ল, মাস্টারমশায়ের যেটুকু অসুবিধে ছিল, তাও আর রইল না। উনি বার বার করে সোহমকে ওঁর কাছে ক'দিন এসে থাকতে অনুরোধ জানিয়েছেন। নানা রকম যন্ত্র ওঁর চারপাশে, যখন যেটা খুশি বাজান। নিজেই বলেন—'একাকিত্ব আমার নেই। মিতুল থাকলেও তো তাকে খুব একটা পেতুম না! শিল্পীর জীবনে নিঃসঙ্গতা তার শিল্পিত্বের কেন্দ্রবিন্দু। সে জন্য নয়। কিন্তু সোহম তুমি এলে, আমার কাছে থাকলে গান আমার আরও কাছে থাকবে।'

সোহম বলেছিল—'আমি তো রইলামই। অন্য কাজ না থাকলে আপনার কাছে এসে বসে থাকব। অপু আর আমি এখানে এসে রেওয়াজ করব। সারাক্ষণ না-ই থাকলাম।'

আসল কথা—মিতুলের বাড়িতে থাকতে তার সঙ্কোচ হয়। বাড়ির কোণে কোণে ঠিক সুন্দর, মহার্ঘ শিল্পবস্তুর মতোই সাজানো আছে মিতুলের বিভিন্ন ভঙ্গির, বিভিন্ন মেজাজের ছবি। মেয়েটার নার্সিসিজম্ আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এতেও সন্দেহ নেই মিতুল নিজেকে এক অদ্ভুত ভাস্কর্যে পরিণত করেছে। ছবিগুলোর প্রত্যেকটাতে কপালের কাছে আর থুতনির কাছে ছোট্ট দুটো দাগ। এসব ছবি সোহমকে তীব্র বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে বলে—'ইতর! চেয়েছিলে আমার রূপ নষ্ট করে দিতে কিম্বা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে, সামান্য স্থূল ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে! পারলে? পেরেছো? আমার বাবা-মার চরিত্র নিয়ে কুৎসিত কথা বলেছিলে যখন আমি নিষ্পাপ কিশোরী! লজ্জা করে না! আমি সো-কলড় চরিত্রকে, পিতৃপরিচয়কে, মাতৃপরিচয়কে থোড়াই কেয়ার করি। আমি নিজেই নিজের পরিচয়। তোমাকেও থোড়াই কেয়ার করি। চকলেট, লজেন্স আর মন ভোলানো বাহারি জিনিস দিয়ে মনে করেছিলে দরিদ্র সঙ্গীতশিক্ষকের মেয়েকে কিনে নেবে। তার চেয়ে অনেকগুণ দামী জিনিস আমি আজ তোমার মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলতে পারি।' এ সবই হয়ত তার কল্পনা। সে সব ঘটনার পর গঙ্গা দিয়ে কত জল গড়িয়ে গেছে। কিন্তু সেই তো মিতুলের সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাৎ। রাগী মুখ, হাতে ছুরি, মুখে কুৎসিত ভাষা। মাঝখানে রয়েছে লখনৌ, বম্বে, দিল্লি, আমেরিকা, ব্রিটেন। তবে মিতুলকে তার খুব দরকার। মিতুলকে তার খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেবার আছে।

নৈশ কলকাতার রাস্তা দিয়ে তার গাড়ি যাচ্ছে। সোহমের কানে এখনও অপালার তিলক কামোদের রেশ। এখন তার মনে পড়ছে না আমেরিক্যান বান্ধবী ক্ল্যারিসের কথা, বা স্কটল্যান্ড প্রবাসী বৃন্দা আগরওয়ালের কথা। বম্বের লছমী প্যাটেল, কিম্বা বারাণসীর তিহ্‌রবাঈ যার কাছে নাজনীন স্বয়ং তাকে অনেক সাবধানবাণী শুনিয়ে পাঠিয়েছিলেন তারাও চলে গেছে স্মৃতির কোন লুকোনো খাঁজে।

বাষট্টি বছরের নাজনীন সর্বদা সাদা সিল্ক পরতেন। বসরাই গোলাপের রং ফুটে বেরোত শাড়ির মধ্য দিয়ে। নাকে হীরের নাকছাবি। দুই কানে হীরে, আঙুলে হীরে, হাতে একগাছা হীরের চুড়ি। যখন গান শোনাতেন, মনে হত যে অল্প সংখ্যক শ্রোতা রয়েছে, তাদের প্রত্যেককে তিনি আলাদা করে

শোনাচ্ছেন তাঁর মিনতি, তাঁর আকুতি, অভিমান। বিরহের কী তীব্র মধুর ব্যথা, অভিমানের করুণ সুদূরতা, মিলনের জন্য আকুল পিপাসা,অথচ তীব্র মান, এ সবই তিনি ফোটাতেন সম্পূর্ণ পরিবেশ বিস্মৃত হয়ে। শেখানোর সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের এই মূল মন্ত্রটা সম্পর্কে অবহিত করতেন নাজনীন। বলতেন : ঠুমরী বিশুদ্ধ প্রেমের সঙ্গীত। ভগবৎ প্রেম হলেই তা ভজন হয়ে যাবে। এ কিষণ একজন মানুষ কিষণ, এ রাধা একজন মানুষী রাধা—এ পিয়ামিলন কী আশ একজন গভীরভাবে প্রণয়কাতর মানুষের সঙ্গে আরেক গভীরভাবে প্রণয়ব্যাকুল মানুষের মিশতে চাওয়া—তন মন ধন সব উন পর বারুঁ। এই প্রণয়ী যদি শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরও হন, তাহলেও আগে মানুষকে দিয়ে শুরু করতে হবে।' বলে একটু হাসতেন। বলতেন—'ঠুমরি বড় বিপজ্জনক গান' সোজা সামনের দেয়াল কিম্বা জানলার বাইরে দৃশ্যমান নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি গাইতেন। যেন ওই নীল তাঁর জমাট বিরহ। ঠুমরি পেশ করবাব ঢঙটিও ছিল তাঁর অপূর্ব। মুখের পেশীতে চোখের কটাক্ষে, চোখের পাতার আনতিতে, হাতের ছোটখাটো মুদ্রায় ফুটে উঠত ভাব। কিন্তু একটা অদ্ভুত সংযম রক্ষা করে চলতেন। তাদের বার বার সাবধান করে দিতেন ছেলেরা আর মেয়েরা ঠুমরী গাইবে আলাদা স্টাইলে। সেই স্টাইলের তফাতও তিনি দেখিয়ে দিতেন। পুরুষালি ঢং-এর পুকার আর মেয়েলি ঢঙের নখরা। গলার ভঙ্গি এমন কি আওয়াজও পাল্টে ফেলতে পারতেন। এই অসামান্য প্রতিভাময়ী রমণী প্রকাশ্য আসর থেকে বিদায় নিলেন, ভারত একটা অমূল্যরত্ন হারালো। শুধু গুটিকয় শিষ্য-শিষ্যা আর কিছু কিছু গুণীর শোনবার সৌভাগ্য হল। সেখানেই সোহম ভারতের তাবৎ গুণীর সঙ্গীত শুনেছে। নাজনীন তার মৌলিকত্ব উসকে দিয়েছেন। শিখতে শিখতেই তার মনে হত ঠুমরিও প্রেমের গান, গজলও তাই। কিন্তু গজলের মধ্যে যেন দিওয়ানা অথচ পুরুষালি ভাবটা আরও চমৎকার ফোটে। সে গজল গাইতে লাগল, ঠুমরির নানান অঙ্গ মিশিয়ে, কিছু ছুট তান, কিছু ফিরৎ, সামান্য হলক তা-ও মেশাতে লাগল, গজলের বাণী বুঝে। নাজনীন অভিভূত হয়ে বললেন--'শাবাশ বেটা, তুম তো বাওরে কী তরহ্ গা রহে হো। তুম্হারে দিল কী দর্দ সবকে দিলমে পহুঁচ যাতা হ্যায়।'

তখন সোহম তার ইচ্ছের কথা বলল।

নাজনীন বললেন, —'বাগিচে মে গানেওয়ালা বুলবুল ভি মর্দ হি হ্যায়। মগর তুমহারা দিল জো চাহে সো করো।'

লখনৌ, দিল্লি, বম্বে সে গজলে মাতিয়ে দিয়েছে। ক্যাসেট, রেকর্ড বেরিয়েছে অজস্র, ফিলমে গেয়েছে। তারপর বিদেশ চলে গেছে। সেখানে এশীয় সমাজে তার, তার গানের কী আদর! কিন্তু অপালার সমকক্ষ গায়িকা সে আর কোথাও পায়নি। কল্পনা করা যায়! নাজনীনের তালিমে অপালা একটা কী দুর্দান্ত গায়িকা হয়ে উঠতে পারত!

অপালার ভঙ্গিটা শান্ত। গানে গভীরতা বেশি, চমক কম। চমক যখন থাকেও, এত অবলীলায়, এত বিনা আড়ম্বরে সে ব্যাপারগুলো করে যে মধ্যম শ্রোতার খেয়াল এড়িয়ে যায়। পেশ করার একটা ভঙ্গি আছে। খুব যে নাচতে কুঁদতে হবে তা নয়। কিন্তু মুখের ভঙ্গিতে, হাতের সঞ্চালনে, অন্যান্য সঙ্গতিয়া

বিশেষ করে তবলচির সঙ্গে তানের খেলায়, লয়কারিতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে হবে। অপালা এমন কি দীর্ঘ তান সেরে সমে পৌঁছেও তবলচির দিকে একটি সহাস্য কটাক্ষে দেয় না, মাথা প্রায় নাড়েই না, এমন স্থিরভাবে যে গাওয়া কি করে সম্ভব সেটা সোহম বুঝতেই পারে না। যাই হোক, পেশকারিটা নাজনীন ওকে শিখিয়ে দিতে পারতেন, নাজনীনের কাছে তালিম নিতে নিতে জিনিসগুলো আপনিই এসে যেত। আর আসলে এই কারণেই অপালার 'আশাবরী'র রেকর্ডগুলো অত পপুলার হয়েছে। অভিজ্ঞ অভিনেত্রী সেলিমা গানগুলো পেশ করেছেন পাকা গাইয়ের মতো। সুর টেনে ধরে রাখবার সময়ে হাতকে উদাত্তভাবে প্রসারিত করে দিয়েছেন সামনে। আলঙ্কারিক তানগুলোর সময়ে তাঁর সুন্দর আঙুলগুলি খেলা করেছে। মুখের সামান্য ভঙ্গিতে মূর্ত করে তুলেছেন গানের ভেতরকার মেজাজ। ফলে রেকর্ডগুলো বাজবার সময়ে স্মৃতিতে এসে যায় ওগুলো। সোহমের মতো যারা নিজেরাই গায়ক, তারা সে স্মৃতি ছাড়াও অপালার গানকে এ প্রজন্মের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে চিনতে পাবে। 'আশাবরী'র ক্যাসেটগুলো শোনবার পর তার মনে পড়ে গেছে সেই দীর্ঘ দরবারী কানাড়ার রাতগুলো, যখন নিজের মৃত্যু, বিয়েটা তো অপালা মৃত্যুব মতোই নিয়েছিল, সেই মৃত্যু সামনে নিয়ে অপালা তার রোগশয্যার পাশে সবুজ কার্পেটের ওপরে কখনও তানপুরো কখনও হারমোনিয়াম নিয়ে 'ঘুংঘট কী পট খোল রে' বলে তার আর্তি জানাত। ওষুধের নেশায় তখন সে আধা আচ্ছন্ন। তার চেতনার ওপর থেকে উঠে গেছে শিক্ষা-দীক্ষার সভ্যতার সব কৃত্রিম আবরণ। সেই নগ্ন চেতনার দুয়ারে গিয়ে ধাক্কা দিত দরবারীর বক্র কোমল গান্ধার। শুদ্ধ মধ্যম, পঞ্চম পার হয়ে অতি কোমল ধৈবতে আন্দোলিত হয়ে কোমল নিখাদ পার হয়ে মুদারার ষড়জে এসে ন্যস্ত হত স্বর। কতক্ষণ! কতক্ষণ। অপালার আলাপাঙ্গ চিরদিনই অসম্ভব পরিণত। শুধু যন্ত্রের ভঙ্গিতে আলাপ, মধ্য লয়ের আলাপ, পরপর দ্রুত লয়ের কাজ করে ঝালার মতো সে যে কোনও গান অতিশয় তৃপ্তি দিয়ে শেষ করতে পারে। পাছে তীব্র স্বরে তার নার্ভের কোনও অসুস্থ জায়গা স্পর্শ করে তাই সে মুদারার ওপর আর উঠত না। তার সেই মৃদু ঝনঝনে তান, তরানা, গমগমে মন্দ্র সপ্তকের আলাপ আর ঋষভে এসে দাঁড়ানো এসব তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে সঞ্চিত আছে চিরকালের মতো। বার্লে অ্যাভেন্যুর কিংবা অ্যাশফোর্ড মিডোর ফ্ল্যাটে সারাদিনের গান আর অক্লান্ত মেলামেশার পর যখন সে খানিকটা উত্তেজনা খানিকটা অবসাদে মুহ্যমান হয়ে বিছানার ওপর সটান শুয়ে পড়ত, ঘুম আসতো ঝুপ ঝুপ করে বাদুড়ের গাছে নামার মতো তখন ভেতরে কে মন্দ্র পঞ্চম ছুঁয়ে কোমল ধৈবতে উঠে যেত কেমন যেন মনে হত স্বপ্নের মধ্যে অ্যাপার্টমেন্ট তার ঢাকনাটা খুলে যাচ্ছে, বেরিয়ে পড়ছে আকাশ, তারপর সেই আকাশের নীল স্তব্ধ যবনিকা তাও ঘোমটার মতো খুলে গেল, তার ওপারে সে কি কোনও রহস্যময় মুখ, ক্লেশবারণ, তাপহরণ, সে কি কোনও অপার্থিব দৃশ্য। ভালো করে দেখবার, বোঝবার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়ত। তার জীবনে যদি থিম মিউজিক বলে কিছু থাকে তা হল দরবারী কানাড়া। অপালার দরবারী তাকে নতুন জীবন দিয়েছে।

প্রচুর টাকা আসছে। বড় বউ-এর মাধ্যমে প্রচুর টাকা। বেণী নন্দনের বাড়ি পনের বছর পর আগাপাশতলা সারাই হচ্ছে। এতদিন হয়েছে খালি তালি মারা। ভেতরে চুনকাম। বাইরে এলা। টাকার অভাবে যতটা না, তার চেয়েও দৃষ্টির অভাবে। এ গলির প্রতি বাড়িই একই রকম ছ্যাতলা পড়া, নড়বড়ে, থেকে থেকেই ডাঁই করা আবর্জনার স্তূপ। কাজেই দরকার কী ? আর বাড়ি তো মনোহর সঙ্গে নিয়ে যাবেন না। তিনি বললেন—'তোরা দু ভাই দুজনের থাকবার মতো করে নে বাড়িটা।' অপালা শিবনাথকে বলল—'আমার নীচের গানঘরটা খুব সুন্দর করে দিও। প্লাস্টার উঠিয়ে। দেবে তো ?'

শিবনাথ বলল—'অবশ্যই।' কিন্তু নীচের ঘরের একটা মুশকিল, বড্ড নোনা ধরে। মিস্ত্রি বলছে ইঁটের দোষ। আসলে এ বাড়ি বেড়েছে আস্তে আস্তে। যেমন যেমন সংসার বেড়েছে। বাড়িটার বাড় বদ্ধ জায়গায় একটা গাছের মতো। যেখানে ফাঁকা পেয়েছে, শাখা প্রশাখা বাড়িয়ে দিয়েছে। ছোটদের খুব মজা। তাদের হুটোপাটি করার, লুকোচুরি খেলার প্রচুর আনাচ কানাচ। কিন্তু এখন ওবাই নাক সেঁটকায়। সিলিঙের দিকে তাকালে বিচ্ছিরি লাগে। পরপর সব কাঠের, লোহার কড়ি, বরগা, বিচ্ছিরি হান্ডা-অলা ডি সি ফ্যান ঝুলছে। বড় ছেলের এসব মনে হত না। তার ছেলেবেলাকার স্মৃতিঘেরা ওই নিম গাছ, ওই উঠোন, লাল সিমেন্টের চকচকে মেঝের ঘর, পেছনের জমিতে নয়নতারার ঝোপ, গন্ধরাজ লেবুর গাছ, এসবের সঙ্গ তার বরাবর ভালো লাগে। অপালা উদাসীন। তার একটা নিভৃত গান করার জায়গা হলেই হল। রণো বরাবর দাদুর ঘরে শুতো, ইদানীং সে নিজস্ব ঘর দাবি করছে। টিটু বনি ঠাকুরমার সঙ্গে শোয়। তাদেরও মনোগত ইচ্ছে তাদের নিজস্ব একটা ঘর হোক। এ বাড়িতে এসে প্রথম নাক সিঁটকোলো ছোট বউ জয়া। সে বারে বারেই বিশুকে বলত নেহাত বিশুর কেরিয়ার আর চাকরিটা খুব ভালো তাই এ সংসারে সে এসেছে। নইলে এখানে কি থাকা যায় ? বিশুর ভাগে দুখানা ঘর। সে আর্কিটেক্ট। ছোট ঘরখানায় তার নানারকম কাগজপত্র, যন্ত্রপাতি থাকে। বাড়ি আগাগোড়া সারানোর কথায় বিশু বলল—'আফটার অল আমার তো কোনও ইস্যু নেই। এ বাড়ির ভবিষ্যতে আমার দায় কী ?'

তার কথা শুনে তার বাবা অবাক হয়ে বললেন—'দায় নেই মানে ? এ বাড়ির অর্ধাংশ তো তোমারও প্রাপ্য ! অংশ থাকলে দায়ও থাকে।'

বিশু বলল—'ভবিষ্যৎ দাদার। দাদাই সামলাক। আমার দ্বারা ভস্মে ঘি ঢালা হবে না।'

বিশুর মা হঠাৎ বলে উঠলেন—'ও তো একরকম ঠিকই বলেছে বাপু। ঘর দোর তো সব শেষ অব্দি শিবুরই দাঁড়াচ্ছে। এক কাজ কর বিশু, নিজের ঘরদুটো সারানোর খরচটুকু হিসেব করে ফেলে দে। কী বলো বউমা ?'

অপালা জয়া উভয়েই উপস্থিত ছিলো, বউমা বলে তিনি কাকে সম্বোধন করলেন বোঝা গেল না। জয়া গুরুজনদের সামনে বড় একটা মুখ খোলে না। মুখে সব সময়ে একটা আলগা হাসি থাকে। শিবনাথ বললেন—'এই

এতো বড় বাড়ি, আজকালকার দিনে এর সারানোর খরচ তো সাংঘাতিক। সেই সমস্তটা আমি একা!'

শিবনাথের মা নরম গলায় বললেন—'তুই তো আর একহাতে রোজগার করছিস না শিবু। তোর চারখানা হাত। আমার অমন লক্ষ্মীমন্ত বউমা থাকতে তোর ভাবনা কি?'

শিবনাথের মাথা এইবার নিচু হয়ে গেল। মধ্যবিত্ত, রক্ষণশীল, পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজের কতকগুলো মূল্যবোধ থাকে। মেয়েদের, বিশেষ করে বউদের উপার্জনের টাকা ব্যবহার করতে তাদের বরাবরই মাথা কাটা যায়। শিবনাথ সেই শ্রেণীর। এমনিতেই আজকাল তাঁর অপালার কাছে একটা হীনম্মন্যতা জেগেছে, একটা অপরাধবোধও। তার ওপর সে জানে অপালা তার উপার্জনের একটা অংশ প্রথম থেকে শাশুড়ির হাতে তুলে দিয়ে এসেছে। শুধুমাত্র তাঁর নিজের হাতখরচের জন্য। তা ছাড়াও অপালা দু হাতে দেয়। দিতে বড্ড ভালোবাসে। শিবনাথের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠছে। অপালা কিছুই বলছে না। সে রান্না ঘর থেকে এক গোছা রুটি এনে প্রত্যেকের পাতে দিয়ে চলে গেল।

ঘরে এসে শিবনাথ ক্ষোভে ফেটে পড়লেন—'অপু, মা কী করে বললেন, বিশু কী করে বলল— এতো বড় বাড়ি সাবাবার দায়িত্ব একা আমার?'

টিটু ছিল কোথাও, সে বলে উঠল—'তোমার একার হবে কেন বাবা, মারও। মা যে কত স্বাধীনতা পাচ্ছে। মার যে এখন দেশজোড়া নাম। শ্বশুরবাড়ি অ্যালাউ করেছে বলেই না এতো সব হতে পারল? কিছুদিন আগে পর্যন্তও তো শুধু শাঁখের ফুঁ-এর ওপর দিয়ে অপালা দত্তগুপ্তর দমের পরীক্ষা আর প্র্যাকটিস হচ্ছিল। তা এসবের দাম দিতে হবে না?'

অন্য সময় হলে শিবনাথ মৃদু ধমক দিয়ে উঠতেন। আজ তাঁর লজ্জা এবং দুঃখ এতো গভীর যে তিনি কিচ্ছু বলতে পারলেন না। টিটু বলল—'সেদিন মনিরুল মিস্ত্রির কাছে দাদু এসটিমেট নিচ্ছিল। ডিসটেম্পার, কোথায় কোথায় যেন মোজেইক হবে। বাইরে স্নো-সেম দেওয়া হবে, ছাতের ওপর ঘর। এতো সব করতে হলে... বরং এক কাজ করো তোমরা মাকে বিক্রি করে দাও, নীলামে তোলো, এখন বাজার দর খুব বেশি...'

অপালা বলল—'টিটু, চুপ কর।'

টিটু বলল— 'ওসব কিচ্ছু করতে হবে না। আমাদের কিছু চাই না। বনির শিগগির বিয়ে হয়ে যাবে, আমি তো বরাবর গভমেন্ট কোয়ার্টার্সে থাকব। পশ্চিমবঙ্গে পোস্টিংই নেবো না। আর দাদা এ বাড়ির আদরের ছেলে, যথেষ্ট বোঝবার বয়স হয়েছে, সে সময় হলে বুঝে নেবে, এখন শুধু ছাতের ঘরটা করে দাও মোটামুটি, আর নীচে মায়ের গানের ঘরটা, অত বড় বড় লোক আসে, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়।'

এই সময়ে বাইরে বিশুর গলা পাওয়া গেল—'দাদা!'

—'বলো', চিন্তিত মুখে শিবনাথ বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

বিশু বলল—'মোটামুটি হিসেব করে দেখলুম, আমার ঘরদুটো সারাতে হাজার তিনেকের মতো পড়বে। আমি কালই দিয়ে দেবো।'

শিবনাথ বললেন—'হাজার তিনেক টাকা তোমাকে দিতে হবে না বিশু।'

—'অ্যাজ ইউ প্লীজ'—বিশ্বনাথ চলে গেল। এবং এর পরই দুইভাইয়ের মধ্যেকার চিড়টা যেটা বাইরের লোকে চট করে ধবতে পারত না, সেটা প্রকট হয়ে উঠল।

অপালা বলল—'বাবার অনেক দিনের শখ ডিসটেম্পারের। করিয়ে দাও। দালানের মেঝে ভেঙেচুরে গেছে, ওটারও ব্যবস্থা করো, রান্নাঘর সেই সাবেক কালের। বড় কষ্ট হয় মার। ওটাকে মিস্ত্রির সঙ্গে কথা বলে ভালো কবে আধুনিক করে দাও। ছাতে তো একটা ঘর তুলতেই হবে রণোর জন্যে। এর জন্য তুমি যা না পারবে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে নিশ্চয়ই নেবে। আমি খালি ভাবছি টিটু-বনির একটা আলাদা ঘর হলে বড্ড ভালো হত।'

শিবনাথ শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। দুই মেয়ের বিয়ে আছে। ছেলেকে দাঁড় করাতে বেগ পেতে হবে। অপালার আয় অনিয়মিত। আজ হঠাৎ টাকা আসছে বলেই যে চিরকাল আসবে তার কোনও মানে নেই! অপালা তো মিতুলের মতো উদ্যোগী, করিৎকর্মা ধরনের মেয়ে নয়!

অপালা বলল 'এক কাজ করতে পারো নীচের ঘবটা তো যথেষ্ট বড়। ওটাকে দুভাগ করে, একদিকে আমার গানেব ঘর, আর একদিকে টিটু-বনিব ঘব হোক।'

শিবনাথ গম্ভীর মুখে বললেন—'তা হয় না অপু। দুটো মেয়েকে আমি প্রাণ গেলেও নীচে নির্বাসিত করতে পারব না।'

অপালা বলল—'কেন, ওরা যেবকম ঠাম্মাব কাছে শুচ্ছে শুক না। নীচে খালি ওদের নিজস্ব একটা আস্তানা থাকবে, যেখানে ওরা পড়াশোনা করবে, বন্ধুবান্ধব এলে গল্প-সল্প করবে।' অপালার আসলে মনে পড়ছিল তাদের সেই কীর্তি মিত্র লেনের চিলেকোঠার ঘরখানা। যেখানে সে গান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ত। মা তুলে নিয়ে যেতেন। মায়ের কাছে অনেক প্রার্থনা কবেও নিজের জন্য একটা ঘরের অধিকার পাওয়া যায়নি।

অথচ জেঠু দুখানা ঘর নিয়ে থাকতেন। বড় বড় ঘর। অনায়াসেই তার একটা দাদাকে দিয়ে, তাকে চিলেকোঠার ঘরটা দেওয়া যেতো। এখন তার বাপের বাড়িতে কতগুলো ঘর, খাঁ খাঁ করছে, থাকবার লোক নেই। যাদের যে সময়ে দরকার ছিল তারা পায়নি, ঘাড় গুঁজে কোনমতে বড় হয়েছে, তাদের সেই নিঃশব্দ অভিমান বোধহয় কীর্তি মিত্রর বাড়ির নির্জনতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

টিটু বলল—'নীচের ঘরটা ছোট হয়ে গেলে, তোমার কাছে বেশি লোকজন এসে গেলে তো খুব অসুবিধে হবে মা!'

বনি বলল—'তা কেন? মিতুল মাসির ঘরের মতো একটা পার্টিশন থাকবে, দরকারমতো সেটাকে গুটিয়ে রাখা যাবে!'

টিটু একটু তিক্ত হেসে বলল—'ওহ্ বনি, মিতুল মাসির মতো!'

সিনেমা-পত্রিকাটার একটা পাতা উল্টে জয়া বলল—'একটা ভীষণ মজার জিনিস দেখাবো তোমাকে, আন্দাজ করো তো!'

বিশু নিজের কাজে মগ্ন ছিল, বলল—'গেস-ফেস আমার আসে না, দেখাতে ইচ্ছে হয় দেখাও।' সাম্প্রতিক বাড়ি সারাইয়ের ব্যাপারটা নিয়ে সে একটা বিবেকের দ্বন্দ্বে ভুগছে। অন্যায় করছে বুঝতে পারছে, কিন্তু যে বাড়ির অধিকাংশই তার মা-বাবা দাদা-বউদি ও তাদের ছেলে-মেয়েরা ব্যবহার করছে সে বাড়ির সারাইয়ে আধাআধি অংশ দিতে তার হিসেবী মন কিছুতেই রাজি নয়।

টেবিলের ওপর একটা পত্রিকার পাতা খুলে রাখল জয়া, মস্ত একটা ব্লো-আপ। একজন নারী আর একজন পুরুষ দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ। চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ফোঁটাগুলো শুদ্ধু উঠেছে। তলায় ক্যাপশন—'কতদিন পরে এলে!' বিস্তৃত বিবরণ। দুই গুরু ভাই-ভগিনীর কীভাবে বছর কুড়ি বাদে বিখ্যাত কনফারেন্সে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। সেখানে দুজনেই কিভাবে আবেগে অভিভূত হয়ে যান। ইত্যাদি ইত্যাদি। ছবির মধ্যে ফোকাসের বাইরে কিছু মুখ দেখা যায়। সেখান থেকে শিবনাথকে শনাক্ত করল জয়া। হেসে কুটিপাটি হয়ে গেল। বিশ্বনাথ সংযত হেসে বলল—'দাদাটা বরাবর বড্ড কাপুরুষ। নইলে এটা হয়? বংশের একটা মান-ইজ্জত নেই? ছিঃ!'

জয়া বলল— 'কেন বাবা, তুমি তো বলতে বউদির জন্যে তুমি গর্ববোধ করো। 'আশাবরী'র গান যখন বাজে তখন নাকি গর্বে তোমার বুক ফুলে ফুলে ওঠে! বউদি নাকি তোমাদের বাড়িকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে!'

বিশ্বনাথ অন্যমনস্কভাবে বলল—'বাজে কথা বলিনি জয়া। কে চিনত সতেরর এক বেণীনন্দন স্ট্রীটকে যদি অপালা দত্তগুপ্ত এখানে না থাকত! আমাদের সবাইকার এখন পরিচয় অপালা দত্তগুপ্তর দেওর, অপালা দত্তগুপ্তর-জা, ...বউদি কিন্তু খুব সংযত স্বভাবের মেয়ে। এ ছবিটা ঠিক বউদির চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না।'

জয়া বলল—'মিতশ্রী ঠাকুরকে দেখেছো? কী না পরে আর কী না করে! দিদির ফাস্ট ফ্রেন্ড তো ও-ই।

বিশ্বনাথ বলল—'সঙ্গদোষ বলছো! এই বয়সে? তবে মিতশ্রী ঠাকুরটি কিন্তু দা-রুণ, যাই বলো!

জয়া মুখের একটা ভেংচি কাটার মতো ভঙ্গি করে বললো—'দা-রুণ!' হয়ে যাও না ওর অসংখ্য ক্রীতদাসগুলোর একটা, বউদিকে বললেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে'খন। আমার আর কি? গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে তো আর পড়ব না।'

বিশ্বনাথ বলল—'বাজে বকো না জয়া।' সে তার ড্রাফটগুলোর মধ্যে ডুবে গেল।

পত্রিকাটা জয়া বনির হাতে দিল—'তোর মায়ের ছবি বেরিয়েছে রে। খুব ভালো এসেছে। মাকে দ্যাখা। সবাইকে দ্যাখা।'

ঘরে এসে ছবিটা খুলেই বনির চক্ষুস্থির হয়ে গেল। সিনেমার পোস্টারের মতো ছবি। তার মা, আর এটা তো সোহম চক্রবর্তী। সে অত্যন্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় টিটুকে ডাকল। 'টিটু টিটু! শুনে যা!' ছবিটা দেখে টিটু বলল —'হ্যাঁ সোহম মামার সঙ্গে বোধহয় মায়ের উনিশ-কুড়ি বছর পরে দেখা। মা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সোহম মামাই তো দৌড়ে এসে মাকে

জড়িয়ে ধরল। —অপু অপু করে। আমরা সবাই ছিলাম।'

বনি বলল—'পোজটা কিন্তু রোম্যান্টিক ফিলমের।'

টিটু বলল—'বনি! তার গলায় রাগের সুর। এই সময়ে শিবনাথ ঘরে ঢুকলেন, বললেন, 'কি রে টিটু, বকছিস কেন বনিটাকে?' দুজনেরই অপ্রস্তুত অবস্থা। হাতে বইটা দেখে শিবনাথ বললেন—'এসব ফিল্‌ম ম্যাগাজিন আবার কোথা থেকে হস্তগত হল!' বনি বইটাকে লুকোবার চেষ্টা করতে শিবনাথ বললেন—'দেখি! দেখি কী লুকোচ্ছিস অত?'

বনি বলল—'ন্ না!' তার মুখ লাল হয়ে গেছে।

টিটু ধমক দিয়ে বলল—'এই বনি, দে না!'

শিবনাথ বইটা বনির শিথিল হাত থেকে তুলে নিলেন। ঠিক পাতায় তার আঙুল ছিল। ছবিটা শিবনাথের মুখের ওপর দড়াম করে একটা চড় মারল। ঘটনাটা যখন ঘটেছিল, তখনও তিনি বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যুক্তিনিষ্ঠ মানুষ। নিজেও গানবাজনা বোঝেন, ভালোবাসেন। নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে নিয়েছিলেন এই বলে যে এরকম হতেই পারে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে। গুরু ভাই-বোনদের মধ্যে। কিন্তু এখন ছবিটা সম্পূর্ণ পূর্বপ্রসঙ্গবিহীন। ব্লো-আপ। অপুর মুখের হাসি, চোখের জল সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সোহমের ভারী কাঁধের ওপর। অপুকে এতো সুন্দর তিনি কমই দেখেছেন। সোহমের ঝাঁকড়া চুল-অলা মাথাটা অপালার পিঠের ওপর। আবেশে চোখ বোজা। পুরো মুখটাই প্রায় তার চুলে ঢেকে গেছে। সেই দেখা-না-দেখায় মেশা মুখের মধ্যে শিবনাথ এই মুহূর্তে অনেক কিছু আবিষ্কার করতে থাকলেন। তাঁর দুই মেয়ের রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছে তারাও লজ্জা পেয়েছে খুব। তিনি প্রাণপণে নিজেকে সংযত করতে লাগলেন। মুখটা একেবারে রক্তহীন হয়ে গেছে।

টিটু বলল—'বাবা, মায়ের ছবিটা কী সুন্দর এসেছে, না? তোমাকেও ব্যাক গ্রাউন্ডে দেখা যাচ্ছে। অথচ আমার ছবিটা আসেনি। আমি তো তোমার পাশেই ছিলুম।'

শিবনাথ কথা না বলে বইটা বনির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। টিটু-বনি দুজনেই বুঝতে পারল বাবার কোথাও লেগেছে। বনির মধ্যে এখন একটা অপরাধী-অপরাধী ভাব। টিটু বলল—'কী করলি বল তো?'

বনি বলল—'কী হবে টিটু? বাবা কি মাকে খুব বকবে এখন?'

টিটু বলল—'কি করে জানবো? আমি তো এখনও বিয়ে করিনি। তোর মতো গাদা গাদা বয় ফ্রেন্ডও আমার নেই। কোথায় পেলি বইটা?'

বনি বলল—'কাকি দিল।'

টিটু খুব বুদ্ধিমতী; কাকিমা লাইব্রেরি থেকে যে সব বই আনায়, চুপি চুপি আনায়, চুপি চুপি ফেরত দেয়, চেয়ে পাওয়া যায় না। আর এইটের বেলাই নিজে থেকে সেধে এসে দিয়ে গেল? সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল—'বিচ।'

—'কী বললি?' বনি জিজ্ঞেস করল।

টিটু বলল—'কিছু না।' তারপর ছবিটা সন্তর্পণে কেটে নিয়ে বলল—'যা

এটা ফেরত দিয়ে আয়, বলবি ছবিটা দারুণ সুন্দর এসেছে, তাই রেখে দিলাম। বলতে ভুলবি না। মার ছবিটা স্পেশ্যালি দারুণ সুন্দর এসেছে বলবি।'

রাত সাড়ে দশটা। নীচে একটা গাড়ির শব্দ হল। অপালা আজ সল্ট লেকে যায়। মিতুলের ড্রাইভার বা কোন কোন দিন সোহম তাকে পৌঁছে দিয়ে যায়। আজ খুব সম্ভব সোহম। গাড়ির দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। সোহমের গলা সামান্য একটু শোনা গেল। অপালা বলল—'আচ্ছা!'

টেবিলের ওপর খাবার ঢাকা। শাশুড়ি এসে বসলেন। অপালা বলল—'মা আপনি খেয়ে নিয়েছেন তো!'

—'তাই কখনো পারি মা!'

—'সাড়ে দশটা বাজল, আপনি এরকম না খেয়ে বসে থাকলে মা... আপনার তো বয়স হচ্ছে! আপনারটা আনুন।'

—'আনি।'

—'আপনি এরকম করলে তো আমাকে মাস্টারমশায়ের বাড়ি থেকে খেয়ে আসতে হয়। উনি তো রোজই জোর করেন!'

—'তা খেয়ো না বউমা, তবে ঘরের বউ ঘরে খেলেই আমাদের ভালো লাগে।'

—'সে তো আমারও লাগে! তাই-ই তো...'

অপালা বাড়ির শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে চায় না। বাড়ির বউ অর্ধেক দিন বাইরে থেকে খেয়ে আসছে, এটা তার মূল্যবোধের সঙ্গে খাপ খায় না। তা ছাড়াও তাদের মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারের একরকম রান্না, অত্যন্ত সাধারণ। কিন্তু মিতুলের বাড়িতে বাবুর্চি রয়েছে ওস্তাদ। অনবরত মিতুলের বন্ধু-বান্ধব, মাস্টার মশায়ের পরিচিত জনেরা যাতায়াত করছে। মাস্টারমশায়ের রাতের খাওয়া খই দুধ, কিংবা চিকেন সুপ, আর দু পীস রুটি হলে হবে কী প্রায় প্রতিদিনই মিতুলের বাড়িতে স্পেশ্যাল রান্না হয়। সে তিনদিন যায়। এক দিন ইমতিয়াজ, দু দিন সোহমের সঙ্গে রেওয়াজ। সোহমও খেতে চায় না, সে-ও না। আজও বলেছিল বাবুর্চি—'পনীরের মালাই কোফতা করেছি দিদি, আর মাটনের ভিন্ডালু—একটু খেয়ে যান না।' অপালার তিনটি মুখ মনে পড়ে রণো, টিটু, বনি। ওরা যখন ওদের রাতের প্রতিদিনের বরাদ্দ সেই এক বেগুনভাজা কি পটলভাজা, মাছের কালিয়া খাবে, সেই সময়ে এই সব চমৎকার নামের খাবারগুলো তার গলা দিয়ে নামবে না। আজকাল সে প্রায়ই ওদের তিনজনকে বাইরে খাওয়া-দাওয়ার জন্যে টাকাকড়ি দেয়, সাবধান করে দেয়—'আজেবাজে জায়গায় খাসনি যেন!' কিন্তু ওরা কথা শোনে কি না কে জানে! ছেলেমেয়েদের ফেলে ঠিক এই ধরনের ভোজ খেতে বিবমিষা আসে তার। কিন্তু শাশুড়ি মায়ের এই নিত্যদিনের জেদ! জনপ্রাণী না খেলে হাঁড়ি আগলে বসে থাকা। রণো তো একেকদিন ভীষণ দেরি করে ফেরে, বিশু-জয়া কিছু না বলেই বেরিয়ে যায়, ফেরে খাওয়া দাওয়া সেরে, হয়ত রাত বারোটায়, তখনও শাশুড়ি হাঁড়ি কোলে করে মুখ শুকিয়ে বসে আছেন। অপালা অনেক দিন ছেলের দেরি দেখে বলে—'ঠিক আছে আমি বসে আছি। আপনি খেয়ে নিন মা।'

—'ওরে বাবা, রণোজী না এলে গলা দিয়ে আমার খাবার নামবেই না !'

খেতে খেতে অপালা ঠিক করলো এরপর থেকে সত্যি-সত্যিই মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি থেকে খেয়ে আসবে। মাস্টারমশাইয়ের মতো চিকেন সুপ, সালাড আর রুটি রাখতে বলবে বাবুর্চিকে। তাহলে তার জন্য অন্তত মা এ কষ্টটা থেকে রেহাই পাবেন।

মায়ের সাড়া পেয়ে বনি আর টিটু বেরিয়ে এসে বসল। অপালা বলল—'বনি, নতুন যে পাল্টাগুলো দিয়ে গেলুম, সেধেছিলি ?'

—'কি করে সাধব ? রিয়া, বিল্টু, কাকলি সব এসে গেল যে !'

—'ভোরে উঠতে পারবি না, বিকেলে বন্ধু এসে যাবে, তাহলে কখন করবি এগুলো ?'

—'দূর। তোমার গান শুনে আমার আর গানে বসতেই ইচ্ছে করে না। গলাটা যেন লাট্টুর মতো ঘোরে। কি করে অমন ঘোরাও কে জানে।'

অপালা বলল—'তোর গলা আস্তে আস্তে খুব ভালো হয়ে উঠছে। ভারী জোয়ারিদার গলা। ক্লাসিক্যাল যদি নাই হয়, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবি। বেসটা করে নে ! সেদিন 'আকাশভরা সূর্যতারা'টা গাইছিলি। খুব ভালো লাগছিল। রণো কখন ফিরল ?'

—'অনেকক্ষণ। টাইম দেখিনি। হাঁড়ির মতো মুখ করে ওপরে উঠে গেল।'

অপালাব এবার রুটিগুলো তেতো লাগতে লাগল। ছেলেমেয়েরা যখন ছোট ছিল তখন এতো সমস্যা ছিল না। তা ছাড়া তাকে তো কেউ ছেলেমেয়ের উপর কোনও অধিকারই দেয়নি। ওবা ছিল দাদু-ঠাম্মার। এখন প্রত্যেককে নিয়ে সমস্যা। টিটুর ভীষণ ভালো গলা। কিন্তু তার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা সে গান গাইবে না। সে তার বাবাব অঙ্কের মাথা পেয়েছে। জানিয়ে দিয়েছে সে আই.এ.এস হবে। হঠাৎ যদি সে অপালার কোনও গানের মুখটা গেয়ে ওঠে, কি সোহমের কোনও গজল, কিংবা মিতুলের নজরুলেব দু-চার কলি, অপালা সাগ্রহে বলে—'গা। গা। পুরোটা গা না রে টিটু। এতো সুন্দর তুলেছিস !'

টিটু দুম করে চুপ করে যায়। জোরাজুরি করলে বলে—'এর চেয়ে বেশি আমি তুলিনি। জানি না।' গানের প্রতি এই যুগপৎ অনুরাগ-বিরাগের ভাবটা বোধহয় ওর মার প্রতিও। কে জানে !

আর রণো ! রণজয় কার ছেলে, রণজয় কে অপালা জানে না। চেনে না। প্রথম প্রথম তাকে 'বউমা' ডাকত। তার ঠাম্মাই জোর করে মা বলতে শিখিয়েছিল। কিন্তু মা বলে ডাকতে যেন এখনও রণো কিরকম লজ্জা পায়। ঠাম্মাই ওকে মানুষ করেছেন। কাউকে কোনরকম শাসন করবার অধিকার দেননি। রণো এবার বি.কম পাস করল। ভালো ভাবে নয়। পড়াশোনা করে কখন যে ভালোভাবে পাশ করবে ? কোনক্রমেই তাকে এম.কমে ভর্তি করানো গেল না। কখনও বলে এম.বি.এ করবে, কখনও বলে ব্যাঙ্কিং-এর পরীক্ষা দিচ্ছে, সে যে কী করছে একমাত্র সে-ই জানে। এখন আর তার দাদু-দিদাও জানেন না। হালে পানি না পেয়ে মাঝে মাঝে শিবনাথকে, অপালাকে

বলেন—'কি রে শিবু, কি গো বড় বউমা। তোমরা কি ছেলেটার দিকে একটু তাকাবে না। ও যে বয়ে যাচ্ছে। উচ্ছন্নে যাচ্ছে।' শিবনাথ, অপালা কেউই কথাবার্তায় তেমন পটু নয়। বলতে পারে না। রণোর উচ্ছন্নে যাবার মূলে তার দাদু-দিদা। মনোহর আর পারুল। এখন রণো আর তাঁদেরও গ্রাহ্য করে না। বাবা-মার মতামতের মূল্য তো তার কাছে নেই-ই।

অপালা মনে মনে বলে—'হে ঈশ্বর, তুমি আমায় গান ছাড়া কিছু দাও নি। ভাষা দাওনি, ব্যক্তিত্ব দাওনি, কন্যা-বধূ-মা হতে হলে যা যা গুণ দরকার কিছুই বোধহয় আমায় দাওনি। রণো যদি গানের ভাষা বুঝতো তাহলে আমি ওকে মালকোষ শোনাতুম। ওকে, ওর সমগ্র চেতনাকে মাতৃক্রোড়ে নিয়ে ওপরে, অনেক ওপরে চলে যেতুম যেখান থেকে সমস্ত পৃথিবীকে খেলনার মতো দেখায়। মেঘলোক, তারামণ্ডল, আকাশের নীলিমা—এ সব অনেক কাছের অনেক আপন বলে মনে হয়। একবার ওই লোকে মেঘ আর তারাদের সঙ্গে বিচরণ করতে শিখে গেলে ও কখনওই ওরকম চেইন স্মোক করে ঠোঁক কালো করে ফেলত না, অন্তঃসারশূন্য বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মেরে যৌবনের দামী সময়টাকে নষ্ট করে ফেলত না। কিন্তু রণো যে মালকোষের ভাষা বুঝবে না! কিছু করতে পারি না, অথচ মনের ভেতরটা ছটফট করে।

এইরকম মানসিক অবস্থা লালন করতে করতেই অপালা তার ঘরে ঢুকল। টিটু, বনি বলল—'মা, গুড নাইট।' অপালা হাসল—'এতোক্ষণ শুসনি কেন? আমার জন্যে? যা শুয়ে পড়।'

শিবনাথ ঘুমিয়ে পড়েছেন ও পাশ ফিরে। অপালা শুধু হাত ধুয়ে খেতে বসে গিয়েছিল, শাশুড়ি খাননি বলে। এখন বাথরুমে গিয়ে মুখে-চোখে জল দিল, পা ধুলো ভালো করে সাবান দিয়ে। জামাকাপড় বদলালো। তার মেয়েরা নাইট-গাউন পরে শোয়, তার ছোট জা-ও। কিন্তু অপালার এখনও ব্যাপারটা রপ্ত হয়নি। সে একটা রঙচটা, মাড়হীন শাড়ি রেখে দেয় রাত্রের জন্য। পরে শুতে খুব আরাম। গায়ে পাউডার ঢেলে, আলগা একটা ব্লাউজ। চুলে আঁট করে একটা বিনুনি। বাস। এবার বিছানায় শোবে, আর ঘুমোবে। আজকে রেওয়াজ বড় ভালো হয়েছে। সোহম যে প্রোগ্রাম ঠিক করেছে তাতে সে পরিপূর্ণ সায় দিয়েছে। তাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও, চমৎকার বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে তাদের গান এগোচ্ছে। আজকে পুরোটা টেপ করা হয়েছে। শুনে আসতে দেরি হয়ে গেল। শিবনাথ আজকে ঘুমিয়ে পড়েছেন। কাল সকালে প্রথমেই বলতে হবে আজকের আনন্দ আর সাফল্যের কথা। আহা, দিদি, জামাইবাবু যদি থাকতেন। কেন যে ভেনেজুয়েলায় যেতে গেলেন।

অপালা শুতে শিবনাথ একটু শব্দ করে এ পাশ ফিরে শুলেন। অপালা বলল—'তুমি ঘুমোওনি? জানো, আজকের গান খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো। যুগলবন্দী গাইতে গেলে একটা বোঝাপড়ার দরকার তো। সেটা আমার আর সোহমের মধ্যে কিছুতে হচ্ছিল না। দুজনের মেজাজ সম্পূর্ণ আলাদা তো...'

শিবনাথ হঠাৎ অপালাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলেন। এত জোরে যে তার

ভেতরের হাড়গোড় সব গুঁড়ো হয়ে যাবে মনে হল। অপালা বলল—'উঃ কি করছো। কি করছো!'

শিবনাথ অর্ধস্ফুট স্বরে বললেন 'তুমি কি করছো? তুমি কী করছো? ভাবো আগে।' তারপর আর অপালার কথা বলার অবকাশ হল না। সেই প্রথম যৌবনের রাতের ক্ষিপ্ত শিবনাথ অনেক দিন পর অপালার উপর প্রচণ্ড আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রাত্তিরটাকে মনে হল—বিভীষিকার রাত। স্বামীকে মনে হল পিশাচ। বর্বর। অপালা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল—'তুমি আমাকে এতো কষ্ট কেন দাও? কেন?' তার গলা বুজে যাচ্ছে কান্নায়।
টিটু পাশের ঘর থেকে সেই চাপা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ে ভয়ে কাঁটা হয়ে গেল। সে জানত কিছু একটা ঘটবে আজ।

শিবনাথ কোনও কথা বললেন না। কোনও সান্ত্বনার কথা না, কোনও ভালোবাসার কথা না, যেমন আগে আগে বলতেন। এমনকি কোনও ব্যবহারিক কথাও না। শুধু নির্বাক, পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। অপালা অনেকক্ষণ ধরে ফোঁপালো। ছোট মেয়ের মতো। সে যেন এখন বনির চেয়েও ছোট। মনে মনে বলতে লাগল উঃ মা। মাগো। এই মা তার গর্ভধারিণী জননী নয়। তিনি তাকে তার কোনওরকম বিপদের সময়ে রক্ষা করতে পারেননি। চেষ্টাই করেননি। এ মা যে কে! এ এক যুগ-যুগান্তের অসহায় অভ্যাসের চিৎকার। যখন কেউ থাকে না, শারীরিক, মানসিক, কিংবা আত্মিক কষ্টে মানুষ যখন আর কিছুতেই নিজেকে নিজে শান্ত করতে পারে না, তখন এই জননীকে ডাকে। ইনি আছেন কি নেই, থাকলে এঁর মূর্তি কেমন, কতটা সমাধান উনি করতে পারবেন সমস্যার সে কথা ভাবে না। খালি আর্তনাদ করে ওঠে মা! মাগো! কোনদিন কোনও বিশ্বজননী এ আর্তনাদে সাড়া দেননি, গুটিকয় সাধুসন্তের অভিজ্ঞতায় ছাড়া। তবু অসহায় মানুষ আর্তনাদ করে এই মায়েরই নাম ধরে—মা! মা! মা!

॥ ২২ ॥

হল পরিপূর্ণ। তিলধারণের স্থান নেই। চল্লিশের দশকের বিখ্যাত প্রডিজি গায়কবাদক রামেশ্বর ঠাকুরের দুই শ্রেষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রী অপালা দত্তগুপ্ত এবং সোহম্ চক্রবর্তীর যুগলবন্দী। এঁরা দুজনেই আরও অনেক প্রতিভাবান গুরুর তালিম পেয়েছেন। এক এক করে সেই তালিকা পাঠ হল। আজ তাঁরা দ্বৈতভাবে পেশ করছেন প্রধানত তাঁদের প্রথম গুরু রামেশ্বরজীর তালিম।
এই সঙ্গীতোৎসবে কলকাতার সঙ্গীতরসিকরা তো এসেছেনই। নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন বহু গুণী। মঞ্চের আজ বিশেষ সজ্জা। প্রধানত: এই দুই শিল্পীকে উপস্থিত করা হবে, কিন্তু অন্তত রাত আট সাড়ে আট না বাজলে তাঁদের গান আরম্ভ হয় কী করে? তাই ফাউ হিসেবে দর্শকরা দেখতে পেলেন নতুন দুই শিল্পীর উচ্চমার্গের কথক। এঁরা খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে কালীয় দমন ও অহল্যা উদ্ধার দেখালেন। তারপর মঞ্চে আস্তে আস্তে এসে বসলেন যন্ত্রীরা, সারেঙ্গী, দুটি তানপুরা, দুটি হারমোনিয়াম, জোড়া তবলা। অপালা আজ চন্দন রঙের

ওপর ঘন লাল পাড় কাঞ্জিভরম পরেছে। মাথায় ফুল। কপালে মেরুন টিপ। এই শাড়ি সোহমের উপহার। মাথার এই ফুলের সাজে তার প্রচণ্ড আপত্তি ছিল, এত বড় টিপও সে পরতে চায়নি। কিন্তু সোহম অনড়। সে পরেছে তসরের পাঞ্জাবি, তাতে বাদামী কাজ। পায়জামা মানানসই রঙের। তার ডান হাতের আঙুলে গোটা দুই পাথর চমকাচ্ছে।

রামেশ্বরকে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বিশেষ আসনে। একটি নরম সোফায়। তাঁর দুই পাশে দুই শিষ্য। যদি কোনও অসুবিধে বা প্রয়োজন হয়। উদাত্ত খোলা গলায় আরম্ভ করল সোহম্। দরবারী। সে ফিরে গেছে বহুদিন আগে। গলায় সেই পুরুষালি বিক্রম। সুরকে যেন দু' হাতে পাকড়ে ধরেছে। গজলিয়া সোহম নদীস্রোতের ওপর দিয়ে লহরীমালার মধ্যে দিয়ে ভেসে যায়। খেয়ালিয়া সোহম সমুদ্রের তলদেশে অবতরণ করছে। সুরের ডুবুরি। তার পরেই সোনার ঘণ্টার মতো অপালার গলা সুরের মুক্তাগুলি একেক করে তুলে আনল। আজ সবাই এসেছে। শিবনাথ নিজে, অপালার দুই মেয়ে, এমনকি তাদের ঠাকুমা পারুল দেবী এবং দিদিমা সুজাতা পর্যন্ত। খালি রণো বাদ। রণো নেই। ইদানীং রণো ভীষণ ভাবাচ্ছে। তার একটি বন্ধু অপালাকে বলে গেছে রণো নাকি একটি পাঞ্জাবী মেয়ের সঙ্গে খুব 'উড়ছে'। মেয়েটি নাকি বিরাট ব্যবসায়ী পরিবারের। রণোর মতো ছেলেকে ওরা 'চাকর' রাখতে পারে। রণো মাঝে মাঝে খুব দেরিতে ফেরে, দাদু কৈফিয়ত চাইলে বিরক্ত হয়ে বলে কমপিটিটিভ পরীক্ষার জন্য তৈরি হওয়া মুখের কথা নয়। এর চেয়ে বেশি কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস কারো হয় না। কপালে তার প্রচণ্ড ভ্রূকুটি। অপালার আলাপের পরতে পরতে খুলে যায় গভীর আর্তি। 'পট খো-ল' বলে যে মিড় সে টানছে তার মধ্যে বুক ফাটা কান্না, রণো, রণো, তুই কোথায় যাচ্ছিস। যাদের সঙ্গে প্রথম যুগ থেকে তোর মেলা মেশা সেই তারাই যে তোর নামে যা-তা বলে গেল। রণো তুই এখন বন্ধুবিহীন একা। তার এই সুরের গলিতে অন্বেষণের ফাঁকে সোহম দুর্দান্ত তেজে একটা হলক তান দিল। সে কি মনে করিয়ে দিচ্ছে অপালাকে এবার লয়কারির সময় এসে গেছে। আর এখন এই টানা মিড়ের কাজ নয়। অপালা তখন বিভ্রান্তের মতো সুরগুলি নিয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল— রণো তোর বাড়িতে এতজন শুভার্থী রয়েছে, কারুকে তুই কিছু বলতে পারিস না কেন? কাউকে কেন বিশ্বাস করতে পারিস না? শোন রণো, শোন, আমরা বুঝবো। আমি বুঝবো। আর কেউ না বোঝে আমি বুঝব। গলা ধরে গেল অপালার, তার চোখ ভরে উঠেছে। এই গলা ধরে যাওয়াও কী মধুর, ভাবল শ্রোতা। তারপরেই সোহম ধরে নিল দ্রুত বন্দিশ, গমকে গমকে ভরিয়ে দিচ্ছে সে কলামন্দিরের প্রতিটি কোণ, অপালার মধুক্ষরা কণ্ঠ— পরক্ষণেই ছুটে যায় সপাটে। কতক গুলি কূটতানের চক্রে ঘুরে ঘুরে আবার দাঁড়ায় রেখাবে। সোহম এখন গরম হয়ে উঠছে। আর্বতনের পর আবর্তন ঘুরছে তার কণ্ঠ, বিশাল বিশাল তেহাই, সোহম যেটা করছে অপালা ঠিক সেই ভাবে আরম্ভ করে সুরগুলিকে সামান্য এদিক ওদিক করে অন্যরকম সৌন্দর্য সৃষ্টি করে যাচ্ছে।- যেখানেই যাস রণো, তোকে আমি উদ্ধার করবোই। বলো বলো হে ঈশ্বর, কোন সে দায়িত্ব যা আমাকে দেওয়া হয়েছিল

অথচ আমি পালন করিনি ? আতিপাতি খুঁজে বেড়াচ্ছে অপালা তার ফিরৎগুলিতে কোথায় তার ভুল। কেমন করে সে ভুলের সংশোধন হবে! আমি কি ভালোবাসিনি ঠাকুর ? রণোকে কি আমি ভালোবাসিনি ? গানকে এভাবে ভালোবাসা কি স্বার্থপরতা ? আমি বিবাহ চাইনি, স্বামী চাইনি, সন্তান চাইনি, পরিপূর্ণ ভালোবাসার স্বাদ, বাৎসল্যের স্বাদ, রতিসুখের স্বাদ আমি গানে পেয়েছি, গানে আমি পেয়েছি তোমাকে, পেয়েছি না, পাই, নতুন নতুন করে পাবো বলেই ক্ষণে ক্ষণে হারাই। সেই হারানোর বেদনা সে-ও কী মধুর! কিন্তু তুমি এই পার্থিব জগতের মানুষের আশা-আকাঙক্ষার ন্যূনতম জিনিসগুলি আমায় সবই দিলে, না চাইতেই দিলে, তার সঙ্গে দিলে অসংখ্য অজস্র জটিলতা, আমি আমার স্বামীকে বুঝতে পারি না, ছেলে মেয়েদের বুঝতে পারি না, বুঝি না কেন, বিশ্বনাথ অমন উদাসীন, জয়া কেন অমন নিরুত্তাপ। বুঝি না আমার প্রাণ নিংড়ে দেবার পরও কেন শ্বশুর মশাই অত নিষ্ঠুর, শাশুড়ি অত একদেশদর্শী। বলো ঈশ্বর বলো আমার রণো কোথায় যাচ্ছে ? যদি না-ই ভালোবাসি তো এতো যন্ত্রণা কেন ? এবার ঠুমরি ধরেছে সোহম, নাজনীনের তালিমের ঠুমরি। 'আজ মুরলি বজাই শুনাই রে। চলো সখি বৃন্দাবন যাই।' তার গলা মোলায়েম হয়ে গেছে, নাজনীন স্টাইল ঠুমরি, প্রতিটি শ্রোতার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে তার আবেদন। অপালাও যখন মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছে, সে এক একটা দুর্লভ গোধূলির আলো জ্বলা মুহূর্ত। ক্ষণমধুর। চিরকাল মাথায় রাখবার জন্য শ্রোতা আকুল। তারপর ভজন ধরল অপালা। 'জাগিয়ে রঘুনাথ কুঁয়ার পন্‌ছি বন বোলে', তোর জেগে ওঠার সময় হলো রণো, পাখি ডাকছে শুনতে পাচ্ছিস না! এ তামসী নিদ্রা ত্যাগ কর রণো। চন্দ কিরণ শীতল ভই, চাঁদের কিরণ, সে যে তোর মায়েরই ভালোবাসার কিরণ, বড় শীতল, তুই বুঝিস না ? তুলসীদাস অতি আনন্দ, নিরখি কে মুখারবিন্দ। তুলসীদাস আনন্দে থাকতে পারেন তাঁর রঘুনাথ কুঁয়ার, এক আদর্শ বালক, আদর্শ পুরুষ, আদর্শ রাজা হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আমি যে আনন্দিত হতে পারছি না রণো। দীননাথ দেত দান ভূষণ বাহু মূলে। কি চাস রণো! ভুল জিনিস চাসনি রণো। আগুনে হাত দিসনি। জাগিয়ে রঘুনাথ কুঁয়ার পন্‌ছি বন বোলে।'

অনুষ্ঠান শেষ। মনে হল সমস্ত হল সুরের স্থাপত্য হয়ে গেছে। তার থাম, তার সিলিং, মঞ্চ, বসবার আসন সব ভিন্ন ভিন্ন সুর শ্রুতি দিয়ে তৈরি। মানুষগুলিও যেন সারাক্ষণ বেজে বেজে বাদ্যযন্ত্র হয়ে গেছে। আর কোনও অনুরোধ করবার কথা শ্রোতার মনে এলো না। তার হৃদয়ের সমস্ত সুর, সমস্ত প্রার্থনা দিয়ে অপালা ভজনটি গেয়েছে। কোনও তৃষ্ণা বুঝি অপূর্ণ রাখে নি। এই গানের রেশ কানে নিয়ে বাড়ি ফিরতে চায় সবাই। 'পঞ্ছি বন্ বোলে।'

রণো বলল— 'সুমন, সুমি তুমি আমাকে এ ভাবে ট্যানট্যালাইজ করো না প্লীজ।'

সুমি হেসে রণোর কাঁধের ওপর মাথা রাখল— একটা পাগল করা সুগন্ধ, মাতাল করা স্পর্শ— 'হোয়াট ডু য়ু মীন বাই 'ট্যানটালাইজ ?' তুমি একটা থার্স্টি পার্টি, অ্যান্ড আই অ্যাম আ ম্যাজিক স্প্রিং। ইজ দ্যাট সো। তো ডিফাইন এগজ্যাক্টলি হোয়ট ইউ আর থার্স্টি ফর।'

রণো সুমির মুখের ওপর মুখ নামাতে গেল। সুমি খিলখিল করে হাসতে হাসতে সরে গিয়ে বলল— ওহ, য়ু আর টিকলিং মি ? হাউ মেনি ডেজ হ্যাভ্‌ন্ট্‌ ইউ শেভ্‌ড্‌ ?'

রণো বলল, 'আমি শেভ করতে আরম্ভই করি নি এখনও। খালি ট্রিম করি। সুমি ডোন্ট য়ু লাইক ইট ? অনেকেই তো বলে আমায় ভালো দেখায় !

সুমি আবার সেই কাচের চুড়ি ভাঙার হাসিতে ফেটে পড়ে—

—কে বলেছে ? সাম গার্ল ফ্রেন্ড ? আই বেট দেয়ার্স নো আদার গার্ল ইন ইয়োর লাইফ বাট মি। ইউ আর সেয়িং দিস সিম্পলি টু মেক মি জেলাস।'

রণো বলল—'বাজে কথা ছাড়ো সুমি, তুমি শুধু একবার আমায় ইয়েস বলো, তারপর দেখো আমি কী করি ?'

—'আমার ইয়েস' বলাতে কী আসে যায়, আমার ড্যাড রয়েছে, আঙ্কল রয়েছে। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে তুমি কথা বলতে পারবে ?'

—'হোয়াই নট ? ইউ মে বী স্টিংকিং রিচ। কারণ তোমরা বিজনেস করো। বাট উই আর মোর কালচার্ড পিপল। আমার বাবা রেসপেকটেবল গভমেন্ট অফিসার, আমার মা এত বড় সিঙ্গার যে যে-কেউ নাম বললে চিনবে।'

—'আই নো, কিন্তু তুমি নিজে, তুমি কী। তোমার নিজের স্টেটাস কী ?'

—'আরে আমি তো ডাবলু বি সি এস করছি, এম বি এ-র ডিপ্লোমা কোর্স করছি। একটা না একটা কিছু লেগে যাবেই। ইউ কান্ট এক্সপেক্ট এ ইয়ংম্যান অফ মাই এজ টু বি এ বিজনেস ম্যাগনেট। ক্যান ইউ !'

সুমি বলল—'আমার দাদা, দ্যাট ইজ মাই কাজিন ইজ ওয়ান। অ্যাট দি এজ অফ টোয়েন্টি ফোর আ ডিরেক্টর। গোজ অ্যারাউন্ড ইন অ্যান ইমপোর্টেড এয়ারকনডিশনড কার।'

রণো বলল—'সে তো তোমাদের বাবা, কাকা, এঁরা বিজনেসটাকে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন বলে। তোমার কাজিন একটা রেডিমেড কেরিয়ার পেয়েছে।'

—'আমার বাবা, ওই রকমই চান।'

—'তো তুমিও কি তাই-ই চাও ? আমায় সিম্পলি বলে দাও তোমার মত কি ? এতোদিন তো আমায় বুঝতে দিয়েছো আমিই তোমার চয়েস।...'

সুমি আবার রণোর কাঁধে মাথা রাখল, হঠাৎ মুখটা তুলে তার নরম দাড়িঅলা গালে একটা সশব্দে চুমো খেলো। বলল—'ওহ রণো, মাই রনি বয়, ইউ আর সো সুইট ! দেয়ার্স এ ডিয়ার, এখানেই আমাকে নামিয়ে দাও প্লীজ। লাউডন এসে গেছে।'

রণো এখন প্রায় কাঁপছে। ভেতরে ভেতরে কাঁদছে। কিন্তু রাগের কান্না ছাড়া অন্য কোনও রকম কান্না তো সে জীবনে কাঁদেনি। সে নিঃশব্দে তার কান্না গিলে নিয়ে বলল—'আবার কবে দেখা হবে ? কখন ?'

—'থার্স ডে উইক, সেমটাইম, সেম প্লেস' ট্যাকসির দরজা খুলে সুমন নেমে গেল। রণো ট্যাকসিটাকে ঘুরিয়ে থিয়েটার রোডের মোড়ে ছেড়ে দিল। তারপর বাকি পথটা হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরতে লাগল। কারণ আর কোথাও যাবার নেই, কিচ্ছু করবার নেই। তার নিষ্ফল ক্রোধ, কান্না যতক্ষণ না প্রশমিত

হচ্ছে তাকে এভাবে হেঁটে যেতে হবে। হয়ত পরের সপ্তাহের বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। মনের মধ্যে আর কোনও চিন্তা নেই, কথা নেই, শব্দ নেই, শুধু সুমির স্পর্শ, অদ্ভুত নরম ফুলের পাপড়ির মতো ভিজে ভিজে স্পর্শ। অদ্ভুত গন্ধ, চুলের, পোশাকের, দেহের। কি করে একটা মেয়ে এতো পেলব, এতো চিকন, এতো সুগন্ধ হতে পারে! রণো জানে না ওই ভিজে ভিজে স্পর্শ, ওই সৌরভ কোনটাই ঈশ্বরদত্ত নয়, সবই নামী দামী কোম্পানির প্রসাধনদ্রব্যের কেরামতি। সুমন কাপুর সুন্দর হতে পারে, কিন্তু তার জাদুর অনেকটাই রাসায়নিক। তার চুলের ওই গোল গোল গুচ্ছ যা অনবরতই রণোর গালে সুড়সুড়ি দিয়ে তাকে উত্তেজিত করে তোলে তাও বিউটি সেলুনের কারসাজি। রণো, আজ সুমিকে নিয়ে কলামন্দিরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, একবারও তার মনে হয়নি আজ এই উৎসবদীপ্ত পাবলিক হলের মধ্যে তার মা গাইছে, যে মার নাম সে নিয়েছিল সুমন কাপুরকে নিজেদের সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠতা দেখাতে। তার মা গাইছে হয়ত তার জীবনের শ্রেষ্ঠ গান, যা শুনতে কলকাতার বহু গুণী জন এসেছেন। তার বয়সের ছেলেমেয়েরাও আছে এই শ্রোতৃমণ্ডলীতে। যারা গান শোনে, ভালোবাসে। কিছু এসেছে হুজুগে। কিছু এসেছে বহু টাকা আছে তার কিছুটা অংশ এভাবে খরচ করে ফেলতে। কিন্তু বেশির ভাগই এসেছে পৃথিবী-বিখ্যাত সোহম চক্রবর্তী এবং ভারত-বিখ্যাত অপালা দত্তগুপ্তর যুগলবন্দী শুনতে। সাংস্কৃতিক জগতে এটা একটা লাখে এক ঘটনা বলে গণ্য হচ্ছে। এবং আজকের শ্রোতারা এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে যাবে।

দরজা খুলে দিলো দাদু। —'বড্ড দেরি করিস রণো!'

—'বাজে বকো না।'

মনোহর ভুরু কুঁচকে বললেন—'বাজে বকো না মানে? এখন সাড়ে দশটা বাজছে। তা জানো?'

—'বুড়ো আছো, বুড়োর মতো থাকো।' বলতে বলতে রণো দু-তিন লাফে ওপরে পৌঁছে গেল। তারপর তিনতলায় নিজের নতুন ঘরে। বাড়িটা কেন আজ এত খালি খালি সে বুঝতে পারল না। সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেছে আজ সবাই তার ঠাকুমা-দিদিমা পর্যন্ত কলামন্দিরে। পেছন থেকে দাদু ডাকছেন।

—'খাবার ঢাকা আছে। খেয়ে যাও।'

—'টু হেল উইথ ইয়োর খাবার' রণো ভয়াল মুখ করে ফিরে দাঁড়াল। সে মুখ দেখে মনোহরের মতো ব্যক্তিও ভয় পেয়ে গেলেন। তেতলার সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে তিনি শুনতে পেলেন রণো অশ্রাব্য গালাগাল দিচ্ছে—সন অফ এ বিচ, ব্লাডি বাস্টার্ড,...মনোহর ভয়ে বিস্ময়ে প্রায় স্থাণু হয়ে ভাবতে লাগলেন এগুলো রণো কাকে বলছে, তাঁকেই নাকি? ওপরে কি একটা ছুঁড়ে ফেলার শব্দ হল। ভারী কিছু। তারপর সব চুপ। মনোহর প্রথমে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন, কিন্তু ভীষণ উৎকণ্ঠা হচ্ছে। কী পড়ল ওপরে? ছোট ছেলের ঘর থেকে মৃদুস্বরে কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

—'সাতশ টাকা স্কোয়ার ফিট টু মাচ।' বিশু বলছে।

—'আহা তোমার যেন নেই। দু'জনের কতটুকুই বা স্পেস লাগবে!'

—'একটা গেস্ট রুমও তো থাকবে রে বাবা !'

'—তা হোক, আমার ওটাই পছন্দ, প্লী-জ।'

এই সব কথাবার্তার অর্থ মনোহর ভালো বুঝতে পারলেন না। ডাকলেন 'বিশু'। ভেতরের কথাবার্তা দুম করে থেমে গেল।

বিশু বেরিয়ে এলো। বিশুকে তিনি দু'খানা ঘর দিয়েছেন। বউমার বাপের বাড়ি থেকে ঘর দুটি সাজিয়েও দিয়েছে। কিন্তু সেই বিয়ের দিনের পর থেকে তিনি আর কখনও ঘর দু'খানার চেহারা দেখেননি। ভারী ভারী পর্দা ঝোলে সব সময়ে। কাউকে ডাকলেই সে এসে বাইরে দাঁড়ায়। কখনও ভেতরে আসতে বলে না। দাঁড়ায় প্রায় দরজা আড়াল করে। বিশুর শ্বশুরবাড়ি থেকে যখন গাড়ি বোঝাই লোক আসে, তাঁর স্ত্রী পারুল খুব হাসিখুশি মুখ নিয়ে বলেন—'ছোটবউমা ক' কাপ চা হবে ? চা না কফি ?' জয়া দরজার দু'পাশে হাত রেখে দাঁড়িয়ে বলে— 'আপনি ভাববেন না মা। কিছু করতে হবে না। ও দোকানে যাবে, কিছু কিনে নিয়ে আসবে'খন।'

—'তা আনুক না। চা-কফিও কি কিনে আনবে নাকি ?' চাপাগলায় বলেন পারুল।

—'আ-চ্ছা করুন চা।' বলতে বলতে জয়া ঘরের ভেতর থেকে একটি সুদৃশ্য কৌটো এনে একটা কাগজে মাপ করে চা ঢেলে দেয়। বলে—'তিন মিনিটের বেশি ভেজাবেন না।'

বিশু বেরিয়ে এসে বলল—'কী বলছো বাবা ?'

—'রণো কি রকম বিচ্ছিরি মেজাজ নিয়ে ফিরল। খেলো না। ওপরের ঘরে কি একটা ভারী জিনিস পড়বার শব্দ হল, একটু দেখবি ?'

বিশু বলল—'যথেষ্ট বয়স হয়েছে, গোঁফ-দাড়ি গজিয়ে গেছে, এখন আর বাবা-বাছা করার দিন নেই। আদর দিয়ে মাথায় তুলেছ। এখন চোটপাট করলে সহ্য করো। আমাকে এর মধ্যে টানছো কেন ?'

—'কিন্তু বিশ্রী একটা শব্দ হল, বিশু একবার যদি...'

বিশু কাঁধটা একবার নাচাল। তারপর ওপরের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। তেতলার ঘরটা ভালোই বানিয়েছে। অপালা দত্তগুপ্তকে যতটা ভালোমানুষ মনে হতো ততটা বোধ হয় নয়, নিজের ছেলের ঘরটা বেশ ভালোই সাজিয়ে দিয়েছে। ছোট ঘর, কিন্তু মেঝেতে মোজেইক, দেয়ালে প্লাস্টিক পেইন্ট, নতুন বক্সখাট, মাল্টিপারপাস ক্যাবিনেট একটা। রণো বাইরের জামাকাপড়, জুতো সবশুদ্ধু শুয়ে আছে। দরজার দিকে তার পা। জুতোর তলা দুটোই সবচেয়ে ভালো করে দেখতে পেল বিশ্বনাথ।

কড়া স্বরে জিজ্ঞেস করল—'রণো, কী পড়ল ঘরে ? নিচ থেকে আওয়াজ পেলুম !'

—'দেখতেই তো পাচ্ছো !'

—'না পাচ্ছি না।'

—'জলের কুঁজো।'

এতক্ষণে বিশ্বনাথ দেখতে পেলো ঘরময় নদী বইছে। টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে মাটির কুঁজো, তার ওপরে ঢাকা দেওয়া কাচের গ্লাসটাশুদ্ধু টুকরো

টুকরো হয়ে গেছে।'

—'কি করে হলো ?'

—'হয়েছে!'

—'এগুলো পরিষ্কার না করলে তো রাত্রে পা স্লিপ করবে। নিজেই আছাড় খাবে, পা কাটবে।'

—'খাই খাবো। নোবডি হ্যাজ টু বদার অ্যাবাউট মি অ্যান্ড মাই অ্যাফেয়ার্স।' শুয়ে শুয়ে জবাব দিল রণো।

চটির শব্দ তুলে নীচে নিমে এলো বিশ্বনাথ। মনোহর সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন—বলল—'ও একটা বখে-যাওয়া অসভ্য ছেলে। কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় জানে না। ওর কাছে আমাকে আর কোনদিন পাঠাবে না।' নিজের ঘরের দরজা শব্দ করে বন্ধ করে দিল বিশু। সে যে নিজেও বেশ ভদ্রলোক হয়ে গেছে। বাবার মুখের ওপর শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দেওয়াটা যে তার পক্ষেও খুব সভ্যতা নয় সেটা তার মাথায় এলো না। এবার মনোহর আর সাড়াশব্দ করলেন না। খালি আরও মিনিট পঁয়তাল্লিশ পরে যখন কলামন্দির থেকে বাড়ির সবাই ফিরে এলো, তখন তাদের এতক্ষণ ধরে একটু একটু করে গড়ে ওঠা সুরেলা মেজাজ, অপার্থিব শান্তির আমেজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

অপালা বলল—'আমি একবার যাই। দেখে আসি।'

বনি বলল—'মা, মা, তুমি প্লিজ যেও না, দাদা তোমায় দু'চক্ষে দেখতে পারে না।'

শিবনাথ বললেন—'আমি যাচ্ছি।' ওপরে গিয়ে দেখলেন দরজা বন্ধ। দরজার ফাঁক দিয়ে জল পড়ছে, —'রণো রণো' তিনি দরজায় টোকা মারলেন। কোনও সাড়াশব্দ এলো না। নীচে নেমে আসতে জল পড়ছে শুনে টিটু বলল—'ও, তা হলে নিশ্চয়ই কুঁজো ভেঙেছে। তোমরা ওকে ওর মতো থাকতে দাও তো! আর এবার একটা প্ল্যাস্টিকের জাগে জল রাখবে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কুঁজো ভাঙল।'

অপালা সহজে কাঁদে না। লোকের সামনে তো নয়ই। কিন্তু আজ কলামন্দিরের দর্শক দেখেছে গানের গভীর মূর্ছনায়, মিড়ে মিড়ে, তার চোখ ছলছলিয়ে উঠছে, রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে ভাবে, ভজনের সময়ে দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়েছে। তারা মনে করেছে সুর। সুরই এমন করে কাঁদাচ্ছে গায়িকাকে। এ এক অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতা। কলকাতার শ্রোতা বহুদিন এ গান ভুলবে না, বলবে, 'সে এক শুনেছিলাম বটে সোহম চক্রবর্তী আর অপালা দত্তগুপ্তর যুগলবন্দী।' ঠিক যেমন তার আগের প্রজন্ম বলে 'বড়ে গোলাম আলি, আমীর খাঁর কথা। কিন্তু কেউ জানে না অপালার গানের প্রত্যেকটি ভাঁজে আজ শুধু নিবেদন ছিল একজনের জন্যে। রণজয়। তার নিভৃত ডাকের প্রথম সন্তান হিন্দোল। তার জন্য প্রচণ্ড মানসিক কষ্ট, মর্মবেদনা, উৎকণ্ঠা—তার প্রাণ-নিংড়োনো প্রার্থনায় এই-ই ঝরে পড়েছে সুর হয়ে, অশ্রু হয়ে। এখন নির্জন রাত্রে সে একা একা নিজের ঘরে ঢুকে যাচ্ছে, খোঁপায় গন্ধরাজের গুচ্ছ মনে হচ্ছে নির্মম ঠাট্টা। চন্দন রঙের শাড়ির ওপর ঘন লাল

পাড় যেন এক অতিশয় অতিশয়োক্তি। দরবারীর পঞ্চমে স্থিত হবার বদলে এখন তার কানের পর্দায় আছড়ে পড়ছে একটা জলের কুঁজো ভাঙার আওয়াজ। আর কিছু প্রাণ বিদ্ধ করা শব্দযূথ—'তুমি যেও না মা, দাদা তোমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না।'

॥ ২৩ ॥

পরের বৃহস্পতিবার যখন বিবেকানন্দ পার্কে সারারাতের ফাংশনে জমজমাট আসরে সোহম এবং অপালা শুদ্ধ কল্যাণে গান ধরেছে, তখন রণো দু ঘণ্টার ওপর মেট্রোর তলায় সুমনের জন্য অপেক্ষা করে করে অবশেষে যাবার জন্য পা বাড়ালো। হঠাৎ সে দেখতে পেলো একটা ইমপোর্টেড কার এসে থামল, তার থেকে নীচে নেমে সুমনকে নামাল একটি বিজ্ঞাপনের মডেলের মতো দেখতে ছেলে। প্রথমটা সুমন তাকে দেখেও দেখল না। দু'জনেই ওরা মেট্রোর ভেতর ঢুকে যাচ্ছিল, হঠাৎ সুমন পেছন ফিরে বলল—'হাই রণো, তুমি এখানে? কতক্ষণ?' বলতে বলতে একটা চোখ ছোট করে টিপল সে, মুখে একটা দুষ্টু হাসি। সঙ্গের ছেলেটি পেছন ফেরেনি। সুমন তার হাত ধরে টানলো—তারপর রণোকে দেখিয়ে বলল—'মিট রণো, ওয়ান অফ মাই ব্লাইন্ড অ্যাডমায়ারার্স। রণো, দিস ইজ সঞ্জয়, বাবার পার্টনারের ছেলে, বম্বে থেকে এসেছে। মোস্ট প্রব্যাবলি উই আর গোয়িং টু বি এনগেজড সুন।' সঞ্জয় ছেলেটি রণোর দিকে ফিরেও দেখল না। বিড় বিড় করে একটা কী বলল, তারপর সুমনের পিঠে হাত দিয়ে—মেট্রোর ভেতরে ঢুকে গেল।

অনেক দিন পর এই বিশাল জনমণ্ডলীর সামনে বড় রাগ গাইতে পেরে সোহমের বুকটা ভরে ভরে উঠছে। তার অভ্যাস হঠাৎই দ্রুত লয়ের দিকে চলে যাওয়া, এটাকে অপালা তার ধৈর্য, বিলম্বিতে তার অজস্র সুরবৈচিত্র্য দিয়ে সংযত করে রেখেছে। অপালার গান আজ আকাশের মতো, যার ওপর দিয়ে বহু মেঘের, সূর্যোদয়, সূর্যাস্তের, চন্দ্র, তারকারাজির খেলা হয় আবার মিলিয়ে গিয়ে সেই গভীর নীল ব্যাপ্তি বেরিয়ে পড়ে। সোহমের গান যেন সমুদ্র। বারবার ফিরে যায়, বারবার সহস্র ব্রেকারে ভেঙে পড়ে। কখনোই একভাবে নয়। কখনও হামাগুড়ি দিতে দিতে ছুটে আসছে সুর, দূর থেকে একটা কলরোল আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, কখনও হুস্‌স্ করে এসে ফেনায় ভর্তি জলরাশি ছড়িয়ে গেল, তার সেই সুরের সমুদ্রের ওপর জ্যোৎস্নার আদিগন্ত রুপোলি ঝারির জল ছিটিয়ে দিচ্ছে অপালা 'মন্দরবা বাজো রে...' সোহম সেই জ্যোৎস্নার রাশি ফেনার কিরীটে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় জড়ো করছে। হলকের পর হলকে। খেয়ালের পর তরানা, আর তিলং ঠুংরি গেয়ে তার কতকগুলো জনপ্রিয় গজল ধরল সোহম, বহু অনুরোধ আসছে। 'ভজন অপালা দত্তগুপ্তর ভজন,' একদল চেঁচিয়ে বলে উঠল। অপালা দুটি মাত্র নিবেদন করলো—'না তীরথ মে, না মূরত মে, ম্যঁয় তো তেরি পাস মে,' আর 'সাধো সাধো মন কা মান তিয়াগো/কামক্রোধ সঙ্গত দুর্জন কী/ইন্ তে অহনিশি ভাগো।' বহু অনুরোধ-উপরোধেও সে আর কান দিলো না, গলায় কষ্ট হচ্ছে

জানিয়ে মাফ চাইল। দু'জনে মিলে আজ প্রায় চার ঘণ্টা পার করে দিয়েছে। আজ বাড়ি থেকে কেউ আসেনি। নানান কারণে।

সোহম গ্রীনরুমে এসে বলল—'অপু, তোর কর্তা কি একটু জেলাস হয়ে উঠেছেন আমার ওপর?'

অপালা বলল—'যাঃ।'

—'না যতগুলো প্রোগ্রাম একসঙ্গে করলাম, ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত বসে রইলেন, প্রতিদিন তোকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছেন। মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতেও থেকে থেকেই এসে পড়ছেন। আজই শুধু আসেননি দেখছি।'

—'তুই ভুলে গেছিস সোহম, আমার গান শুনেই উনি আমাকে পছন্দ করেছিলেন। উনি গান খুব ভালোবাসেন।'

—'আমি আসবার আগের প্রোগ্রামগুলোতেও এভাবে থাকতেন সারাক্ষণ!'

অপালা বলল—'তুই আসার আগে আর প্রোগ্রাম করেছি কই, অতি সামান্য।'

—'লেটস হোপ ফর দা বেস্ট, অপু, আমার কিন্তু মনে হয়, কিছু মনে করিস না, শিবনাথদাকে ওপর থেকে যতটা সরল বলে মনে হয়, ভেতরে উনি ততটা না।'

এ কথা অপালা জানে। সোহম বলল—'এই শাড়িটা তোকে কে দিয়েছে? গরদ?'

—'কে আর দেবে? উনিই। এই প্রোগ্রামটার জন্যে বিশেষ করে কিনে আনলেন। এটা গরদ নয়, কড়িয়াল।'

—'তাহলে আমার সন্দেহ ঠিকই। এডিনবরায় বৃন্দা বলে একটি মেয়ের সঙ্গে খুব ভাব হয় আমার। গজল ভীষণ ভালোবাসত। সারা ইংল্যান্ডে একরকম আমার ইমপ্রেসারিওর কাজ করেছে। তা তার হাজব্যান্ডও অবিকল এই রকম করতেন। অলদো হী হিমসেল্‌ফ্ ওয়াজ এ নাম্বার ওয়ান ডন জুয়ান।'

—'আমার স্বামী এরকম নয় সোহম। এভাবে বলিস না। আমার খারাপ লাগছে।'

—'সরি অপু, বৃন্দার স্বামীর পুরো চরিত্রটার সঙ্গে আমি শিবনাথদার তুলনা করতে চাইনি। আসলে বহু দেশের বহু মানুষের সঙ্গে মিশে মিশে আমি ঝানু হয়ে গেছি। আর অপু তুই এখনও সেই বিংশতিবর্ষীয়া বালিকাই রয়ে গেলি, সুরের আমি, সুরের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।'

অপালা বলল— 'ঠিকই বলেছিস। তোর মতো যদি মনের কথা মুখের ভাবে ফোটাতে পারতুম!'

—'আমি অন্তত প্রকাশ্য আসরে বসে ভাবাবেগে কাঁদি না অপু।'

অপালা মুখ নিচু করে ফেলল। সোহম এখন রাত শেষ পর্যন্ত গান শুনবে। অপালা কিছুতেই শুনল না, চলে গেল।

বাড়ি এখন নিঝুম। দরজা খুলে দিল টিটু। অপালা বলল—'রণো ফিরেছে!'

—'কখন! এখন সাড়ে বারোটা বাজছে মা!'

—'খেয়েছে ?'

—'বলতে পারবো না।'

—'কেন বলতে পারবি না ?' অসহিষ্ণু গলায় বলল অপালা।

—'আহা খেতে দেওয়া-টেওয়া ওসব ঠাম্মার ডিপার্টমেন্ট। আমি কি করে জানবো ? দাদার ধারে-কাছে আমি থাকি নাকি ? কথায় কথায় যা রেগে যায় ! একমাত্র ঠাম্মাই ওকে ট্যাক্‌ল্ করতে পারে।'

কম্বলের মধ্যে যখন ঢুকলো অপালা তখন রাত দেড়টা হবে। শিবনাথের রকম-সকম দেখে অপালা বলল—'প্লীজ, আজ আমায় ছেড়ে দাও। ভালো লাগছে না।' একে গেয়ে সে ক্লান্ত, তার ওপর রণোর জন্য সমস্ত মনটা ভার হয়ে আছে। শিবনাথ বললেন—'তা ভালো লাগবে কেন ? সোহম হলে হয়ত লাগত।'

অপালা পাশ ফিরে শুয়েছিল। প্রবল বিস্ময়ে এবং ব্যথায় সে উঠে বসল, সোহম তাহলে ঠিকই বুঝেছে। তার স্বামীকে তার চেয়ে সোহম বেশি চিনেছে। সে শিবনাথের শরীরের ওপর ঝুঁকে বলল—'কী বললে তুমি ?'

—'যা বলেছি তুমি শুনেছো, এক কথা দ্বিতীয়বার বলতে আমার ঘৃণা হয়।'

অপালা বলল—'যা বললে, দ্বিতীয়বার আর এ কথা উচ্চারণ করো না।'

শিবনাথ হতভম্ব হয়ে গেছেন। এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে অপালা কোনদিন কোনও কারণেই এরকম কঠিন, অনম্র সুরে কথা বলেনি।

তিনি মরিয়ার মতো বললেন—'যদি দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করিই তাহলে কী হবে ? কী করবে তুমি আমার ?'

অপালা বলল—'দেখতেই পাবে কী হবে ! শেষ কথা ঠিক কী তা কেউ বলতে পারে ?'

শিবনাথ হঠাৎ কেমন ভেঙে পড়লেন—'তবে, তুমি আজকাল আমায় এমন করে ফিরিয়ে দাও কেন ? জবাব দাও !'

অপালা বলল—'তোমাকে আমি চিরকাল ফিরিয়ে দিতে চেয়েছি। পারিনি। আমি ভদ্র বলে। তোমাকে আঘাত করতে আমার কষ্ট হয় বলে। প্রতিবাদ আমার আসে না বলে। কিন্তু তুমি, তোমার মতো এরকম শান্ত ধীর-স্থির দেখতে মানুষ, তুমি ... তুমি প্রত্যেকবার আমাকে নির্মমভাবে রেপ করো। আমি ছাড়া আর অন্য কোনও মেয়ে এ জিনিস বছরের পর বছর সহ্য করতো না। তুমি হয় ভালোবাসো না, নিষ্ঠুর স্বভাবের মানুষ, তোমার ভদ্র শান্ত মুখোশটা শুধু খুলে যায় আমার কাছে, যাকে তুমি চিরকাল বোকা, সরল, নিরীহ বলে উপেক্ষা করে এসেছো, আর নয়তো তুমি ... তুমি ভালোবাসতে শেখোনি।'

এতো কথা, এতো নির্মম কথা এভাবে অপালা কোনদিন কাউকে বলেনি। শিবনাথ বললেন—'তুমি শিখেছ ভালোবাসতে ? তুমি জানো ? তুমি তো একটা পাথরের টুকরোর মতো, একটা নিশ্চেতন জড় পদার্থের মতো !'

—'আক্রমণ করলে মানুষকে তার সমস্ত পেশী শক্ত করতেই হয়।'

—'তাহলে আগে বলোনি কেন ? কেন জানাওনি ? নিজে যদি জানো কী চাও, তাহলে কেন জানাওনি ?'

অপালা ক্লান্ত করুণ স্বরে বলল '—ভালোবাসা ঠুংরির মোচড়ের মতো, গজলের পুকারের মতো, সেতারের তরফের তারগুলোর ঝিনিঝিনি আওয়াজের মতো। তুমি গান এতো ভালোবাসো আর এইটুকু অনুভব করবে না, আমি কী করে জানবো বলো ?'

অপালার স্বর নির্জন মধ্যরাতের ঘরের মধ্যে বেহাগের পকড়ের মতো বাজতেই লাগল, বাজতেই লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। কিন্তু দুজনেরই ঘুম অগভীর। শিবনাথ স্বপ্ন দেখলেন— তিনি আকাশের ওপর দিয়ে ছুটছেন কাকে ধরবার জন্য, কিন্তু যেই কাছে পৌঁছচ্ছেন সে মিলিয়ে যাচ্ছে, কখনও সে যেন মিতুলের মতো, কখনও তাঁদের অফিসের একটি উত্তরপ্রদেশীয় মহিলা-অফিসার। কখনও সেটা এক টুকরো মেঘ। আর সারাক্ষণ পেছন থেকে মিশ্র কালেংড়ায় ঠুমরি গাইছে কে। তিনি গাইবার চেষ্টা করছেন পারছেন না। গলাটা মিতুলের মতো। অপালা স্বপ্ন দেখল—তার বিয়ে হচ্ছে। বুকের ভেতরটা অস্থির কান্নার দাপাদাপি। কার সঙ্গে যেন বিয়েটা হবার কথা ছিল। অথচ হচ্ছে না। সে দেখল বিয়ের পিঁড়ির ওপর সোহম দাঁড়িয়ে আছে। সেই বহুদিন আগেকার তরুণকান্তি সোহম। সোহম পরম মমতায় তার মুখের ওপর হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সে কাঁদছে। কিন্তু এটা যেন একটা ফিল্‌ম্। দর্শকদের মধ্যে খুব মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে রণো। 'রণো !' বলে একটা অস্ফুট চিৎকার করে জেগে উঠল অপালা। বাইরে পাখির কাকলি শোনা যাচ্ছে। ঘুম ভাঙা আধো-আধো স্বর। শিবনাথ অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। অপালাও পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল আবার। চোখ জড়িয়ে আসছে।

॥ ২৪ ॥

দশটা বেজে গেলেও যখন রণো নীচেও নামল না, দরজাও খুলল না। তার ঠাকুমা অস্থির হয়ে বললেন—'হ্যাঁরে রাগ বলে কি এতোই রাগ ! তোদের ভয়কেও বলিহারি। একটা এক পটকা ছেলে তার ভয়ে বাড়িশুদ্ধু ভিরমি যাচ্ছে। যা না একবার গিয়ে দরজা ধাক্কা দিয়ে দ্যাখ না। টিটু ! বনি !' বাবা কাকা দুজনেই অফিস বেরিয়ে গেছে। লাল চোখে অপালা ঘরের কাজকর্ম সারছিল। আজকে সে নিজেই উঠেছে ন টায়। রাঁধুনি ফোটানো চা দিয়ে গেছে সে স্পর্শ করেনি, বেসিনে ঢেলে দিয়েছে চুপিচুপি। দ্বিতীয়বার চাইতে লজ্জা করেছে। সে বলল— 'ঠিক আছে, আমি দেখছি।'

ছাতে এখনও মোলায়েম রোদ্দুর। একটু উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে। একটা শাল গায়ে জড়িয়ে অপালা ছাতে উঠে গেল।

—'রণো, এই রণো !' দরজার কড়া নেই। সে প্রাণপণে ধাক্কা দিতে লাগল। কোনও সাড়াশব্দই নেই। ডান দিকে একটা জানলা আছে। ছাতের এক কোণে চলে গেলে ঘরের ভেতরটা খানিকটা দেখা যায়। অপালা চলে গেল সেই কোণে। আয়নায় খাটের মাঝখানটার প্রতিবিম্ব পড়েছে। পুরো জামা-কাপড়-পরা একটি যুবকের ঊর্ধ্বাঙ্গ। সে কিরকম এলিয়ে পড়ে

ঘুমোচ্ছে। কোমরের দিকটা খাটের নীচের দিকে ঝুলছে। জেগে জেগে সাড়া না দিত একরকম। কিন্তু এতো ডাকাডাকি ধাক্কাধাক্কিতেও ঘুম ভাঙছে না। অপালার বুকের ভেতরটা ভয়ে কেমন আনচান করতে লাগল। বনি টিটু পাড়ার কয়েকটি ছেলেকে ডেকে আনলো। তারা কোণ থেকে ঘরের অবস্থা দেখে গম্ভীর মুখে বলল—'ভালো ঠেকছে না, দরজা ভাঙতে হবে।'

দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখা গেল কোনমতেই রণোর ঘুম ভাঙছে না। ঘাড়টা এলিয়ে এলিয়ে পড়ছে। মনোহর নাড়ি দেখলেন খুব ক্ষীণ। অপালা আর দাঁড়ায়নি। সে ছুটে গেছে নীচে।

সোহম আর একবার পাশ ফেরার চেষ্টা করছে, ফোনটা বেজে উঠল। বিরক্ত মুখে সোহম বলল—'সোহম চক্রবর্তী বলছি।'

—'সোহম, আমি অপু বলছি। রণো ঘুম থেকে উঠছে না কিছুতেই, দরজা ভাঙতে হয়েছে। সোহম, শিগগিরই।'

তড়িৎ গতিতে জামা গলিয়ে নিল সোহম। ঠিক পাশেই তার ডাক্তারবন্ধু থাকেন। তাকে ঘুম থেকে তুলে যখন পৌঁছল, তখন ওদিক থেকে অ্যামবুলেন্সও পৌঁছচ্ছে। 'তার চোখ উল্টে দেখেই ডাক্তার বললেন ইম্মিডিয়েটলি হসপিটাল। কিছু খেয়েছে। ...না বিষ টিষ নয়। মনে হয় কোনও বার্বুর্চ্যুরেট। দেখা যাক।'

সারা দিন গেল। যখন রাতও যায় যায় কপালে করাঘাত করে পারুলবালা বললেন—'যার মা জন্ম থেকে একবারও ফিরে দেখল না। তারের যন্তর আর পাখোয়াজ নিয়ে সারাটা জীবন নিজের খেয়ালে তা না না না করে কাটিয়ে গেল, রাত সাড়ে বারোটা একটায় মাথায় ফুল দিয়ে বাড়ি ফেরে তার ছেলের আর এর চেয়ে ভালো ভাগ্য কী করে হবে?' হাউ হাউ করে কাঁদছেন তিনি।

—'তখনই বলেছিলুম শিবু, আমাদের গেরস্ত ঘর, গেরস্ত বউই ভালো বাবা। তা কুহকে পড়লে কি আর কারো কোনও জ্ঞানগম্যি থাকে!'

হাসপাতালে শিবনাথ, সোহম, বিশ্বনাথ। অপালাকে আসতে দেওয়া হয়নি। কোনও মেয়েকেই না। কিন্তু ভোরের দিকে সবার অলক্ষ্যে অপালা বেরিয়ে পড়ল। সে আর টিকতে পারছে না। ভোরের ট্যাকসি কেন কে জানে ভদ্রমহিলাকে উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে চটপট পৌঁছে দিল। হাসপাতালের লাউঞ্জে বিশ্বনাথ ঢুলছিল, শিবনাথের চোখ লাল। সোহম পায়চারি করছে। অপালাকে শিবনাথই প্রথম দেখতে পেলেন।

—'তুমি! তুমি কেন এলে?'

সোহম বলল—'ঠিক আছে শিবনাথদা, ছেড়ে দিন, এসেছে যখন ...।'

একটু পরেই সিসটার এসে ডাকলেন এমার্জেন্সি এগারো নম্বর।

তিনজনেই একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। —'ভালো আছে, আউট অফ ডেঞ্জার। হী ইজ ভেরি টায়ার্ড। একজন কেউ যান।'

অপালা এগিয়ে যেতে নার্সটি বললেন—'আপনি মা?'

—'হ্যাঁ।'

—'যান। বেশি কথা বলবেন না।'

রণো এখন বিছানার সঙ্গে মিশে আছে। তার মুখ নীলচে কালো। হাতে

স্যালাইনের ছুঁচ। সামনে একটা টুল টেনে অপালা বসল। আস্তে ডাকল—'রণো!'

অনেক কষ্টে আস্তে আস্তে চাইল রণো— অপালা বলল—'এই দ্যাখ, আমি তোর মা। মা এসেছি। আমি তোর বন্ধু রণো। কোনও ভয় নেই। দুঃখ নেই। আমরা সবাই আছি। সব্বাই। তোর বোনেরা, বাবা কাকা, আমি, সোহম মামা, দাদু-দিদা, সব্বাই তোর পাশে। তুই একদম ভেঙে পড়বি না।'

নার্স এসে বললেন—'আর না।'

রণোকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিলে সোহম বলল—'ওর পক্ষে একটা চেঞ্জ অফ অ্যাটমসফিয়ার দরকার। একান্ত দরকার, শিবনাথদা। ও আমার কাছে থাকুক।'

শিবনাথ অবাক হয়ে বললেন—'তোমার কাছে? ওখানে তো কোনও মেয়েই নেই? কে নার্সিং করবে?'

—'ছেলেরাও ভালো নার্সিং করতে পারে, আপনার কোনও ভয় নেই।'

দাদু-দিদা প্রচণ্ড আপত্তি করছিলেন, সোহম স্থির গলায় বলল—'ইট ইজ কোয়াইট ক্লিয়ার ও এখান থেকে, আপনাদের কাছ থেকে চলে যেতে চেয়েছিল। ওকে আমার কাছে যেতে দিন। আই নো হাউ টু টেক কেয়ার অফ হিম।' রণোকে যখন জিজ্ঞেস করা হল তখন সে হ্যাঁ না, কিছুই বলল না। হঠাৎ যেন তার দুর্দান্ত জেদ, মেজাজ এবং ইচ্ছাশক্তি সব ফুরিয়ে গেছে।

সোহম তার খাটের পাশেই একটা খাট পাতিয়েছে। রণো তার ঘরেই থাকবে। পাশের বাড়ি থেকে ডাক্তার এসে প্রতিদিন দেখে যাবেন। অর্থাৎ গল্পচ্ছলে নাড়ি প্রেশার, মেজাজ সব দেখে যাবেন। বনমালী ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাবার আনছে, ফলের রস, চিকেন সুপ, দুধ, ছানা, পুডিং, স্টু। খুব মৃদুস্বরে কোনও বাজনা চড়ানো থাকে পাশের ঘরে, কখনও তা-ও না। রণো শুয়ে থাকে। শূন্য চোখে। সন্তুর বাজলে সে একটা ভারী আরামের ঘুম ঘুমোয়।

বাড়ি থেকে বোনেরা, ঠাকুমা, বাবা সবাই এক এক করে তাকে দেখতে আসেন। মা এলে আর উঠতে চায় না। বনি আর টিটু এলেই সোহম তাদের সঙ্গে নানারকম খেলা খেলে। দাবা, চাইনীজ চেকার, এসব তো আছেই, আরও নানা রকম বিদেশী খেলা আছে তার কাছে। একটা পি. সি. আছে। সেটা নিয়ে টিটু যা ইচ্ছে করে। কোনও বারণ নেই। একদিন সোহম বলল—'দেখি তোদের উচ্চারণ কিরকম দুরস্ত হয়েছে বল দিকিনি—'শী সেলস সী শেলস অন দা সী শোর।' খেলতে খেলতে বনি আগেই হারে, তারপর টিটু, তারপর সোহম।

—'কেন সোহমমামু তুমি সবসময়ে জিতবে?'

—'আরে বাবা আমি কত বছর ধরে সরগম সেধেছি, গানের বাণীর টুকরো নিয়ে বোলতান সেধেছি, আমার সঙ্গে তোরা পারবি কেন?'

হঠাৎ রণো দুর্বল গলায় বলল—'তাহলে মায়ের সঙ্গেই তোমার লড়াই চলুক।' অপালা চুপচাপ রণোর শিয়রের কাছে বসে থাকে। কখনও কখনও মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। যে কোনও ছুতোয় সে রণোর শরীরটা তার মুখ কপাল চুল একটু স্পর্শ করতে চায়। তার হাত ভীষণ নরম। যেন নতুন ওঠা

গাছের পাতার মতো কিম্বা ফুলের পাপড়ির মতো তার স্পর্শ। রণোর ভালো লাগে খুব। কিন্তু সে বলে না।

সোহম বলল—'অল রাইট, স্টার্ট অপু।' অপালা বলল—'থাক না।'

—'বাঃ থাকবে কেন?' দশ মিনিট হয়ে গেল তখনও সে বলে চলেছে নির্ভুল। রণো দুর্বল স্বরে আবার বলল—'দ্যাটস গুড। শুধু গান প্র্যাকটিস করে এতোটা পরিষ্কার উচ্চারণ, এতো তাড়াতাড়ি তোমরা করতে পারছো?'

সোহম বলল—'হ্যাঁ, আমরা আরও অনেক কিছু করতে পারি শুধু গান করি বলে।'

—'কি কি পারো?' ছেলেমানুষের মতো বলল রণো।

—'আমরা মানুষের মনের কথা বুঝতে পারি, দুঃখ ভুলতে পারি, ভোলাতে পারি, অসুখ ভালো করতে পারি।'

রণো মুখটা ফিরিয়ে নিল।

সোহম বলল—'ইন ফ্যাক্ট একবার তোর মা শুদ্ধু দিনের পর দিন গান শুনিয়ে আমাকে একটা বড় অসুখ থেকে বাঁচিয়ে তুলেছিল।'

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকালো রণো, বলল—'তাহলে আর ডাক্তারের দরকার কি? মা তো একটা চেম্বার খুলে বসলেই পারে। তুমি আর মা।'

সোহম বলল— 'আমি মানসিক অসুখের কথা বলছি।' অপালার চোখের ইঙ্গিতে টিটু বনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। শিয়রের কাছে নীরবে বসা অপালার অস্তিত্ব এখন রণো ভুলে গেছে। সোহমের সঙ্গে এখন তার ভীষণ ভাব। সোহমকে সে চোখের আড়াল করতে চায় না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে রণো বলল —'মনের কথা বুঝতে পারো!'

—'ম্যাজিশিয়ানের মতো পারি কি? তবে আমাদের অনুভূতি খুব সূক্ষ্ম হয়ে যায় রণো, কিছুটা আন্দাজ করতে পারি বই কি। যেমন বুঝতে পারি তুই প্রেমে-ট্রেমে পড়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলি।'

—'ইট ওয়জ নট ফর লাভ, ইট ওয়জ ফর হেট।' যথাসম্ভব শান্ত গলায় রণো বলল।

—'ওই হলো। লোকে বলে একটা আরেকটার উল্টো পিঠ।'

—'না, না, ঘেন্না, আমি মেয়ে জাতটাকেই ঘেন্না করি। ন্যাকা, কুটিল, চতুর বিবেক বলে কোনও বস্তু নেই। আই হেট দেম ইন অল ফর্মস।'

—'তোর বোধহয় একটা খুব বাজে মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল রণো, তাই এমন মনে হচ্ছে। আমারও একবার অমন হয়েছিল। বাট দ্যাট স্টেজ ইজ ওভার ফর মি, অ্যান্ড ইট উইল সুন বি ওভার ফর ইউ। লাইফ ইজ সো বিউটিফুল, অ্যান্ড উইমেন আর ভেরি ভেরি মাচ পার্ট অফ দ্যাট বিউটি।'

রণো বলল—'জানি। আমি জানি, জীবন খুব সুন্দর। বাট আই অ্যাম শাট আউট অফ ইট।'

—'কেন?'

—'কী আছে আমার? টিটুর মতো ব্রেন নেই। বনির মতো লাভলিনেস নেই মায়ের মতো গলা নেই। একটা অ্যাভারেজতম বাঙালির চেয়ে আমি এতটুকু একটা ভগ্নাংশ বেশি নয়। মায়ের রেকর্ডের রয়্যালটি দিয়েই হয়ত

জীবন কাটাতে হবে।'

—'তুই একেবারে এতোটা ভেবে ফেললি রণো ? কত বয়স তোর ?'

—'বাইশ। এটা কম বয়স হল। আর কবে কিছু করবো ?'

—'আরে চেষ্টাটা ঠিক ভাবে, ঠিক দিকে করতে হয়। আমরা তো আছি। একটা কথা বলি, একটা জীবন, মানে একটা সারাজীবন ধরে নে, তার প্রত্যেকটা মুহূর্ত কাজে লাগাতে হয়। কাজে লাগানো মানে শুধু শ্রম নয়, উপভোগও। দা জয়েজ অফ লাইফ আর বাউন্ডলেস।'

—'আমিও তো তাই-ই মনে করেছিলুম। সকলে যখন আমাকে দিনরাত পড়াশুনোর জন্য টিক টিক করতো আমি পারতুম না, বুঝতুম এ আমার ভালো লাগছে না। তাই বেরিয়ে যেতুম। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা মারতুম। আড্ডা উইথ গুড ফ্রেন্ডস একটা দারুণ রিক্রিয়েশন।'

—'ঠিকই বলেছিস। বাট সামহাউ ইট ডিডন্‌ট ওয়ার্ক। ইন ইওর কেস। তাই তো ? এখন যে বেঁচে উঠেছিস বুঝতে পারছিস তো লাইফ ইজ গ্রেটার দ্যান লাভ্ !'

—'ইয়া। দ্যাট কাইন্ড অফ লাভ। রানিং আফটার সামবডি লাইক ম্যাড।' রণো এবার অর্ধেকটা উঠে বসেছে। সে তার শিয়রের কাছে বসে থাকা মাকে দেখতে পেল।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল—'তুমি আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছ কেন ? উই আর টকিং অ্যাজ ওয়ান ম্যান টু অ্যানাদার।'

অপালা মৃদু গলায় বলল—'আমাকেও ম্যান বলেই ধরে নে না।'

কিন্তু রণো আর কিছুতেই কথা বলল না।

পরদিন তখনও রণো বিকেলে ঘুম থেকে ওঠেনি, পাখিদের কাকলি আরম্ভ হয়ে গেছে রাধাচুড়ো গাছটায়, অপালা এসে তার মাথার দিকে জানলায় পিঠ করে বসে রইল। সোহম বলল—'রণো, রণো, সন্ধে হয়ে যাচ্ছে খাবি না ?'

রণো বলল ঘুম জড়ানো গলায়—'দূর, তোমার ও দুধ আমার রোজ রোজ ভালো লাগে না।'

—'তবে কী খাবি ?'

—'কফি।'

—'কফি খেতে যে ডাক্তার বারণ করেছেন !'

—'তাহলে চা।'

চাও ডাক্তার দুবার খেতে বারণ করেছেন, কিন্তু সোহম নিজেই চা বানিয়ে নিয়ে এলো। সঙ্গে কিছু খাবার। রণো খাবারগুলো ছুঁলো না। শুধু চাটাই খেয়ে বলল— 'আহ্, কতদিন পর চা খেলুম !'

সোহম বলল—'তোর কি খুব চায়ের নেশা ছিল ?'

—'চায়ের নেশা মানে ? আমি তো চকচক করে দাদুর প্লেট থেকে চা খেয়ে নিতুম, যখন এইটুকু, কান্নাকাটি করলে ঠাম্মা আমার দুধের সঙ্গে চা মিশিয়ে দিত।'

—'মা বারণ করত না ?'

—'মা ? মা কোথায় ? ছোটবেলা থেকেই দেখছি দাদু ঠাম্মা ছাড়া আমার

কেউ নেই। মাকে খুঁজলেই দিদা বলত, তোর মা গান গাইতে গেছে। রেডিওতে মার গান হলে আমি বন্ধ করে দিতুম। কিম্বা সেখান থেকে যতদূরে পারি চলে যেতুম। মা আমাকে কখনও আদর করত না, বনিকে টিটুকে যেভাবে করত। মা আমাকে বাড়িতে একটা অনার্ড গেস্ট-এর মতো দেখত। আই ইউজ্‌ড় টু হেট মাই মাদার সোহমমামু, শী ওয়াজ দা সেন্টার অফ মাই হেট্রেড, ইনক্লুডিং হার মিউজিক।

সে উঠে বসে সোহমের মুখোমুখি হল। এবং পাশের দিকে চুপচাপ বসে থাকা অপালাকে দেখতে পেলো। ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে সে বলল—'তুমি? কখন এলে? দিস ইজ ভেরি আনফেয়ার মা।'

অপালা বলল—'তুই তো ঘুমোচ্ছিলি, উঠেই বকবক করতে আরম্ভ করে দিলি। আর শুনলেই বা। আমি তো তোকে বলেইছি আমি তোর বন্ধু।'

সোহম বলল—'অপু ঠাণ্ডা লাগিয়েছিস। এতো করে বলি তুই রোগা মানুষ ভালো করে গরম জামা পরবি! দাঁড়া। বনমালী, বনমালী!' বলে ডাকতে ডাকতে সোহম ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

রণো বলল—'আমার কথা শুনে তুমি নীডলেসলি কষ্ট পেলে তো!'

অপালা ধরা গলায় বলল— 'আমি কষ্ট পেতে পারি এ কথা যে ভেবেছিস তাইতেই আমার অর্ধেক কষ্ট কেটে গেছে। রণো, তুই খুব ছোট্ট হয়েছিলি তো! তুলোয় করে মানুষ করতে হয়েছিল অনেক সাবধানে। আমিও তখন ছোটই। তোকে হ্যান্ডল করতে পারতুম না। তোর ঠাম্মাই সব করতেন। তারপর তোর ওপর ওঁর এমন একটা মায়া পড়ে গেল যে আমাকে তোর কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। আদর শাসন কিছুই না। তুই আসলে ওঁদের অনেক কষ্টের একমাত্র শিবরাত্রির সলতে তো! আমি ওঁদের খুব ভয় পেতুম। তুই যত আদর চেয়েছিস, সব আজ পুষিয়ে দিই, হ্যাঁ?'

রণো খুব লজ্জা পেয়ে বললো—'কি যে বলো! আমি একটা ধেড়ে ছেলে!'

—'কিন্তু আমার ইচ্ছে করছে যে!' অপালা বলল, 'আমিও তো বঞ্চিত হয়েছি। তুই আমার প্রথম সন্তান, তোর জন্যে কত কান্না, কত উৎকণ্ঠা, কত স্নেহ, তোকে আদর করতে না পারার, শাসন করতে না পারার যন্ত্রণা!' বলে অপালা অনেকক্ষণ তার ঠাণ্ডা গাল ছেলের কপালের ওপর রেখে দিল। তারপর পরম স্নেহভরে দুই গালে দুটো চুমো খেল।

সোহম ঢুকে বলল 'অপু তুই এই কনকক্শনটা খেয়ে নে। তোর গলায় বেশ ঠাণ্ডা লেগেছে।'

কাপটা নিতে নিতে অপালা বলল—'কী জিনিস এটা?'

—'আমার ট্রেড সিক্রেট বলব কেন? নাজনীনের কাছে শেখা। গরম গরম খা, সিপ করে করে, গলায় একটু রাখিস।'

শিবনাথ এই সময়ে ঢুকে বললেন—'কী রণো? রণজিৎ? রণজয় রণবীর কেমন আছো?'

'ভালো বাবা।' শিবনাথের মনে হল 'বাবা' ডাকটা ছেলের মুখে অনেক দিন পর শুনছেন।

একটু চা-টা খেয়ে নিয়েই শিবনাথ বললেন—'অপু চলো।' অপালা

বলল—'রণো, আজ আসি।'

রণো অন্যরকম চোখে তাকিয়ে বলল—'কাল আসবে তো ? সকালে ?'

সোহমমামু, সকালে মার এখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা যায় না।'

'অনায়াসেই। তবে তোমার মার তুমি ছাড়াও আবার তিনটি সন্তান আছে কিনা।'

—'তিনটে ?' হঠাৎ হেসে ফেলল রণো, 'ও তুমি বাবার কথা বলছো ? বাবা তো কোন সকালে খেয়ে দেয়ে অফিস বেরিয়ে যায়। টিটু বনিও তো কলেজ যায়। মা তো তার পর আসতে পারে।'

—'তাহলে তোর সঙ্গে আমার ম্যান টু ম্যান কথাগুলো কখন হবে ?'

—'রাতে। মা চলে যাবার পর। মার সামনেও কিছু কিছু হতে পারে। খুব প্রাইভেটগুলো রাতে।'

সোহম বলল— 'অপু শুনতে পাচ্ছো।'

—'পাচ্ছি।'

—'তোমার কি মত ?'

—'কাল টিটু বনিকে কলেজ পাঠিয়ে আসবো।' বলে অপালা রণোর মাথায় আরেকবার হাতটা রেখে বেরিয়ে গেল। আর তখনই রণো বলল—'সোহমমামু, কী গান গেয়ে মা তোমায় ভালো করেছিল, কী অসুখ ?'

—'অসুখটা অনেকটা তোর ধরনেরই। ডিটেল কি আর এতোদিন পর মনে আছে। তবে কারণটা এক।'

—'সত্যি ? তোমারও এরকম মনের অবস্থা হয়েছিল ?'

—'হয়েছিল।'

—'কাটিয়ে উঠেছ ?'

—'অনেকদিন। তোর মার ওষুধে। মানে গানে।'

—'মা তাহলে খুব বড় জিনিয়াস বলো !'

—'শুধু জিনিয়াস নয়, রণো, তোর মা মানুষ হিসেবেও খুব উঁচুদরের।'

—'ওই গানটা আমাকে শোনাবে ? —'যে গানটা শুনে তুমি সেরেছিলে ?'

সোহম টেপ-ডেকটার কাছে গেল। তারপর মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি গাওয়া তাদের দরবারীর যুগলবন্দীর শেষ মহড়াটা চালিয়ে দিল। লো ভল্যুমে।'

অনেকক্ষণ বাদে শেষ হয়ে যাবার পর, যখন সে আস্তে আস্তে ক্যাসেটটা বার করে নিচ্ছে দেখল রণো ঘুমিয়ে পড়েছে। বড় শান্ত, বাচ্চা লাগছে তাকে।

সোহম পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বনমালীকে বলতে এখুনি যেন খাবার গরম না করে, খোকাবাবু উঠলে হবে, এমনসময়ে পেছন থেকে শুনলো রণো আবিষ্ট গলায় বলছে— 'ইটস ওয়ান্ডারফুল। এটাকে কি বলে মামু ?'

—'দরবারী কানাড়া।'

—'এই সেই সুর যা শুনিয়ে মা তোমাকে সারিয়ে তুলেছিল !' আপনমনেই বলছে রণো যেন নিজেকে শুধোচ্ছে।

—'এবার খাবি তো ?'

—'বেশি কিছু নয়, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।'

ঘরে বনমালী খাবার দিয়ে গেল, দুজনেরই। রণো খেতে খেতে বললো, 'ওসব কিছু নয়, বলো মামু ?'

—'কি সব ?'

—'ওই সুমনটুমন ? ওই মেয়েটা ?'

—'নথথিং। অ্যাবসল্যুটলি নাথিং। প্রায় প্রত্যেকের জীবনে এই ধরনের সংকট আসে। ইট ইজ সো কমন !'

—'আসলে কি জানো তো ? অপমানটা খুব লেগেছে !'

—'ওইরকম অপমান তোর ওই সুমন কাপুরকেও অনেক খেতে হবে। হয়েছে। নো বডি ইজ স্পেয়ার্ড।'

—'আসলে ওদের লাইফ-স্টাইল, ভ্যালুজ, সবই আমাদের থেকে এতো আলাদা। টাকা। টাকা। টাকা। জানো পকেটমানি নিয়ে কী করে ? রেসের মাঠে যায় রেগুলার। কোথা থেকে টিপ্‌স জোগাড় করে কে জানে। তারপর পকেটমানি, ডাবল ট্রিপল ... ওই করেই তো আমার ওর সঙ্গে আলাপ। রেসের মাঠে। আমাকে একটা দুর্দান্ত টিপস দিয়েছিল। পাঁচ হাজার তিনশ জিতেছিলুম। কিন্তু টাকার ব্যাপারেও কোনও দায়িত্ব নেই। নেচে কুঁদে, মদ খেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে !'

—'তাহলেই বোঝ !'

—'আচ্ছা মামু তোমরাও তো ব্যবসাদার। তোমার বাবা ব্যবসা করেন। কিন্তু ওদের টাইপের সঙ্গে তো তোমাদের কোনও মিল নেই। কেন ?'

—'দ্যাখ রণো, সব কথা বলতে পারবো না। কেন যে এতো তফাত। আমাদের ব্যবসাটা কয়েক পুরুষের। প্রেসের ব্যবসা। লেখাপড়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমার দাদারা সবাই কোন না কোনও পড়াশোনার চর্চায় আছেন। ঠিক টাকার পেছনে টাকারই জন্য দৌড়োনোর অ্যাটিচুড আমাদের কখনও ছিল না। তুই যাদের কথা বলছিস তারা নুভো রিশ্‌ টাইপ। ভারত ভাগের পর কিছু লোক সরকারি খয়রাতির সুযোগটা প্রচণ্ডভাবে লুঠে নিয়েছে, কিসের ব্যবসা, কি ব্যাপার—এ সবের ওপরেই নির্ভর করছে একটা পরিবারের কালচার, তার ভ্যালুজ।'

—'সোহমমামু, তুমি তো এতো দেশ-বিদেশ ঘুরেছো, এত খ্যাতি, এত টাকা, নিজের হাতে রোজগার করেছো, হোয়াই আর য়ু সো ডিফরেন্ট। আমার জন্য কটা ফাংশন বাতিল করে দিলে। বম্বে যাওয়া ক্যানসেল করে দিলে। 'গান করছো কিনা শুনতে পাই না। এতো কনসিডারেশন, স্যাক্রিফাইস, কেন তুমি এতো আলাদা ?

সোহম বলল— 'কেন ? কেন কে জানে ? হয়ত গানের জন্য। হয়ত তোর মায়ের জন্যও।'

—'মায়ের জন্যও ? কেন মামু ? ডোন্ট মাইন্ড, ডু ইউ লাভ হার ?'

সোহম প্রথমে কোনও উত্তর দিলে পারল না। রণো তাকে হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্ন করে বসবে সে ভাবেনি। কিন্তু এই ছেলেটিকে হতাশার হাত থেকে রক্ষা করতে, আত্মবিশ্বাস এবং জীবনে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার জন্য সে মনপ্রাণ দিয়ে এর সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করে চলেছে, এই প্রশ্নের আঘাত এখন

তাকে সইতেই হবে।

সে বলল—'ইয়েস রণো, অ্যান্ড নো। তুমি যে সেন্স-এ কথাটা ব্যবহার করলে ঠিক সে-সেন্স-এ লভ্ এটা নয়। আবার ঠিক ভাইবোনের ভালোবাসার মতোও এটা নয়। টু বী ট্রুথফুল রণো, তুমি যদি কোন রকম আর্টিস্ট হতে পেন্টার, রাইটার, স্কালপটার, অ্যাবাভ অল মিউজিশিয়ান, তাহলে তোমাকে বোঝাতে পারতুম সমধর্মীদের মধ্যে একটা খুব সূক্ষ্ম বোঝাপড়া থাকে। সবাইকার সঙ্গে যে সবাইকার হবে, তার কোনও মানে নেই। কারুর সঙ্গে কারুর হয়। সেতারের তার বাঁধার মতো, খাদের সাটা বাজালেই, চিকারিগুলো দেখবে ঝনঝন করে বেজে উঠছে। এই এক সঙ্গে বাজার ফলে সুরের একটা অনুরণন দুজনেরই মনের আবহাওয়ায় ছড়িয়ে থাকে। এটা হলো রণো, সেই লভ্। নট দ্য কাইন্ড ইউ ফেল্ট ফর ইয়োর গার্ল ফ্রেন্ড, নর হোয়াট ইয়োর ফাদার ফীলস ফর ইয়োর মাদার।' নিজেকে এভাবে বিশ্লেষণ করতে করতে সোহম যেন কেমন হয়ে যাচ্ছিল। অপালার প্রতি তার অনুভূতিকে সে কখনও এভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেনি। জীবনের প্রথম আঘাতে সাংঘাতিক আহত একটি তরুণের প্রশ্নের উত্তরে সে এই বিশ্লেষণটা এক্ষুনি এক্ষুনি করল।

খাওয়া শেষ করে সে আবার টেপডেকটার দিকে গেল। শুধ্ কল্যাণের যুগলবন্দীটা চালিয়ে দিয়ে সে বলল—'রণো, তুমি এটা যথাসাধ্য মন দিয়ে শোনো। আমি সুরে কী করতে চাইছি না বুঝলে তোমার মা এই সিকোয়েন্সগুলো করতে পারতো না। আমার পক্ষেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। এই বোঝাপড়া থেকে একটা অদ্ভুত অন্য প্রকৃতির ভালোবাসা জন্মায়। 'বলতে বলতেই সোহম আবার অনুভব করল তারা দুজন, সে আর অপালা তানপুরোর জুড়ির তার। আসলে তারা বোধহয় কিন্নরমিথুন, কোনও দেবতার অভিশাপে এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল। তার এই অনুভব একান্ত নিজস্ব। একথা সে স্বভাবতই রণোকে বলল না। অপুকেও কি কখনও বলবার সুযোগ আসবে ?

॥ ২৫ ॥

রণো ভালো হয়ে বাড়ি ফেরবার পর অপালা বলল ছাতের ঘরে রণোকে থাকতে হবে না। তারা চলে যাবে ছাতের ঘরে, রণো, দোতলায় মা বাবার ঘরে শুক। তার আসলে ভয় ছিল, ওপরের ঘরের ওই একটেরে নির্জনতা, এবং পরিবেশ, রণোর পুরনো ক্ষতগুলোকে আবার জাগিয়ে দিতে পারে। রণো বিনা প্রতিবাদে ব্যাপারটা মেনে নিল। আরেকটা পরিবর্তন হল বাড়িতে। বিশু এসে তার বাবাকে জানাল তারা আসছে মাসের প্রথম দিনে অর্থাৎ পয়লা এপ্রিল এ বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে। যোধপুর পার্কে ফ্ল্যাট কিনেছে। মনোহর ও পারুল হতভম্ব হয়ে চেয়ে আছেন দেখে বিশু জানাল এ বাড়ির আবহাওয়া তার স্ত্রীকে কোনদিনই সুট করেনি। সম্প্রতি রণোর ঘটনার পর সে এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। বিশেষত তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। এতদিন পর। তাকে সম্পূর্ণ শারীরিক ও মানসিক আনন্দের আবহাওয়ায় থাকতে বলেছেন ডাক্তার।

বিশু এবং জয়া বাড়ি ছেড়ে গেল। কিন্তু তাদের নিজেদের ব্যবহারের ঘর

দুটি তালা দিয়ে গেল। যোধপুর পার্কের ফ্ল্যাট যথেষ্ট বড়। তিনখানা বড় বড় ঘর, বিরাট হল, বারান্দা। ফিরে এসে মনোহর নিশ্বাস ফেলে পারুলকে বললেন— 'যার যা সাধ্য তা করুক না। মানা করছি না। কিন্তু একখানা ঘর অন্তত খুলে দিয়ে গেলে পারত। মেয়ে দুটো আর কতদিন ওইভাবে জড়োসড়ো হয়ে থাকবে!'

রণোর ঘরখানাই এখন প্রায় শিবনাথের পুরো পরিবারের বসবার ঘর হয়ে দাঁড়িয়েছে। রণো আজকাল তার বোনেদের সঙ্গে খুব মিশছে। আজ দাদু-দিদা শুতে চলে গেলে রণো হঠাৎ বলল— 'মা, তুমি ভেবো না। তোমাকে আমি ওইরকম কি ওর চেয়েও ভালো বাড়ি বানিয়ে দেবো।' অপালা ধরা ধরা গলায় বলল— 'বাড়ি আমার চাই না, তুই খুব স্বাস্থ্যবান, ভালো ছেলে হয়ে ওঠ।'

—'সোহমমামুর মতো?'

—'সোহমমামুর মতো কেন, তোর বাবার মতোও, তোর প্রদ্যোৎ মামার মতোও।'

এর পরের দিন সকালবেলায় শিবনাথকে ঠেলে তুলল অপালা, গলাটা তাকে দেখিয়ে ইশারায় বলল— 'আমার গলাটা বন্ধ হয়ে গেছে। একদম স্বর বেরোচ্ছে না। শিবনাথ বললেন— 'ও কিছু না, ঠান্ডা লেগে গেছে। আমি ডাক্তার দেখাচ্ছি ওষুধ খাও। ঠিক হয়ে যাবে।' দিন দশ পরেও যখন ঠিক হল না, তখন ডাক্তার বললেন সিঙার্স থ্রোট হয়েছে ওষুধ দিচ্ছি। তাতেও কিছু হল না। ভালো ই.এন.টি. বিশেষজ্ঞ নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললেন— 'কিচ্ছু পাচ্ছি না। কোনও নডিউল না, ল্যারিঞ্জাইটিস না, কিচ্ছু না।' শিবনাথকে আড়ালে ডেকে বললেন— 'আচ্ছা, উনি কি খুব ইমোশন্যাল, সহজে আপসেট হয়ে পড়েন?'

—'কই না তো!'

—'মনে করুন তো, খুব শকিং কিছু হয়েছে কি না সম্প্রতি।'

—'তা তো হয়েছেই। ছেলে প্রায় যেতে বসেছিল। একেবারে সুইসাইডের চেষ্টা।'

ডাক্তার সব শুনে বললেন— 'আমার মনে হচ্ছে জিনিসটা নিউরোটিক হিসটিরিক। টেনশন, শক ইত্যাদির ফল।' ওঁকে আনন্দে রাখুন, কোথাও থেকে ঘুরিয়ে আনুন। ওষুধ দিচ্ছি, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। হঠাৎ একদিন দেখবেন কথা বলছেন। ইন দা মীনটাইম, এ নিয়েও অর্থাৎ গলার এ অবস্থা নিয়েও কোনও উদ্বেগ বাড়িতে যেন প্রকাশ না হয়।

শিবনাথ পুরো পরিবার নিয়ে গোয়া ঘুরে এলেন। খুব আনন্দ করে বিভিন্ন বীচে ঘোরা হল। স্নান হল। তিন ভাইবোন খুব আনন্দ করল। শিবনাথ কনডাকটেড টুরের বাসে অপালার পাশে বসে প্রতি মুহূর্তে আশা করেন এই বুঝি সে এক কলি গেয়ে উঠল। তাঁর আশা পূর্ণ হয় না। মাঝে মাঝে শুধু বাইরের দৃশ্য দেখে অপালা ফিসফিস করে বলে— 'কী সুন্দর!' শিবনাথ ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে বলেন— 'আর কোথায় যাবে, বলো। নিয়ে যাবো!' সুতরাং তাঁরা মহাবলেশ্বর এবং বম্বে থেকে এলিফ্যান্টা দেখে আসেন। মুগ্ধ চোখ অপালার। মুখে ভাষা নেই, চোখ খালি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে

উঠছে। কিন্তু এতো দেখে শুনে বাড়ি ফেরবার পরও অপালা ভালোভাবে কথা বলতে পারল না। গান করা তো দূরের কথা। সে নীচের ঘরে গিয়ে কখনও আপনমনে তানপুরো ছাড়ে, কখনও স্বরমণ্ডলটা কোলে নিয়ে উদাস হয়ে বসে থাকে, কখনও হারমোনিয়ামে ঝড়ের মতো তান তোড়া তোলে।

শিবনাথ অফিস থেকে ফিরলে একটি বোবা মহিলা চা দিয়ে যায়। সবাই যখন একসঙ্গে খেতে বসে একজন বোবা বউ পরিবেশন করে। সোহম্ এসে গান ধরে, গজল, ঠুমরি, দাদরা। অপালার চোখ ভরে ওঠে। হঠাৎ হঠাৎ সে মুখ খোলে যোগ দেবার জন্য কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। রাত্রে এক আকাশ নীল বুকে নিয়ে ছাতের ঘরে দুজনে শুয়ে থাকে। শিবনাথ সন্তর্পণে, খুব নরম আঙুলে তার সারা মুখে মাথায়, শরীরে হাত বুলিয়ে দ্যান, অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে অপালা, কিন্তু শিবনাথ নিঘুম। ভাবছেন ডাক্তারের ডায়াগনোসিস ঠিক তো। ক্যানসার, ট্যানসার...। শিউরে উঠে শিবনাথ ভাবেন আর দেরি নয়। সোহমের সঙ্গে, প্রদ্যোতের সঙ্গে কথা বলতে হবে। প্রদ্যোৎ ফোনে তার মতামত জানিয়েছে আগেই। মেরিল্যাণ্ডের বাল্টিমোরে জন হপকিন্স হসপিট্যালের সঙ্গে সে কথাবার্তা বলছে, সেখানে যাবে না মিনেসোটায় মেয়োজ-এ যাবে—এ নিয়ে কথা চলছে। অনেকে পরামর্শ দিচ্ছেন, ব্যাঙ্গালোরে একবার নিয়ে যেতে। মস্ত বড় ই.এন.টি. স্পেশ্যালিস্ট জন ম্যাথুস রয়েছেন সেখানে।

॥ ২৬ ॥

মিতুলের মন আজ খুব খুশি। ভারত সরকার ওদের প্রথমে রাশিয়ায় যেতে বাধ্য করেছিলেন। রাশিয়ায় প্রধানত মস্কো ও কিয়েভে অনুষ্ঠান করে ওরা দারুণ সাফল্য পায়। বিষয় ছিল সমুদ্রমন্থন এবং মহাপ্রলয়। সমুদ্রমন্থনের বিপুল তরঙ্গের আলোড়ন থেকে উবশী উঠছেন, লক্ষ্মী উঠছেন এই দুটি ভূমিকাতেই নৃত্যাভিনয় করেছে মিতুল। সামান্য একটু সাজপোশাকের এবং মেকাপের বদলে এবং উন্নত আলোক শিল্পের মহিমায় কেউ বুঝতে পারেনি। যে লক্ষ্মী সেই উর্বশী। নারায়ণের লক্ষ্মীলাভের অংশটুকু শেখরণের সঙ্গে তার দ্বৈত নৃত্য। আবার শিবের কণ্ঠে বিষধারণেও শেখরণ। এখানেও সেই একই মেকাপের অদল-বদল এবং আলোর কায়দা। দুটি মিথ্ই রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করে বিলি করা হয়েছিল দর্শকদের মধ্যে। কিন্তু মিতুলের আসল লক্ষ্য ছিল পারী। পারী যাবার আগে রাশিয়া ছাড়াও ওদের যেতে হল রোমানিয়ায়। সেখানে ওরা মঞ্চস্থ করল 'চার-অধ্যায়'। এগুলোই ওদের আপাতত তৈরি হয়েছে। গতকাল লা বুফ দ্যু নর-এর বিখ্যাত মঞ্চশালায় সমুদ্রমন্থন ও মহাপ্রলয় হয়েছে আরও অনেক পরিণত। শেখরণ নিজেই বলেছে পার্ফেক্ট। 'মহাপ্রলয়ে' হুড় হুড় করে ভেঙে পড়া জলের দৃশ্যে, শুধু একটি মাত্র দৃশ্যে আলোর কেরামতির সাহায্য নিয়েছে। সেটি চমক, বৈজ্ঞানিক চমক, যদিও তারও সঙ্গে কুটোর মতো ভেসে যাওয়া মনুষ্য স্রোত ছিল। তাদের হাতের মুদ্রা, পায়ের কাজ, চোখের অভিনয় ছিল অসাধারণ। কিন্তু মহাপ্রলয়ের একটি

দৃশ্য তারা করেছে শিল্পীদের থাকে থাকে সাজিয়ে, তাদের আঙুলে ও মাথায় সমুদ্র সবুজ, ফেনশুভ্র, ছাই-ছাই রঙের বড় বড় রুমাল উড়িয়ে। উদয়শংকরের 'সামান্য ক্ষতির' আগুন-জ্বলে ওঠার দৃশ্য পরিকল্পনা থেকে শেখরণের মাথায় এসেছিল এ জিনিস। সেই সঙ্গে নানারকম পার্কাশন ইনস্ট্রুমেন্ট ও গং-এর বাজনা। এবং মিতুলের বাণীহীন সুরের আলাপ। 'সমুদ্রমন্থন' ওরা প্রথম দেখায়, তারপর 'মহাপ্রলয়', কারণ মহাপ্রলয়ের অভিঘাতের পর আর কিছু চলে না। আধুনিক সভ্যতার সব মিনার, সব যন্ত্র, অত্যাধুনিক পোশাক পরিহিত মানুষ, তাদের নানা ধরনের বিকৃতি, এমনকি সম্পূর্ণ নগ্নতাও তারা হাজির করেছে প্রথম পর্বে। তারপর আসে আকাশ থেকে মেঘ গর্জনে দৈববাণী। তাকে মানুষের ভাষা বা কণ্ঠ বলে বোঝার কোনও উপায় নেই। খালি বোঝা যায় এক ভৈরব আসছে। এ অংশটার রাশিয়া-পর্বে এতো উৎকর্ষ ছিল না। রিহার্স্যাল, রিহার্স্যাল, রিহার্স্যাল, শেখরণ, মিতশ্রী এবং অন্যান্য শিল্পীদের মহড়া চলেছে দিনের পর দিন, বাতানুকূল ঘরের মধ্যে ঘেমে চকচকে হয়ে গেছে সবাই। তবুও করেছে, করে চলেছে। তার ফল মিলল লা বুফ-এর প্রযোজনায়। মনে হচ্ছে এই নাট্যনৃত্য এখন বহুদিন ধরে চলবে। ভেঙে পড়ছে দর্শক, মফস্বল থেকে, অন্যান্য প্রদেশ থেকে। টিকিট না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে। ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে দর্শক আসছে। ইংলন্ড থেকে আমন্ত্রণ। কদিন পর মঁমাত্রের এক পেভমেন্টের কাফেতে শেখরণ এবং ওদের গ্রুপের আরও কিছু শিল্পীর সঙ্গে পারীর লোকজনের খুব আড্ডা চলছে। খালি মিতুল একটা কোণের টেবিলে বসে স্কেচবুক নিয়ে নকশা আঁকছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের নৃত্যের আরও নানা নকশা। একটি বৃদ্ধ, তালিমারা জামাকাপড় পরা দন্তহীন সাহেব, হয়ত ফরাসীই, এসে বিনা ভূমিকায় তার সামনের চেয়ারটাতে বসে পড়ল। লোকটাকে ভিখারির মতো দেখতে। মিতুল একবার চোখের কোণ দিয়ে দেখেই আবার নিজের নকশায় মনোনিবেশ করেছে। হঠাৎ মনে হল লোকটি বিড়বিড় করে তাকে কিছু বলছে। অনেক চেষ্টা করে সে উদ্ধার করল লোকটি বলছে 'ভোয়ালা মাদমোয়াজেল'। অর্থাৎ সে এবার কথাবার্তা বলতে চায়। মিতুল ফরাসীভাষার ন্যূনতম বাক্যগুলোও রপ্ত করতে পারেনি। তার আর যে প্রতিভাই থাক, ভাষা শেখার প্রতিভা নেই, যে প্রতিভা শেখরণের বিস্ময়কর। কাজ চালানো কয়েকটা বাক্য সে শিখে রেখেছে বটে, কিন্তু বললে ফরাসীরা বোঝে না, ফরাসীরা বললে সে বোঝে আরও কম। কাজেই বৃদ্ধ যখন তাকে ফরাসীতে জিজ্ঞাসা করলেন—সে ফরাসী বোঝে কি না। সে বিনা দ্বিধায় বলে দিল 'না'। তখন বৃদ্ধ ইংরেজি আরম্ভ করল। সে না-ছোড়। অনেক দূরের দিকে সে এক একবার তাকায় আবার তাকায় মিতুলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। অবশেষে সে বলল—'আই হ্যাভ এ স্ট্রং ফীলিং দ্যাত আই হ্যাভ সীন য়ু সামহোয়্যার।' মিতুল কাজে মগ্ন, সে তার ছবিতে টান টোন দিতে দিতে বলল—'আই অ্যাম অ্যান ইন্ডিয়ান, দিস ইজ দা ফার্স্ট টাইম আই অ্যাম ট্র্যাভলিং অ্যাব্রড, হাউ ক্যান ইউ সি মি ? আই ডান্সড লাস্ট নাইট অ্যাট 'লা বুফ', ইউ মে হ্যাভ সীন মি দেয়ার।' বৃদ্ধ বলল, না, সে লা বুফের প্রোগ্রাম দেখেনি। হঠাৎ সে প্রায় ভিক্ষে করার ভঙ্গিতে মিতুলের কাছ থেকে তার স্কেচ

বুক ও পেনসিল চাইল। মিতুল খুব বিরক্ত ভাবে যখন জিনিস দুটো এগিয়ে দিল, তখন কাফের আরেকপ্রান্ত থেকে তাদের বাঙালি বন্ধু অনীক হালদার এগিয়ে এসে বললেন-'মিতশ্রী, মিতশ্রী এই ভদ্রলোকটি এক অসাধারণ পেইন্টার। প্রতিকৃতি আঁকতেন, শুদ্ধু প্রতিকৃতি। শিল্পজগতের নানা নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উনি ভেড়েননি। বেচারি ভেসে গেছেন। এখানকার সবাই ওঁকে দয়া করে খাওয়ায়, সরকারি সাহায্যও উনি কিছু পান। কিন্তু সেগুলো যথেষ্ট নয়। ইনি খুব সম্ভব ভারতেও গিয়েছিলেন ছবি আঁকতে। দ্যাখো উনি নিশ্চয়ই তোমার একটা স্কেচ করছেন।'

এক পলক তাকিয়ে সত্যিই মিতুল দেখল স্কেচবুকের পাতায় দু-চারটে টানে তার নাক চোখ, চুলের ফের ফুটে উঠছে। সে বলল, 'ওঁর নাম কী?' 'পোল মাসো। অখ্যাত, অবহেলিত একেবারে।' ততক্ষণে বৃদ্ধ স্কেচবুক আর পেন্সিলটা মিতুলকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাতে বলিষ্ঠ রেখার আঁচড়ে মিতুলের আবক্ষ মূর্তি। যেমন সে কাঠের চেয়ারে বসে আঁকছে ঠিক সেইভাবে। বিড়বিড় করে 'মের্সি, মের্সি,' বলতে বলতে বৃদ্ধ ভিড় কাটিয়ে চলে গেলেন, মিতুলের ইচ্ছে থাকলেও তাঁকে কিছু খাওয়াতে পারল না। অনীক বলল 'অদ্ভুত যাযাবর লোক। হায়ত এখন আর পারীতেই থাকবে না। চলে যাবে পাহাড়ে, গ্রামে, রাস্তার ধারে শুয়ে শুয়ে ফুলের মেলা দেখবে। এই রকম স্কেচ-টেচ করে কিছু রোজগার করবে তা দিয়ে একটু রুটি, একটু পনীর আর একটু মদ।'

এর দিনকয়েক পর লুভ্‌র্ দেখে ফিরে এসে মিতুল একটা পার্সেল এবং একটা চিঠি পেলো। চিঠিটা রামেশ্বরের। তিনি জানিয়েছেন অপালার সহসা গলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। অত্যন্ত আকুল হয়ে জানিয়েছেন। নানা চিকিৎসা করেও উন্নতি হচ্ছে না। মিতুল কি এ বিষয়ে ভাববে? কিছু করবে? আর কোনও কথা নেই রামেশ্বরের চিঠিতে। তিনি কেমন আছেন। মিতুল কেমন আছে। তাদের প্রোগ্রাম কিরকম হচ্ছে। কিছু না। চিঠিটা শুধু একটা দীর্ঘ তীব্র মিড়, মুদারার কোমল রেখাব থেকে ষড়জ পর্যন্ত। প্রথমেই মিতুলের মাথাটা একদম গুলিয়ে গেল। প্রথম ভয়ংকর কথাটাই মনে হল—'ক্যানসার, ক্যানসার নয় তো!' সে সঙ্গে সঙ্গে এয়ার-লেটার বার করে উত্তর লিখল, সংক্ষেপে—'বাবা, অপালাদির খবর শুনে আমি বড্ড বিচলিত হয়ে পড়েছি। পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে, যত বড় ডাক্তার বা হসপিট্যালই হোক, যত টাকাই লাগুক যেন একটুও দেরি এবং দ্বিধা করা না হয়। আমি এদিক থেকে খোঁজ নিতে থাকছি। তোমার আমার জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে যা টাকা আছে তা থেকে এখন যত দরকার খরচ করো, আমি শিগ্‌গিরই ডলারের ড্রাফট্ পাঠাচ্ছি।

মিতুল।'

পার্সেলটার কথা তার মনেই ছিল না। শেখরণ ঘরে নক করে ঢুকল। সে কোনিয়াকের কথা বলেছে, এখুনি আসবে। বললো—লুভ্‌র্ দেখতে অন্তত এক মাস লাগবে আমার। মিতুল তুমি কি বলো।

মিতুল ভীষণ উদ্বিগ্ন মুখে চিঠিটা দেখিয়ে দিল। সে কথা বলতে পারছে না। চিঠিটা পড়ে শেখরণ মিতুলের জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে বলল—'এ

কি কাঁদছো কেন ? অসুখ করেছে। চিকিৎসা হবে।'

মিতুল ধরা গলায় বলল—'অপুদির নিশ্চয়ই ক্যানসার হয়েছে।'

শেখরণ বলল—'গলায় ব্যথা নেই, খাওয়া-দাওয়া করতে পারছেন। চেহারায় কোনও কষ্টের ছাপ নেই লিখছেন। আই ডোন্ট থিংক ইট ইজ ক্যানসার।'

মিতুল বলল—'বলছো ? সত্যি তোমার তাই মনে হচ্ছে ?'

শেখরণ বলল—'অফ কোর্স, এতো ভেঙে পড়ার কী আছে।' সে মিতুলের ভিজে চোখের ওপর সুদীর্ঘ চুম্বন দিল। কিন্তু মিতুল আজ মেতে উঠতে পারছে না। শেখরণ বলল—'মিতুল এ পার্সেলটা খোলোনি ? খোলো ?'

মিতুল বলল—'বাবাইয়ের চিঠিটা পাওয়ার পর আমার আর...'

নিজেই খুলে ফেলল শেখরণ পার্সেলটা। ওপরেই একটা খামের চিঠি। মিতুল খুলে পড়তে লাগল।

প্রিয় মিতুল,

ভেবেছিলাম এই দরকারি কাগজপত্রগুলো অপুর হাত দিয়ে তোকে দেওয়াবো। কিন্তু অপুকে এখন কিছুর মধ্যে জড়াতে ইচ্ছে করছে না। শোন, ক্যালিফর্নিয়ায় একটা প্রোগ্রাম করতে হয় আমাকে একটা ওল্ড পীপল্‌স্ হোম-এর জন্য, সেখানে আমার পূর্ণ পরিচয় দেবার পর আমি গান আরম্ভ করি। যেমন সর্বত্র করে থাকি। গান শেষে যখন চলে আসছি, তখন ওঁদের কর্তারা আমাকে জানান একজন জু ভদ্রমহিলা, ওখানকারই স্থায়ী বাসিন্দা আমার সঙ্গে বড্ড দেখা করতে চাইছেন। আমি যদি তাঁকে এবং তাঁদের বাধিত করি।

মিতুল, এই জ্যুয়িশ মহিলা খুব মৃদু আলোয় নিজেকে অন্ধকারে এবং আমাকে আলোতে রেখে বসেছিলেন। তিনি আমাকে খুব চমকপ্রদ একটি গল্প শোনান সেটি আমি তাঁর জবানিতেই তোকে শোনাচ্ছি : 'আমি জু নই। আমার নাম, প্রকৃত নাম, সিতারা। আমি বেনারসে এক বাঈজীর ঘরে জন্মাই। মা যখন আমাকে নাচ গানের তালিম দিয়ে তৈরি করে দিয়েছেন, এবং আমি আমার বাঈজী জীবন শুরু করে দিয়েছি, সেই সময়ে এক সাহেব কাস্টমারের সঙ্গে আমার ভারী আলাপ হয়ে যায়। সে কথায় কথায় জানায় সে আমাকে মডেল করে ছবি আঁকতে চায়, আমি রাজি হয়ে যাই। তার সঙ্গে আমি বেনারসের নানান জায়গায় ঘুরতে থাকি। এমনকি চলন্ত নৌকার বুকেও সে আমার ছবি আঁকতো। এবং যথেষ্ট টাকা দিত। এর নাম জাঁ পোল মাসো। এই ফরাসী চিত্রকরকে আমি ভালোবেসে ফেলি। মিতশ্রী এরই সন্তান। মা আমার সন্তান সম্ভাবনার কথা জানতে পেরে আমাদের মেলামেশা বন্ধ করে দ্যান। তিনি আমার গর্ভের সন্তান নষ্ট করে দেবার চেষ্টাও করেন। কিন্তু আমি আমার সঙ্গীত শিক্ষক কেদারনাথজীর কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করে আশ্রয় জোগাড় করি। ক্রমে হয়ে গেলাম কেদারনাথজীর স্ত্রীর মতো। মিতুল জন্মালো। মায়ের ভয়ে আমি বাড়ি থেকে বেরোতে পারতুম না। কেদারনাথ কথা দিয়েছিলেন। পোল-এর খোঁজ এনে দেবেন। দ্যাননি। সেখান থেকে অতএব পালালাম তোমার গুরু রামেশ্বরকে অবলম্বন করে, খোঁজ করতে

থাকলাম। তারপর ইমদাদ বিদেশ যাচ্ছে শুনে তার সঙ্গেই ভেসে পড়ি। এদের কাউকেই আমি আমার আসল উদ্দেশ্যর কথা বলিনি। কিন্তু সারা আমেরিকা ইয়োরোপ ঘুরেও আমি জাঁ পোল মাসোর দেখা পাইনি। সৌন্দর্য ছিল, নাচ-গানের শিক্ষা ছিল, অনেক উপার্জন করেছি। ভেবেছিলাম, যে বৃদ্ধাবাস আমাকে শেষ আশ্রয় দিল তাকেই ডোনেশন হিসেবে সব দিয়ে যাবো। কিন্তু এখন যখন নিজের সন্তানের খোঁজ পেয়েছি, তখন আমার যা কিছু সব তারই।'—মিতুল, তোর মা-বাবা দুজনেরই সন্ধান এনে দিলাম। এবার আমায় মাফ করবি তো।

সোহম্

চিঠিটা পড়ে মিতুল ঠিক একটা পাথরের মূর্তির মতো হয়ে গেল। তার শুকনো মুখ, স্তব্ধতা দেখে শেখরণ বলল—'এ চিঠিটা কার ? পড়তে পারি ?' মিতুল শুধু ঘাড় নাড়ল। চিঠি পড়া শেষ করে শেখরণ, অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর আস্তে আস্তে বলল—'মিতুল, তুমি বিধাতার এক অনবদ্য সৃষ্টি, ফরাসী চিত্রকর তোমার পিতা, কাশীর দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যসম্পন্ন নৃত্যগীত-পটিয়সী রূপসী তোমার মাতা, তোমাকে পালন করেছেন অসাধারণ গীতকোবিদ কেদারনাথ চৌবে আর রামেশ্বর ঠাকুর, তুমি সত্যিই উর্বশী। এসো মিতুল আমরা লক্ষ্মী নারায়ণের মহড়াটা আজ কমপ্লিট করি। করবে না ?' মিতুল খুব অনিচ্ছুক ভাবে আস্তে আস্তে উঠল। তারপর ঘরের মাঝখানে খুব ধীর গতিতে তার পদসঞ্চার আরম্ভ হলো। মুদ্রাগুলি অনেক সময় নিয়ে বন্ধ হচ্ছে খুলছে, যেন এক একটা ফুল সূর্য ওঠার সময়ে খুব আস্তে সবার অলক্ষ্যে ফুটে উঠছে আবার সূর্যাস্তের পর খুব আস্তে সবাব অলক্ষ্যে মুদে যাচ্ছে। ব্যালের অনুকরণে যেখানে শেখরণ তাকে উঁচুতে তুলে ধরে, সেখানেও সে এইরকম দীর্ঘায়িত ছন্দের ভঙ্গিমা হয়ে রইল। নাচ শেষ হলে, শেখরণ বলল—'আজ একটা নতুন আইডিয়া এলো। লক্ষ্মী নারায়ণের নাচটা করতে করতে হঠাৎ আমরা এরকম স্লো-মোশন হয়ে যাবো। অদ্ভুত হবে।'

মিতুল কোনও কথা বলল না। পার্সেলের বাকি অংশগুলো এবার সে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। অনেক বিবর্ণ ফটোগ্রাফ। কিছু স্কেচ, একটি নূড, সবই তার মতো দেখতে একটি তরুণীর। ফটোগ্রাফগুলির ভেতর থেকে শনাক্ত করা যায় একটি তরুণ স্পর্শকাতর বিদেশী মুখ, সুন্দর, খুবই সুন্দর। তার সঙ্গে কদিন আগে দেখা ওই জীর্ণ-শীর্ণ ভিখারি আর্টিস্টকে মেলানো যায় না। উইলের কপি রয়েছে ভেতরে। রয়েছে তার মায়ের বিভিন্ন সময়কার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি।

শেখরণ বলল— 'সর্বাগ্রে তোমার খোঁজ করা দরকার তোমার মার।' মিতুল এখনও কোনই কথা বলছে না।

পরদিন শেখরণই পার্সেলে প্রদত্ত ঠিকানার ফোন নম্বরে যোগাযোগ করে জানল— বৃদ্ধা মিশেল ক্রেয়ার্স মাস তিনেক হল মারা গেছেন। যা কিছু আইনগত কাজ কারবার আছে সেগুলি মেটালেই মিতশ্রী ঠাকুর পেয়ে যাবে মিশেল ক্রেয়ার্সের সঞ্চিত অর্থ সুদে-আসলে সতের লক্ষ ডলার।

খবরটা পাওয়ার পর মিতুল আস্তে আস্তে বলল— 'এই টাকাটা ওই শিল্পী

জাঁ পোল মাসোকে দিয়ে দেওয়া যাক।'

শেখরণ বলল— 'উনি মদ খেয়ে ও টাকা ওড়াবেন। ওঁর জন্য কিছু টাকার ব্যবস্থা আমরা অনীকের সঙ্গে আলোচনা করে করতে পারি। কোনও না কোনওদিন তো উনি মঁমাত্রের ওই কাফেতে আসবেনই। অপালাদির চিকিৎসার জন্য খরচও এর থেকে করা যায়।'

মিতুল বলল— 'না। অপুদির চিকিৎসার খরচ আমার। এ টাকা দিয়ে অন্য কিছু করার প্ল্যান করো।'

॥ ২৭ ॥

শিবনাথের ঘুমটা মাঝরাতে ছাঁত করে ভেঙে গেল। রিস্ট ওয়াচটা পাশেই থাকে। তুলে দেখলেন রাত তিনটে বেজে পাঁচ ছয় মিনিট হয়েছে। তার পরেই তাঁর খেয়াল হল অপালা বিছানায় নেই। ধড়মড় করে উঠে বসলেন শিবনাথ। ছাতে এসে ডাকলেন 'অপু! অপু!' এপ্রিল মাসের আকাশ। ঝড়ো হাওয়া দিচ্ছে। আকাশে ফুটফুট করছে তারা। তাঁর ডাক হাওয়া ছাতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গেল 'অপু! অপু!' একবার মনে হল ডানদিকের অন্ধকার অংশটার পাঁচিলের কাছে কে দাঁড়িয়ে আছে। অপুর কি ঘুম ভেঙে গেছে। ছাতে এসে হাওয়া খাচ্ছে। এরকম হতেই পারে। ওর আজকাল ঘুম ভালো হয় না। কাছে গিয়ে দেখলেন না প্যারাপেটটার ওপর কি রকম আলো অন্ধকারে একটা নারীমূর্তির মায়া সৃষ্টি হয়েছিল। শিবনাথ পাগলের মতো পাঁচিলের এদিকে ওদিকে ছুটে যেতে লাগলেন, অনেকটা ঝুঁকে পড়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন রাস্তায় কোথাও কোনও থেঁতলানো শবদেহ পড়ে আছে কি না। ভয়ে তাঁর বুকের শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। না, নেই। তিনি আস্তে আস্তে দোতলায় নামেন। সব চুপচাপ। ঘরগুলো ভেতর থেকে বন্ধ। শুধু রণোর ঘরের পর্দাটা উড়ছে। সে দরজা বন্ধ করে ঘুমোতে পারে না। শিবনাথ ছেলের ঘরে ঢুকলেন। অপুর কি হঠাৎ ছেলের জন্য মন কেমন করে উঠেছে? সে কি মাঝরাতে নীচে এসে শুলো। না। রণো একটা বালিশ মাথায়, একটা বালিশ পায়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোচ্ছে। শিবনাথ নীচে নামতে নামতেই বুঝতে পারলেন গান-ঘরে আলো জ্বলছে। উঠোনের ওপর গিয়ে পড়েছে ঘরের আলো। ঘরের বাইরে থেকেই তিনি দেখতে পেলেন যে লম্বা নিচু চৌকিতে তানপুরো থাকে, অপালা তার সামনে বসে নিচু হয়ে কী করছে। তিনি তাকে পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছেন। তানপুরাটা তার বিঁড়েশুদ্ধু পাশে শোয়ানো। পেছন থেকে আস্তে আস্তে ঢুকলেন শিবনাথ। অপালা টের পেলো না। সে ঝুঁকে খুব মন দিয়ে কি করছে! শিবনাথ দেখলেন, সেই চৌকির ওপর সে বনির চার্টপেপারগুলো পর পর সাজিয়েছে, কাগজ চাপা দিয়ে সেগুলো শোয়ানো, চৌকিবন্দী। অপালার হাতে তুলি পাশে প্যালেটে রঙ। তিন চারখানা চার্টপেপার জুড়ে সে মন দিয়ে একটা বড় সাইজের অখণ্ড ছবি আঁকছে আপনঁ মনে। শিবনাথ দেখলেন পট জুড়ে শুধু ডানদিক থেকে বাঁদিকে বয়ে গেছে নানা রঙের বর্ণিল ঢেউ। কখনও বিভিন্ন

বর্ণের ঢেউগুলি মিশে আছে, কখনও আলাদা হয়ে যাচ্ছে। কখনও ঢেউ কুঁচির আকার নিয়েছে, কখনও তালগোল পাকিয়ে যেন ঘুরছে। ঢেউগুলি যেন নিজেদের মোচড়াচ্ছে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কম্পনে এসে আবার বিভক্ত হয়ে চলে যাচ্ছে। শিবনাথ ডাকলেন 'অপু ! অপু ! কী করছো ? তাঁর গলা কাঁপছে। অপালা চমকে ফিরে তাকালো, তার মুখে এরকম অদ্ভুত হাসি শিবনাথ কখনও দেখেননি। সে ফিসফিস করে বলল— 'বুঝতে পারছো না, না ? কিচ্ছু বুঝতে পারছো না ? দরবারীর আলাপ করছি। এই দেখো এইগুলো মিড়, এই যে উদারার কোমল নিখাদ থেকে মুদারার কোমল গান্ধার পর্যন্ত একটা মিড় টেনেছি, কোমল গান্ধারে দেখো দুলছি অনেকক্ষণ, ঋষভ ছুঁয়ে এবার সায়ে ফিরে আসছি। এইবারে উঠছে এখানে দেখো মা পা কোমল ধা কোমল নি মুদারার সা ! আলাপের থেকে আমি গানের বন্দিশ আলাদা করতে পারছি না কিছুতেই। দেখো তানগুলো কিভাবে এসে গেছে, এই ছোট ছোট ছুট। চার আবর্তন তান করে এই দেখো সোমে ফিরলাম। এইবার আবার আরম্ভ করব একটা...' শিবনাথের চোখ ছলছল করছে। তিনি অপালার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন— 'অপু তোমার গলা আবার ঠিক হয়ে যাবে, ফিরে আসবে, তুমি আবার গাইতে পারবে। কেন এমন করছো ? আমি আর সোহম তোমাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হাসপাতালে নিয়ে যাবো। আমরা আছি তো !'

অপালা তেমনি ভাঙা ভাঙা ফিসফিসে গলায় বলল— 'গাইতে না পেরে আমার দম আটকে আসছে গো ! তাই গাইতে বসেছিলাম। তুমি একটু দূর থেকে দ্যাখো, এই সমস্ত আলাপচারি জুড়ে কিন্তু আমি, অপালা, একটা মেয়ে গাইছি এটাও আছে। মানে আমি নয়, আমার ভেতরের যে মানুষটা গান গায়। আমার ভেতরটা। সেটা।'

শিবনাথকে দেখতেই হলো। সত্যিই অপালা দেখিয়ে দেবার পর মনে হল তিনি এই অজস্র রঙের ঢেউয়ের মধ্যে শায়িত, খুব লীলায়িত, অনেকটা তানপুরার মতো গুরু নিতম্বিনী তন্বী একটি তন্ময় নারীমূর্তি বা বলা যায় নারী ভাবনা, নারী-ভঙ্গি দেখতে পাচ্ছেন। চোখ কান হাত পা কিছুই নেই। শুধু একটি তরঙ্গিত ভঙ্গিমা।

অপালা বলল— 'এখনও শেষ হয়নি, শেষ হলে বুঝতে পারবে। শিবনাথ সেইখানে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। রাত্তির তাঁকে ফিসফিসিয়ে বলতে লাগল— 'আমি... আমি কিন্তু গান ছাড়া কিছুকেই তেমন করে ভালোবাসতে পারি না।' রাত্রির দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনালো সেই বহুকাল আগে বলা কথার নির্যাস। তার ছবিতে শেষ টান না দিয়ে অপালা উঠবে না। দীর্ঘ চার-পাঁচ ঘণ্টাও এক আসনে বসে থাকবার অভ্যাস তার আছে। যখন শেষ পর্যন্ত শেষ হল তখন নটা বেজে গেছে, ঘরের সামনে ভিড় জমে গেছে। টিটু বনি, রণো, তাদের দাদু, দিদা। পারুলবালা, হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলেন— 'হে ভগবান, তুমি এমন কেন করলে ? মা ভবতারিণী যা চাও দেবো মা, আমার বউমার গলা ফিরিয়ে দাও মা। এমনি করলে ও যে আমার পাগল হয়ে যাবে গো !'

টিটু ঠাম্মার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল— 'ঠাম্মা চুপ করো। চুপ করো প্লীজ। এটা মড়া কান্নার সময় নয়।' সে, একমাত্র সে-ই অনুভব করছিল, সে

আজ একটা দুর্লভ, অতি-দুর্লভ প্রায় দৈবী মুহূর্তের জন্ম দেখতে পাচ্ছে।

॥ উপসংহার ॥

বিদ্বজ্জনেরা বলে থাকেন একমাত্র দুর্বল উপন্যাসেরই উপসংহার বা এপিলোগ থাকে। এপিলোগ প্রমাণ করে লেখক তাঁর বক্তব্য উপন্যাসের পরিসরে বলে উঠতে পারলেন না। কিন্তু টলস্টয়ের মতো বিশ্ববরেণ্য ঔপন্যাসিককেও তাঁর এপিক-উপন্যাস 'ওয়র অ্যান্ড পীস'-এর শেষে উপসংহার যোজনা করতে হয়েছিল। বিশ্বের অনেক জ্ঞানীগুণী সমঝদার ব্যক্তি এর বিরূপ সমালোচনা করেছেন। আবার অনেক সমানভাবে জ্ঞানীগুণী সমঝদার ব্যক্তি এর নান্দনিক কৈফিয়ত দিয়েছেন। আসল কথা প্রাত্যহিক জীবনের শুধু দিনযাপনের ধারা যে খণ্ড সময়ের কখনও মহিমময়, কখনও প্রলয়ংকর, কখনও রোম্যান্টিক পদক্ষেপকে মুছে ফেলে অসামান্য সামান্যতায় বয়ে চলে এই উপলব্ধি টলস্টয়ের মতো মহান শিল্পীও তাঁর সমুদ্রপ্রতিম উপন্যাসের বিশাল ব্যাপ্তিতে প্রকাশ করতে পারেননি। কিংবা তাকে সচেতনভাবে মূল উপন্যাস থেকে আলাদা রাখতে চেয়েছিলেন। আমি ঠিক উপন্যস লেখার জন্য কলম ধরিনি। তবু হয়তো দ্বিতীয় কারণেই উপসংহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। আমার মা-এর জীবন এই ক'বছর ধরে আমাকে শুধু ভাবিয়েছে আর ভাবিয়েছে। অসম্ভব সে চাপ আমি সহ্য করতে পারিনি। তাই এই জীবনকাহিনী।

ন জানমি দানং, ন চ ধ্যানযোগম্
ন জানামি তন্ত্রং, ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগম্
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা 'জননী।'

আমি গানের লোক নই। তার ন্যাস জানি না। তন্ত্র-তন্ত্রীর কিছুই জানি না। পূজাও জানি না। মন্ত্রও জানি না। আমার জননীর আমার ওপর যে বিপুল অভিঘাত তাকেই প্রায় সম্বল করে এগিয়েছি। সাহায্য নিয়েছি বহু ডায়েরি, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্বীকারোক্তি, টেপ, নিজের প্রত্যক্ষ দর্শন এবং সর্বোপরি কল্পনার।

উপরিউক্ত ঘটনার কয়েক মাস পর যখন তাঁকে মেরিল্যান্ডের জন হপকিন্স-এ নিয়ে যাবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ, সেই সময়ে আমার মা একরকম বিনা আড়ম্বরে মারা যান। রাত্রে শুতে গেলেন, সকালে আর উঠলেন না। তাঁর মুখে কোনরকম যন্ত্রণার ছাপ ছিল না। সাধারণত শবদেহের মুখে যে শিথিল প্রশান্তি থাকে তা নয়। তার চেয়ে বেশি কিছু। আমার তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি যেন এতদিনে তাঁর নিজের ঘরে, নিজের মায়ের কোলে জন্মালেন। এক বিরাট শিশুর মতো। সেই আনন্দের বিভা তাঁর মুখে ছড়িয়ে রয়েছে। সেই মৃত্যুর দৃশ্যে এতো গরিমা ছিল যে আমরা কাঁদতে ভুলে গিয়েছিলাম। রামেশ্বর ঠাকুর যাঁকে আমরা গানদাদু বলে ডাকতাম তিনি এসে মায়ের মাথা স্পর্শ করে গীতাপাঠের ভঙ্গিতে বললেন— 'কণ্ঠ থেকে বৈখরী,

হৃদয়ে মধ্যমা, স্বাধিষ্ঠানে পশ্যন্তী, তার পরও গভীরে চলে গেলে নাদ আর মনুষ্যকর্ণে ব্যক্ত থাকে না। তা পরা-বাক, পরা নাদ হয়ে যায়। সুরলোকের পথে চলতে চলতে কোনও অন্যমনস্ক দেবগন্ধর্ব যদি এই মর্ত্যভূমিতে এসে পড়ে তার কষ্টের শেষ থাকে না। সে যা দেবার দিয়ে যায়, দিতে চায়, কিন্তু আমরা মানুষ এমন কি মনুষ্যগন্ধর্বরাও তার কতটুকুই বা বুঝতে পারি! সে ঐশী বস্তু ধরে রাখি এমন সাধ্যই বা আমাদের কই?'

মা তাঁর কণ্ঠ হারাবার পর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অজস্র ছবি এঁকেছিলেন। আমরা মার জন্য বাজার চুঁড়ে শ্রেষ্ঠ কাগজ, পেনসিল, রং ও নানা নম্বরের তুলি কিনে আনতাম। মার সব ছবিই ছিল গানের ছবি। তাতে রঙ, শুধু রঙের প্রাধান্য। কখনও ঢেউয়ের মতো। কখনও বর্তুলাকার, কখনও খাড়া খাড়া আরও কত আকারের কত বিভিন্ন বর্ণছায়ের রঙ। কখনও পটময় রঙ ছিটিয়ে ছিটিয়ে অদ্ভুতভাবে সেগুলো যুক্ত করতেন। তিনি নিজেই ছবিগুলোর নামকরণ করতেন। 'আলাপ মালবকৌশিক।' 'মধুমাধবী সারং।' 'সরোদে হংসধ্বনির জোড়', 'পগ্ ঘুঙরু বাঁধ মীরা নাচি রে', সোহমের হলক, 'ম্যায় গিরিধারীকে ঘর জাঁউ।' অজস্র অজস্র। সেই অদ্ভুত ভাঙা-ভাঙা ফিসফিসে গলায় আমাদের বোঝাতেন 'এটা মীরার নাচ বুঝতে পারছিস না? মীরার নাচ! নীল রঙগুলো কি রকম তোড়ে ঘুরছে দ্যাখ? তলার দিকটা টকটকে লাল। নাচতে নাচতে মীরার চরণ রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে।'

মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর ছবির একটা প্রদর্শনী করি আমরা। সোহমমামার উদ্যোগে। কোনও কোনও ছবি দেখে এখানকার গুণীরা মুগ্ধ হন। যে চিত্রশিল্পী নয় তার হাতে রঙের এমন বলিষ্ঠ ব্যবহারও এরকম হার্মনি, মেলডি, ড্রয়িং-এর এমন সাবলীলতা তাঁরা আশা করেননি। আমি জানি না। খালি ছবিগুলো দেখতে দেখতে আমি একেবারে মগ্ন হয়ে যেতাম এবং প্রায় প্রত্যেক ছবির রেখায়িত বর্ণোদ্গারের মধ্যে আমি একটি নারীমূর্তি আবিষ্কার করতাম। কখনও সে পটের নানা জায়গায় নানা বিভঙ্গে ছড়িয়ে আছে, কখনও তা নদীস্রোতের মতো বহতা। কখনও বা একটা বিভোর তম্বুরা যার থেকে শিল্পীকে আলাদা করা যায় না। সোহমমামার ধারণা এইগুলো মায়ের নিজের প্রবেশ তাঁর শিল্পের মধ্যে। গানের সঙ্গে তাঁর অভিন্নতার অভিজ্ঞান। মীরা, কবীর, তুলসীদাস যেমন 'তুলসীদাস অতি আনন্দ', 'কহত কবীর শুনো ভাই সাধো।' ইত্যাদি বলে ভজনটিকে নিজের নামাঙ্কিত করে দিতেন, চিত্রকলার ভাষায় অনুস্যূত এই নারীবিগ্রহও অনেকটা তাই।

মিতুলমাসি ছবিগুলি দেখে সঙ্গে সঙ্গে প্যারিসে একটি প্রদর্শনীর জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। মিতুলমাসি ও শেখরণের চেষ্টায় অবশেষে যখন প্যারিসে প্রদর্শনী হল তখন সেখানকার গুণী শিল্পীরা এবং শিল্প মোদীরা অভিভূত হয়ে যান। এবং প্রায় অকল্পনীয় মূল্যে ছবিগুলো বিক্রি হয়ে যায়। কেউ বললেন, ফোবিজ্‌ম্, কেউ বললেন সুররিয়্যালিজম, বেশির ভাগই বললেন, অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজমের এমন প্রকাশ তাঁরা আর দেখেননি। ছবিতে নাকি সংগীত তার সমস্ত অঙ্গ নিয়ে অর্থাৎ সুর, তাল এমনকি নৃত্য পর্যন্ত নিয়ে মূর্ত। শুধু একটি ছবি যা মা প্রথম এঁকেছিলেন এবং বারবার আঁকতেন

যেন এঁকে এঁকে তৃপ্তি হত না সেই 'দরবারী কানাড়া'র ছবিগুলো আমরা বিক্রি করিনি। আরও কিছু রয়ে গেছে সোহমমামা ও মিতুল মাসির কাছে।

আমি আমার মাকে জীবনে কিচ্ছু দিতে পারিনি। একজন মেয়ের যেমন মাকে ভীষণভাবে প্রয়োজন হয়, একজন মায়েরও তেমনি মেয়েকে সাংঘাতিকভাবে প্রয়োজন। আমি তাঁকে দিয়েছিলাম শুধু প্রতিরোধ, উদাসীনতা এবং মাঝে মাঝে একটু মনোযোগের ভিক্ষা। তিনি আমার কাছ থেকে কিচ্ছু চাননি। শুধু চেয়েছিলেন তাঁর কণ্ঠের যে উত্তরাধিকার আমি জন্মসূত্রে পেয়েছি তারই যেন চর্চা করি। আমি তাঁকে সেটুকুও দিইনি। দিইনি কারণ আমাদের পূর্ব প্রজন্ম অর্থাৎ দাদু-ঠাকুমা এঁরা মায়ের সঙ্গীতজীবনকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্য এবং সন্দেহের চোখে দেখতেন। আমার ধারণা ছিল গানের চর্চা করলে আমিও অমনি অবজ্ঞাত হব। আমাকেও অমনি লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু মাকে না শোনালেও গান না গেয়ে আমি থাকতে পারতাম না। বাথরুমে গাইতাম চাপা গলায়, বাগানে গাইতাম, বন্ধুদের বাড়িতে, স্কুল কলেজের কমনরুমে গাইতাম খোলা গলায়। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে আমি অভিনিবেশ দিয়ে গান শিখছি সোহমমামার কাছে। জানি মার ঈশ্বরদত্ত গলা ছিল, তার ওপর পাঁচছ'বছর বয়স থেকে সাধনা করে গেছেন নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে। আমার এখনই কুড়ি পেরিয়ে গেছে। আর কি পারবো? কিন্তু সোহমমামা উৎসাহ দেন, বলেন 'মার মতো না-ই পারলি, হয়ত মিতুলমাসির মতো পাববি। তোর তো মনে হয় যেন সাধা গলা। আর যদি বড় গাইয়ে হতে না-ও পারিস, শুনিয়ে হতেও তো পারবি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বুঝে শোনার আনন্দ এত বেশি যে সেটাই একটা জীবনের লক্ষ্য হতে পারে।'

বিজ্ঞান যাই বলুক, আমার ধারণা মানুষ ঊর্ধ্বলোকের নানান স্তর থেকে জন্মায়। আমার মা এসেছিলেন গানদাদু কথিত গন্ধর্বলোক থেকে। একেবারে আপাদমস্তক শিল্পী। দেবগন্ধর্বদের জীবনে শিল্পের প্রতি এই ভালোবাসায় কোনও দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু মায়ের জীবনে তাঁর গান্ধর্বী প্রকৃতি ও মানবী হৃদয়বৃত্তির বড় মর্মন্তুদ দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে যার চূড়ান্ত পরিণতি তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে যাওয়া। কিন্তু তাঁর মধ্যেকার শিল্পী নিজেকে কিছুতেই মূক রাখতে পারেনি। তিনি মুখর হয়ে উঠেছিলেন ছবিতে। যাঁরা বোঝেন তাঁরা বলেন তিনি পেরেছিলেন।

এই সমস্ত বিদেশী স্বীকৃতির পর মা বহু মরণোত্তর পুরস্কার পেলেন। সরকারি, বেসরকারি, গানের জন্য, ছবির জন্য। সে সব আমরা তিন ভাই বোন নিলাম। আমাদের পরিবার শুধু মায়ের ছবি বিক্রির টাকাতেই বিরাট ধনী হয়ে গেল। দাদা মাকে যেরকম বাড়ি তৈরি করে দিতে চেয়েছিলো। তার চেয়েও সুন্দর বাড়ি আমরা বানিয়েছি। শুধু সেখানে মা থাকেন না। স্কুলে ভর্তি করার সময়ে মা ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি আমাদের নাম দিয়েছিলন সোহিনী আর সাহানা। কিন্তু সে নাম আমরা ব্যবহার করতাম না। সকলেই আমাদের টিটু বনি বলেই ডাকত। আজ, স্কুল কলেজের রেজিস্টারে বন্দী সেই নামটাকে এই জীবনকাহিনীতে আমি পরম গৌরবের সঙ্গে মুক্তি দিলাম।

সোহিনী দত্তগুপ্ত